কাণ্ডারী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

যত সৌখীন জীবন-তরীর তুমি চির-কাণ্ডারী ;—
পারিবে বন্ধু, চালাতে কি মোর জীবন-গরুর গাড়ী ?
আমার পন্থা নহে মসৃণ, পিচ্ছিল জলপথ ;
পগার ভাগাড়, ভাঙন ভাঙিয়া চলে এ 'পুষ্পরথ'।
উঠে না এখানে কভু সুবাতাস, কভু বা ঝড়ের দোল ,
ফুটে না এখানে কুলুকুলু গীতি, কল-কল্লোলরোল।
দাঁড়ের আঘাতে আড়ে তাল রেখে দাঁড়ীরা গাহে না সারি ;
ভরা উড়োপালে, কষে-ধরা হালে তুফানে জমে না পাড়ি।
খেলে না হেথায় জোয়ার কি ভাঁটা, ঘূর্ণী বন্যা, ঢেউ,
সাঁঝ-ঘাটে ঘট ভরিবার ছলে দোলায় না এসে কেউ।
তরঙ্গচূড়ে রঙ্গে নাচিয়া যুঝিয়া ঝঞ্ঝা সাথে,
লভে না শীতল সুনীল মরণ কালবৈশাখী রাতে।

এ মম গরুর গাড়ী,
এঁটে বাঁধা টুটা পাঁজরা বন্ধু, ভাড়াটিয়া ভারে ভারী।
আমার মতন কত মহাজন যে পথে হইল গত,
ব্যথাভারে আঁকি চক্রনেমিতে দীর্ঘ গভীর ক্ষত !—
সে অনাদি 'লিক্' ঠিক রেখে রেখে এ রথ চালাতে হবে,
সহিয়া সঘন ঝাঁকানি, চাকার করুণ আর্ত্তরবে।
হালের ঈষৎ ইঙ্গিত পেলে ফিরে তরণীর মুখ ;
সে সব বালাই কিছু ইথে নাই, নাই কোন ভুলচুক্।
নাই ঝড়জল, বর্ষাবাদল, ধূপ ছায়া রাতদিন ;—
পুরাতন পথে সনাতন যান চলিবে বিরামহীন।
তুমি শুধু ভাই, জোয়াল চাপিয়া নিমীলিত আঁখি বসি,
ঝিমা'তে ঝিমা'তে দক্ষিণে বামে'পাচন' চালাবে কসি।

গরুরগাড়ীর গরু এ বন্ধু, বোঝাই গাড়ীর গরু,
এদের চালাতে লাগিবে না ভাই, সিঙা, বেণু, ডম্বরু।
হাতের গোড়ায় যে 'কচা' মিলিবে পথের পাশের বনে,
তারি ঘায় ঘায় যাবে ঠায় ঠায় পরমতুষ্ট মনে।
কভু 'ওলা' কভু 'দাবা' হবে গাড়ী কখনো
চলিবে বেঁকে,
চিহ্নিত পথে অবিচ্ছিন্ন চলার বেদনা এঁকে।
নূতন ভাঙনে সনাতন পথ গেছে বা কোথাও ফাটি ;
মাঝে মাঝে 'লিক্' এমন গভীর, বুকে ঠেকে
যাবে মাটি।
তথাপি বন্ধু, হতাশ হয়ো না,—গরুর গাড়ীর গরু,
জাওর কাটিয়া পার হ'তে পারে মরীচিকাহীন মরু।

কাণ্ডারী, কাণ্ডারী !
নিরুপায়,—তাই সঁপি তব হাতে এ মোর গরুরগাড়ী।
জানা আছে তব কালবোশেখিতে হাল ধ'রে ঢেউ-এ দোলা ;
জান কি বন্ধু, কাঁধে 'চাকা মেরে' 'দকে পড়া'
গাড়ী তোলা ?
তরী বাওয়া আর গাড়ী খেদান'য় অনেক তফাৎ ভাই ;—
এর বাড়া আর গৌরবহারা হীন কাজ কিছু নাই !
—যা থাক্ আমার বরাতে বন্ধু ;
করিব না অপমান—
চিরদিবসের কাণ্ডারী ধ'রে
ক'রে দিয়ে গাড়োয়ান !

মাধবীর পত্র

শ্রীসরোজকুমারী দেবী

ভাই অলকা, তোমার চিঠি অনেক দিন পেয়েছি। আমার এই নতুন জীবন কি ভাবে কাটছে তুমি জানতে চেয়েছো—অবস্থাগতিকে ঘটনাচক্রে প'ড়ে বাঙালী ঘরের এই নিতান্ত সাধারণ জীবনটাও যে রকম জটিল ও অসাধারণ হয়ে উঠেছে, তাতে এবার আবার কোন্ দিকে তার গতি ফিরলো, আর সে গতির ফলটাই বা কি—এ সব জানবার ইচ্ছা তো স্বাভাবিক। আমি যে এতদিন তোমায় চিঠি দিতে পারি নি, তার কারণ—এ কয় মাস আমার যে কি ভাবে কেটেছে তা আমি নিজেই জানি না। সে যেন একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন মোহের অবস্থা—আমার চারদিকে সে সময় যে সব ঘটনা ঘটছিলো, তার মধ্যে আমার দাঁড়াবার স্থান আছে কি না—আমি বাঁচবো কি মরবো কিছুই ঠিক করতে পারতুম না। আজ যে আমার অদৃষ্টের সে সব মেঘ একবারে কেটে গেছে তা নয়, তবে এখন বাইরের ঝঞ্চাট অনেকটা মিটে যাওয়ায় নিজের ভাবনা ভাববার সময় বেশ পেয়েছি। বুকের ভিতর যে দুঃসহ ব্যথার ভার পুঞ্জীভূত হয়ে জমে উঠেছে, এমন ক'রে মনে মনে গুমরে থেকে আর সে ভার সহ্য করতে পাচ্ছি না। সংসারে আমার ব্যথার ব্যথী আজ আর কেউ নেই ভাই, তাই আজ তোর কাছে মনের সব কথা খুলে বলতে বসলুম।

আমার চরম দুর্গতির দিনের পর থেকে পুলিশের টানাটানি দশজনের কাছে নিজের দুর্গতির কথার বর্ণনা—শেষ আদালত পর্য্যন্ত তার জের টেনে টেনে যখন লজ্জা ও ঘৃণায় শতবার নিজের মৃত্যুকামনা করছি, তখন হঠাৎ একদিন সে যমযাতনার অবসান হলো। শুনলুম, যে পাষণ্ডরা আমায় ঘর থেকে টেনে এনে অপমান করেছিলো, তাদের কঠিন শাস্তি হয়ে গেছে। কিন্তু এ সংবাদে আমার আর লাভ ক্ষতি কি? আমি যে জীবন, যে সম্ভ্রম হারালুম, আর তো তা কখনো ফিরে পাব না? এখন দিনের পর দিন এই অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বেঁচে ম'রে থাকা ছাড়া আমার আর কোন উপায়ই রইলো না।

আমার ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে ভেবে মা বাবার মনে সুখ ছিল না। আর আমি?—যে ঘর আমি চিরদিনের মত ছেড়ে এসেছি, আর যেখানে ফিরে যাবার আমার কোন সম্ভাবনাই নেই, ফিরে ফিরে কেবল সেই ঘরেরই অতীত দিনের স্মৃতি আমায় আকুল করে তুলতো, আর সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠতো নিজের উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও বিরাগ; আমি কলঙ্কিত, আমি অস্পৃশ্য? সংসারে আমার আর কারু কাছে মাথা তু'লে দাঁড়াবার কোন উপায় নেই! নিজেকে এত ঘৃণিত এত হীন বলে আমার মনে হত যে, মৃত্যু ছাড়া আর যে আমার কোন উপায় থাকতে পারে, সে কথা ভাবতে পারতুম না।

দিন এমনি করেই কাটছিলো, হঠাৎ একদিন আমার শ্বশুর এসে হাসি মুখে আমায় বল্লেন—মা লক্ষ্মি, ঘরে চল। আমি তোমায় নিতে এসেছি। অনেক দুঃখ সহ্য করেছ মা, এবার তোমার দুর্ভোগের শেষ হয়েছে; এখন নিজের ঘরে ফিরে চল।

কথাটা এত অসম্ভব ও অদ্ভুত যে, আমি কিছু বুঝতে পারলুম না—শুধু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। মা

বাবাও অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। বোধ হয়, যা শুনলেন সেটা যেন বিশ্বাস করতে পাচ্ছিলেন না।

আমাদের অবস্থা দেখে শ্বশুর হেসে বল্লেন, তোমরা চুপ করে ভাবছো কি? পণ্ডিতরা বিধান দিয়েছেন—গঙ্গাস্নান ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করলেই শুদ্ধ হয়ে যাবে। আমি অবশ্য মনে জানি—আমার মায়ের কোন পাতক নেই, তবে সমাজে থাকতে গেলেই তাকে মেনে চলতে হয়। সেই প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারটা সেরে বাড়ী যেতে হবে।

মা বাবা এতটা আশা করেন নি। বাড়িতে সে দিন যেন একটা আনন্দ-উৎসব প'ড়ে গেল। কিন্তু আমার যেন কেমন একটা অজানা ভয়ে ও সঙ্কোচে বুকটা কেঁপে উঠতে লাগলো? শ্বশুরের কথা মত গঙ্গাস্নান, প্রায়শ্চিত্ত—সবই হলো বটে, তবু আমার মনে নিজের প্রতি যে একটা হীন ভাব ছিল—সেটা তো দূর হলো না। খালি মনে হতে লাগলো—এ সব তো নিতান্ত বাইরের ব্যাপার—আমি নিজের মনে তো জানি—আমি কলঙ্কিত—আমার চিরদিনের সংস্কার ও বিশ্বাস আমায় এ সংশয় থেকে কিছুতে মুক্তি দিতে পাচ্ছিল না। তাই শ্বশুর বাড়ী যাবার কথায় দারুণ লজ্জা ও ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর যেন কাঁটা দিয়ে উঠছিলো।

সারা পথ নানা দুর্ভাবনা ও উদ্বেগে কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি এলুম। শ্বশুর আমায় ভিতরে নিয়ে গিয়ে শাশুড়ীকে ডেকে বল্লেন, মা-লক্ষীকে নিয়ে এলুম। পণ্ডিতদের বিধান মত ও-বাড়ী থেকেই সব সেরে এসেছি। এখানে ওসব হাঙ্গামা আর কিছু করতে হবে না।

তারপর আমায় বল্লেন, মা, কোন কুণ্ঠা সঙ্কোচ মনে এনো না। যেমন আগে ছিলে তেমনিই থাকবে, মাঝের কটা দিনের কথা একেবারে ভুলে যেও।

তিনি বাইরে চলে গেলে আমি শাশুড়ীকে প্রণাম করতে গেলুম। আমায় তাঁর পায়ের কাছে হেঁট হতে দেখেই তিনি তাড়াতাড়ি দু পা পিছিয়ে গিয়ে বল্লেন,থাক, হয়েছে। তুমি বসো, আমার রান্নাঘরে কাজ আছে। দেখি গে।

আমি চেয়ে দেখলুম, তাঁর মুখ গম্ভীর, আমাকে আনায় তিনি প্রসন্ন হন নি বোঝা গেল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শাশুড়ী একতলার একটা ঘরে আমায় নিয়ে গিয়ে বল্লেন, তুমি এই ঘরখানায় শোও। বামার রান্নাঘরের কাজ সারা হলে তোমার কাছে শোবে এখন। অনিল বাড়ী নেই। সে এলে যা হয় হবে।

শাশুড়ী উপরে চলে গেলেন। স্বামী বাড়ী নেই শুনে তখনকার মত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। তাঁর সঙ্গে দেখা হবার দুর্নিবার লজ্জা ও সঙ্কোচ আমি কিছুতে এড়াতে পারছিলুম না।

সেদিন রাত্রে আমি ভাল করে ঘুমোতে পারি নি। বুঝতেই পারছিস ভাই, এ সময় মনের কি অবস্থা হয়? শাশুড়ী যে আমার প্রতি আর প্রসন্ন নন্ সে তো বাড়িতে পা দিতে না দিতেই বুঝতে পেরেছি—এখন কেবল স্বামীর কথাই আমার মনে হতে লাগলো! তিনি আমায় কি ভাবে গ্রহণ করবেন? তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হলে তিনি কি বলবেন? শাশুড়ী আমায় আমার নিজের ঘরে যেতে দিলেন না কেন? আমার সম্বন্ধে আমার স্বামীর মনের ভাব তিনি কি কিছু জেনেছেন? এই রকম কত কথাই যে মনে হতে লাগলো—সে আর কি বলবো?

আবার ভাবলুম—হয় তো তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই সব গোল কেটে যাবে। এত বড় একটা ঘটনার পর যখন পণ্ডিত-সমাজ আমায় গ্রহণ করতে মত দিয়েছে—শ্বশুর যখন নিজে গিয়ে আমায় আদর ক'রে ঘরে এনেছেন, তখন আমার অদৃষ্টে সব দুর্য্যোগই কেটে এসেছে ব'লে মনে হচ্ছে। হয় তো আবার সবই আগেকার মত সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে, মাঝের এ সব অপমান—এ সব গ্লানি হয় তো তখন সত্যই মন থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়ে আবার আমার জীবন সুখে শান্তিতে সার্থক হয়ে উঠবে। মানুষ আশা সহজে ছাড়তে পারে না ভাই। ডুবতে বসেও সে খড় কুটো আশ্রয় করেও আবার বাঁচবার চেষ্টা করে। আমারও তখন তাই হয়েছিল। আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে ডুবে উদ্বেগ ও অশান্তি যথেষ্ট ভোগ করছিলুম বটে, তবু সব চিন্তা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে থেকে স্বামীর মুখ মনে পড়লেই আশার একটা জ্যোতি ফুটে উঠে আমার মনের এতদিনের আঁধার দূর হয়ে যাচ্ছিল।

পরদিন সকালে দু একটা বাইরের কাজ করবার পর শাশুড়ী আমায় উপরের ঘরগুলো ঝাঁট দিয়ে আসতে বল্লেন। তখন অনেক বেলা হয়েছিল। আমি উপরে উঠছি, হঠাৎ দেখলুম, তিনি উপর থেকে নেমে আসছেন। তিনি যে ঘরে আছেন—আমি তা জানতুম না, তাঁকে দেখে চমকে উঠে আমি সরে যেতে গেলুম, কিন্তু তাঁর চোখে চোখ পড়তে আর আমার পা উঠলো না। আমায় দেখেই তাঁর মুখে কেমন একটা বিষম বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছিল। তিনি তখনি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে নেমে চলে গেলেন। আমার সঙ্গে পাছে গায় গা ঠেকে—এমনি ত্রস্ত সঙ্কুচিত ভাব।

আমার কথা আর কি বোলবো? সে মুহূর্ত্তে আমার সর্ব্ব শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে জমে গিয়েছিল—আমি স্থাণুর মত কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম, শাশুড়ীর ধমকে শেষে আমার চৈতন্য হলো। আমার মর্ম্মান্তিক ব্যথা চেপে রেখে তাঁর কথা মত কাজ করতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু উপরে এসে আর আমার চোখের জল কিছুতে বাধা মানলো না। আমি অঝোরে কাঁদতে লাগলুম! সর্ব্বস্ব হারিয়ে মানুষ যেমন করে কাঁদে—যার সংসারের শেষ আশা, শেষ অবলম্বনটুকুও খসে যায়, সে যেমন করে বুক ফাটা কান্না কাঁদে, তেমনি মর্ম্মন্তুদ কান্না। আমার সব গিয়েও যা অবশিষ্ট ছিল—আজ সেটুকুও ফুরালো!

ব্যাপারটা মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘটে গেলেও আমার শাশুড়ীর নজর এড়ায় নি। স্বামীর মনোভাব বুঝে তিনি বোধ হয় হৃষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। খানিক বাদে ছাতে এসে আমায় কাঁদতে দেখে তিনি কাপড় শুকোতে দিতে দিতে নিজের মনেই বলতে লাগলেন—চোখের জলের ফোয়ারা উথলে উঠেছে! আরে এ তো জানা কথাই! এত সাত সতেরো কেলেঙ্কারি কাণ্ডর পরেও আবার না কি সোয়ামি তোকে ঘরে নিতে পারে। পুরুষ মানুষ, তার নিজের একটা রুচি পিরবিত্তি আছে ত? তোরই যেন হায়া ঘেন্না নেই! আর কোন মেয়ে হলে ওমুখ আর কারু কাছে বার কত্তো? ছি! ছি! ছিলি এক জায়গায় পড়ে, তাই থাক্—তা নয়—এলেন শ্বশুরের সঙ্গে তেড়ে ফুঁড়ে ঘরকন্না কত্তে! সাধ কত? সেই যে বলে না—'কত সাধ যায়রে চিতে—মনের আগায় চুটকি দিতে!' এ তাই হয়েছে! হলো তো তেমনি? এখন আর অমন করে কেঁদে ভাসালে কি হবে?

আজ কেবলি আমার মনে হচ্ছে এত বড় সংসারের মাঝে আমার সব শূন্যময়, কোন দিকে কিছু আঁকড়ে ধরবার মত আর কিছুই রইলো না। এতদিন আমি নিজেকে নিজে ঘৃণা করেছি, নিজেকে কলঙ্কিত জেনে, স্বামীর কাছে দাঁড়াবার আর আমার অধিকার নেই জেনে নীরবে চোখের জল ফেলেছি কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা আমার মনে ওঠে নি। আমার বিশ্বাস ছিল, তিনি কোনদিন আমার উপর বিরূপ হবেন না। সমাজের শাসনে তিনি আমায় আর গ্রহণ করতে না পারেন তবু মন তাঁর কখনো আমায় দূরে রাখতে পার্ব্বে না। তাঁর অন্তর যে কত উন্নত, হৃদয় যে তাঁর কত উদার তা তো আমি জানতুম? কিন্তু আজ? মানুষের মনের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

এক দিনের কথা কেবলি আজ মনে পড়ছে, যে দিন আদালতের বাইরে দূর থেকে তাঁকে দেখেছিলুম, সে দিন আমায় দেখে তাঁর চোখে কি গভীর বেদনা, কি করুণ সহানুভূতির ভাবই ফুটে উঠেছিল!

আমার মনে হচ্ছিল, লজ্জা ভয় সব বিসর্জ্জন দিয়ে ছুটে গিয়ে তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরি, ঐ দুটি পায়ে মাথা রেখে আমার এ লাঞ্ছিত জীবন অবসান হোক্; আমার এবারের এ সব দুঃখ লজ্জা সকল কলঙ্ক ও অপমান জীবনের শেষে জীবনের দেবতার চরণ-স্পর্শে সার্থক হয়ে উঠুক! সত্যি যদি সেই সময় মরতে পারতুম!

বাপের বাড়ী বসে যখনি নিজেকে বড় অসহায় বড় একা বলে মনে হত, তখন ঐ মুখ, এই স্নেহময় দৃষ্টি মনে জেগে উঠে আমার সব ব্যথা সব জ্বালা নিমেষে জুড়িয়ে যেত। অভাগিনীর কর্ম্মদোষে সেই সুধার সাগরও কি আজ শুকিয়ে গেল? যে দিন আমি দূরে ছিলুম, এখানে আসবার অধিকার যখন আমার আশার অতীত ছিল, সে

দিন তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, কাছে এসে দাঁড়াতেই তাঁর সব ভালবাসা সব স্নেহ নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল ?

এই যদি সংসারের নিয়ম হয়, যে দুর্ব্বল যে অসহায় তাকে যদি সকল দিক থেকে সকলের বিচারে পিষে মেরে ফেলাই উচিত বলে মনে হয় তবে তাই হোক, কিন্তু আজ আমার মনের মধ্যে নারীত্বের গুপ্ত অভিমান গর্জ্জে গর্জ্জে ফুলে উঠছে ; যত দোষ সব আমারই ? কিন্তু আমি করেছি কি ? বিয়ের দিনে আরাধ্য দেবতা জেনে যাঁকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলুম, আমার নব জাগ্রত হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা ভালবাসা যাঁর চরণে নিবেদন করে দিয়ে অনন্যশরণ হয়ে যাঁর উপর চিরনির্ভর করে-ছিলুম, তাঁর প্রতি ভালবাসা কি সে দিনের চেয়ে আমার তিলমাত্রও অন্যথা হয়েছে ! তাঁর মনের সব কোমলতা আজ একটামাত্র ঘটনায় শুকিয়ে গেল ! কিন্তু আমার মনে তো পূর্ব্বদিনের সেই প্রেম আজো তেমনি অম্লান তেমনি অব্যাহত রয়েছে ! তবে আমার কি দোষ ? কিন্তু বৃথাই এ অভিমান ; আমার অন্তরের পরিচয় কেউ জানলে না জানতে চাইলে না, শুধু বাইরের দিকটাই বিচার্য্য হোল !

আরো অনেক কথা লেখবার ছিল, কিন্তু ভাই ! মন যেন আর স্থির করতে পারছি না। বুকের ভিতর থেকে কেবলি একটা মর্ম্মান্তিক কান্না গুমরে গুমরে উঠছে ! স্বামীর সংসার হারিয়ে তবু বেঁচে ছিলুম কিন্তু তাঁর ভাল-বাসায় বঞ্চিত হয়ে ঘৃণামাত্র সম্বল নিয়ে কি করে বাঁচি ? এ যে কত বড় ব্যথা কি করে বোঝাবো ? তবু এই যাতনা সহ্য করেই আমার দিন কাটছে ! এ দিনের কবে শেষ হবে জানি না। আমার ভালবাসা জানিস্ ভাই, খোকাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিস্। সে কি কথা বলতে পারে ? তোদের সব খবর দিয়ে চিঠি দিস্ ! আজ তবে আসি। ইতি

তোমার মাধবী

অনিলের পত্র

১৫-ই শ্রাবণ

ভাই সুশীল, তোমার চিঠি পেয়েছি। একটা নতুন খবর দিই। মাধবী আমাদের বাড়ী এসেছে। সমাজের বিধান নিয়ে কাজ করা হয়েছে। কাজে কাজেই প্রকাশ্যে কোন ঘোঁট চর্চ্চা হয় নি। তবে চোখের আড়ালে যে অনেক শ্লেষ বিদ্রূপের মহড়া চলছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আমাকে দেখলে বন্ধুদের চোখে চোখে অস্ফুট হাসি ফুটে ওঠে, অনেকে রহস্যচ্ছলে বক্রবাটা বেশ মোলায়েম করে তোলবার চেষ্টা করে, বয়স্কদের অবাধ চর্চ্চা আমায় দেখলেই হঠাৎ থেমে যায়। আমি সবই বুঝি।

বাবা সব তাতেই প্রশান্ত ও নির্ব্বিকার, তিনি মাঝে মাঝে আমায় বলেন, ওসব দুদিনের ব্যাপার, দুদিন পরে সবই থেমে যাবে, নতুন কিছু একটা হলেই কিছুদিন তাই নিয়ে হৈ চৈ করা মানুষের স্বভাব। তুমি যেন এই সব হুজুগে মন খারাপ করে আমার মাকে অনাদর করো না।

কিন্তু ঐ সব হুজুগে লোকদের দোষই বা কি দেব ? তারা তো বাইরের নিঃসম্পর্ক লোক—আমার নিজের কথা কি ? তুমি হয় তো শুনলে অবাক্ হবে যে, আমি তার স্বামী, যার সঙ্গে তার সংসারের সব চেয়ে নিকটতম ঘনিষ্ট সম্বন্ধ—সেই আমিই—আজ পর্য্যন্ত তার সম্বন্ধে মনের দ্বিধা ও কেমন একটা ঘৃণা কাটাতে পারি নি।

মাধবী যে দিন এখানে এলো, আমি সে দিন অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছিলুম। একটা নিমন্ত্রণ ছিলো। তার আসার কথা আমি জানতে পারি নি। পরদিন সকালে অনেক বেলায় ঘুম ভেঙ্গে নীচে নামছি—হঠাৎ সিঁড়ীর উপর তার সঙ্গে দেখা ! আমি তাকে সে সময়ে দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিলুম না—আচম্‌কা তাকে দেখেই মনটা যেন কেমন একটা বিষম বিতৃষ্ণায় ভরে গেল ! আমি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নেমে গেলুম। কেন যে এমন ব্যবহার করলুম- সেটা ঠিক বলা যায় না।

বাইরের ঘরে বসে বসে কতক্ষণ এই কথাই ভাবছিলুম, হঠাৎ এমন একটা অদ্ভুত অশোভন ব্যবহার কি করে করলুম ? তাঁর সম্বন্ধে আমার মনের ভাব যাই হোক, তার জন্য এমন করে পাশ কাটিয়ে ছুটে পালিয়ে আসবার কি দরকার ছিল ? সে যে নিজেই লজ্জায় ও সঙ্কোচে হয় তো

কতই ম্রিয়মাণ হয়ে আছে, আমার এই অসঙ্গত আচরণে সে আরও ব্যথা পেল না কি? সারা দিন মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে রইলো, কোন কাজে মন দিতে পারলুম না। খালি একটা উদ্বেগ আর অস্বস্তি!

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে এসে একটা নতুন কথা—নতুন ভাবনা জেগে উঠলো! এইবার সে ঘরে আসবে! সকালে পালিয়ে ছিলুম বটে, কিন্তু এবার তো তার সঙ্গে দেখা হবেই! তার প্রতি আমার কোন বিরাগ ছিল না। তাকে আমি যতদূর জানি—এমন আর কে জানবে? কিন্তু তবু যতবার মনে হয়—আর কিছুক্ষণ পরেই সে ঘরে এসে আমার কাছে দাঁড়াবে, ততবারই যেন শরীর মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে লাগলো! আমি বেশ বুঝতে পারলুম, আমি তাকে করুণা করতে পারি—তার দুঃখে সহানুভূতি করতে পারি—কিন্তু তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে এখনো প্রস্তুত হতে পারি নি।

রাত্রে আহারের পর আমি একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়লুম। দরজা খোলাই ছিল। পড়তে পড়তে কোন সময় ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙ্গে গেল, ঘরে তখনো আলো জলছিলো, সে আসে নি! সেই প্রথম দিনের দেখার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। প্রথম দু একদিন আমি দরজা খুলেই শুতুম, মনে হত আজ হয় তো সে আসতে পারে, কিন্তু তার পর থেকে বুঝেছি, তার সঙ্গে দেখা হবার সব চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে সে নিজেই আমায় মুক্তি দিয়েছে! কোন দিনই সে আর আমার কাছে আসবে না। কি করেই বা আসবে? প্রথম দিনের অভ্যর্থনাটা তার পক্ষে যে রকম হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল!

আমার মা যে মোটেই সন্তুষ্ট হননি, মাধবী, তাঁর ব্যবহার দেখে সেটা বেশ বুঝেছে। কারণে অকারণে তিনি প্রায়ই তাকে অযথা তিরস্কার করেন। তার জীবনের চরম লজ্জার বিষয় যেটা, সেই কথাটার বার বার অনেক রকম করে উল্লেখ করে তাকে কষ্ট দিতে তাঁর বিশেষ উৎসাহ! তাঁর মতে তার এখানে আসাই অত্যন্ত অনুচিত হয়েছে, অথচ তিনি বেশ জানেন, সে নিজের ইচ্ছায় এখানে আসে নি, বাবা নিজে গিয়ে আদর করে তাকে ধরে এনেছেন!

তার প্রতি আমার এই উদাসীন ভাব দেখে তিনি বেশ খুসি হয়েছেন। কাল বিকেলে আমায় জলখাবার দিয়ে এ-কথা সে-কথার পর মা বিশেষ স্নেহের সহিত বল্লেন, তা হলে বাবা, তোর জন্য এবার একটি ডাগর মেয়ে দেখি—কেমন? এমন করে মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে তুই বেড়াস একি আমি আমি দেখতে পারি? কর্ত্তার যেমন বুদ্ধি, ওই বৌ আবার ঘাড়ে করে এখানে নিয়ে এলেন! ওর তো কপাল পুড়েইছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আর তোকে এত দুঃক্ষু দেওয়া কেন?

মার মুখে এমন অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে আমি অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলুম! মুখের খাবার আর গলা থেকে নামতে চাইল না! মা এমন কথা কি করে বল্লেন?

আমায় নির্ব্বাক্ দেখে মা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লেন, তা এসেছে যখন তখন থাক্ ঘরের বৌ, যাবেই বা কোথায়? তাকে ভাত কাপড় তো দিতেই হবে। সত্যি কিছু আর ফেলে দেওয়া যায় না। তবে যখন ওকে নিয়ে আর ঘর কত্তে পারবি না তাই জন্যেই বলছিলুম;—তা যাক্ কথাটা ভেবে দেখিস্।

এতক্ষণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো! মাধবীর উপর মা কোনকালেই বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণটা অবশ্য আমি ঠিক ধরতে পারি নি। তবে আমার সন্দেহ হত যে, আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার মাত্রাটা কিছু অধিক দেখেই তাঁর মেজাজ দিন দিন অপ্রসন্ন হয়ে উঠছিল। মধ্যে এই ব্যাপারটা ঘটায় তিনি আমার মনের ভাব না জেনে মাধবীকে একেবারে বিদায় করতে পারেন নি। আজ আট দশদিনের মধ্যে আমি তার সঙ্গে দেখা না করায় তাঁর ধারণা হয়েছে আমি আর তাকে গ্রহণ করবো না। অন্যায় আমিই করছি, তাঁকে আর দোষ দেব কি করে?

সেদিন সিঁড়ীতে দেখা হবার পর থেকে সে আমার দৃষ্টিপথের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। আমার সম্বন্ধে

তিনি কিছুতেই বুঝবেন না। তার সম্বন্ধে অদৃষ্টের দোহাই দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত—শুধু তাই নয়, পাকে প্রকারে সর্ব্বক্ষণ তাকে বিধিমতে নির্য্যাতন করে একবারে বিদায় করে দেবার জন্য ব্যস্ত। বাবা বাহির বাড়ীতে নিজের পড়া শুনা নিয়ে থাকেন, তিনি এ সব খোঁজ কিছুই রাখেন না। আমি কিন্তু দিন দিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছি।

আচ্ছা—এই সংস্কারটাকে কি করে কাটান যায়, বোলতে পারো? আমি তো দেখছি, সংস্কারই মানুষের জীবনে সর্ব্ব প্রকার দুঃখের মূল। যুক্তি যেখানে স্থির, হৃদয় যেখানে অগ্রসর—সংস্কার সেখানে মাথা খাড়া করে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে।

কবে কোন্ কালে শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির পবিত্রতা সম্বন্ধে নিয়ম করা হয়েছিল। সে একবার পতিতা হলে আর তার উদ্ধার নেই;—পুরুষদের সম্বন্ধেও সেই কথা, তবে হয় ত ব্যবস্থার ভার পুরুষের হাতে থাকায় তাদের উপর কোন জোর পড়ে নি! কালস্রোতে তাই পুরুষদের এ সব দোষ সহনীয় ও ক্ষমার যোগ্য বলে চলে আসছে—এতে কারু কিছু বক্তব্য নেই। কিন্তু মেয়েদের বেলা এ বিধান অনড় পাষাণের মত সমাজে চেপে বসে আছে। কত লক্ষ নিষ্পাপ পবিত্র জীবন এই বিধানের মুখে বলি পড়ছে, কে তার খোঁজ রাখে?

সেই সংস্কারের বশে আজো আমরা বিশ্বাস করছি, পুরুষের শত বিচ্যুতিসত্ত্বেও সে দেহাতিরিক্ত আত্মার মতই নির্ব্বিকার নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ, তাতে কোন মলিনতার আরোপ হতে পারে না। কিন্তু স্ত্রী জাতি?—তার অনিচ্ছাকৃত সামান্য ত্রুটিও অমার্জ্জনীয়। অনেক মাথা খোঁড়াখুঁড়ির পর সমাজ যদি বা তার সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম করে মেয়েদের অনুকূলে মত দিলে তো ব্যক্তিগত দ্বিধা দ্বন্দ্বের আর বিরাম নেই। আশ্চর্য্য ব্যাপার যা হোক্!

এখন আমার নিজেকে অত্যন্ত একলা মনে হচ্ছে! খালি মনে হয় এ সময়টা তুমি কাছে থাকলে বুঝি অনেক জটিলতা অনেক বিরোধের সমাধান হয়ে যেতো। মুখের আলাপ করবার মত বন্ধু এখানে আমার অনেক আছে। কিন্তু ব্যথার ব্যথী দুঃখের দিনে সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে যাকে কাছে পেতে চাই এমন দরদী কেউ নেই। যদি সুবিধে করতে পার—দিন কয়েকের মত চলে এসো না?

এতক্ষণ নিজের কথাতেই সাত কাহন, তোমাদের খবর নেবার সময় হলো না। চিঠির উত্তর শীঘ্র দিও। আমার ভালবাসা তোমরা দুজনে জেনো।

তোমার—অনিল

সুশীলের পত্র

২২এ শ্রাবণ

ভাই অনিল! চার পাঁচ দিনের মধ্যে পর পর তোমার দুখানা চিঠি পেয়েছি। তোমার মনটা বড়ই অশান্ত হয়ে উঠেছে বুঝছি। তুমি আমায় যেতে লিখেছ, দরকার হলে অনেক বাধা বিঘ্ন ঠেলে ফেলে তোমার কাছে নিশ্চয়ই আমি যেতুম, কিন্তু তোমার চিঠি দুখানা পড়ে আমার মনে হল, জটিল ব্যাপারটার সমাধান তুমি নিজেই প্রায় সাড়ে পনেরো আনা করে এনেছ, বাকীটুকু সেরে নিতে তোমার আর বেশি সময় লাগবে না।

মানুষ তার জন্ম জন্মান্তরের বদ্ধমূল সংস্কার শুধু জ্ঞান, যুক্তি ও বিচার দিয়েই ছাড়তে পারে, আমারও বিশ্বাস তাই। তোমার জ্ঞান যুক্তি ও বিচার-শক্তি কিছুরই তো অভাব দেখ্‌ছি না, তার উপর তোমার হৃদয় ক্রমশ যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে সংস্কার আর তোমায়-বেশি দিন বাধা দিতে পারবে না। তবে তোমার এই নিক্তির মাপের আত্মবিশ্লেষণ ব্যাপারটা একটু যথাসম্ভব শীঘ্র সেরে নিতে পারলেই ভাল হয়। কারণ তোমার এই অযথা বিলম্ব সে বেচারীর পক্ষে বড় মর্ম্মান্তিক হয়ে উঠছে যে।

তোমাকে বোঝাবার শক্তি আমার নেই, তবে আমার মনে হয় তোমার এত আত্মগ্লানিরও কোন কারণ নেই। যেহেতু সমস্যা যখন দূরে বা অপরের স্কন্ধে থাকে, তখন আমরা সকলেই তার স্বপক্ষে অনেক বক্তৃতা অনেক লম্ফ-ঝম্ফ করতে পারি, কিন্তু যে দিন সে একবারে শিয়রে এসে দাঁড়ায়, তখন সেই উদ্যত বিভীষিকার সামনে অনেক বড় বড় মহারথীরও বুকের রক্ত জল হয়ে আসে।

এই আমি যে এখন দূরে বসে তোমায় এত উপদেশ দিচ্ছি, তোমার অবস্থায় পড়লে হয় তো আমার অবস্থাও তোমার মত কিংবা তোমার চেয়েও আরো কাহিল হত। তাই বলি, তুমি বৃথা ভেবে ভেবে মন খারাপ না করে যা কর্ত্তব্য বলে বুঝেছ, তাই করবার চেষ্টা কর। দ্বিধা দ্বন্দ্ব তো এ ক্ষেত্রে আসবেই, সে সব ঝেড়ে ফেলে যে শেষ রক্ষা করতে পারে, তাকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি।

মেয়েদের সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ আমার তো সেটা খুব সত্য বলেই মনে হয়। আমাদের চারদিকে নিত্যই এ সব ঘটনা ঘটছে দেখতে পাই। বহুযুগের অশিক্ষা ও কুশিক্ষার ফলে মেয়েদের মন এত অনুদার ও সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে, এর প্রতিকার সহজে হবে না।

রেখা তোমাদের দেখবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাই আমি তোমায় পাল্‌টা নিমন্ত্রণ করছি, মিলনের ব্যাপারটা চট্‌পট্‌ সেরে নিয়ে কিছুদিনের মত সস্ত্রীক এখানে চলে এসো। অনেক দুঃখের পর দিন কতক বেশ আমোদে কাটান যাবে। আমার ভালবাসা জেনো। বৌদিদিকে আমার প্রণাম দিও। তোমার এবারের চিঠিতে শেষের মধুর ব্যাপারটির খবর পাবার জন্য আমরা উৎসুক রইলুম।

তোমার—সুশীল

মাধবীর পত্র

৪ঠা ভাদ্র

ভাই অলকা! তোমার চিঠি পেয়েছি। আমার আজকের দুঃখের দিনে তোমার চিঠি প্রাণে যে কি শান্তি দেয়, সে তোমায় বোঝাতে পার্ব্ব না। যতবার তোমার চিঠি পড়ি, মনে হয় যেন তুমি পাশে বসে আছ, তোমার গলার স্বর যেন আমার কানে ভেসে আসে, চিঠির ভিতর দিয়ে তোমার স্নেহের স্পর্শ আমার দগ্ধ দেহে অমৃতের প্রলেপের মত প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। ভাই! তুমি আমায় সহ্য করে থাকতে লিখেছ, মাও আমায় এখানে পাঠাবার সময় সেই কথাই বলে দিয়েছিলেন। আমি নির্ব্বিচারে সহ্য করেই দিন কাটাচ্ছি।

আমার খবর আগের মতই সব চলছে, তবে কিছুদিন থেকে আমার স্বামীর যেন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটেছে বলে মনে হয়। আজ কাল তিনি আর আগের মত আমার সম্বন্ধে উদাসীন নন্‌। সেই প্রথম দিনের দেখার পর থেকে আমি আর তাঁর সামনে যাই নি। বাড়ীর ভিতর এলেই তিনি এখন নানা ছলে একটু বেশিক্ষণ থাকবার চেষ্টা করেন, সকলের অলক্ষিতে তাঁর চঞ্চল দৃষ্টি যে চারিদিকে কারু সন্ধানে ফেরে, সে আমি আড়াল থেকে বেশ বুঝতে পারি। কি তিনি ভাবছেন কে জানে?

শাশুড়ীর আক্রোশ যেন দিন দিনই বাড়ছে। শ্বশুর আমায় স্নেহ করেন, গৃহস্থালীর পাঁচটা কাজ করতে বলেন দেখে শাশুড়ী কৌশলে তাঁর চোখের সামনে থেকে আমায় সরিয়ে দেন। যে সময় তিনি ভিতর বাড়ীতে আসেন, সেই সময়টি বুঝে যে কোন বাজে কাজের অছিলায় আমায় অন্য দিকে পাঠিয়ে দেন। শ্বশুর খোঁজ করলে বলেন, সে ওঘরে কাজ করছে।

আমি যে এখানে এসেছি এইটাই তাঁর রাগের প্রধান কারণ। শ্বশুর যেন আনতেই গিয়েছিলেন, তাই বলে আমি কোন্‌ লজ্জায় এই কালামুখ নিয়ে শ্বশুর-বাড়ী এসে উঠলুম? সংসারের উপর এতই লোভ যে কপাল পুড়লেও হায়া ঘেন্না নেই? দড়ী কলসীর কি এতই অভাব হয়েছিল?—এই গুলোই তাঁর প্রধান বক্তব্য।

আমি দেখছি, সমাজের বিধান পাওয়া সত্ত্বেও শাশুড়ী আমার সম্বন্ধে মন ঠিক করতে পারেন নি। আমার উপর তাঁর বিষম ঘৃণা। দুপুর বেলা পাড়ার মেয়েরা আমায় দেখতে আসে। তাদেরও আমার উপর একটা বিদ্রূপ ও ঘৃণার ভাব। তারা আমার সম্বন্ধে অনেক রকম লজ্জাকর আলোচনা করে, শাশুড়ীও বেশ খুসি হয়ে তাদের সঙ্গে সায় দেন। আমার উপর তাঁর যে কত বিতৃষ্ণা তা ভাল করেই তাদের বলতে থাকেন।

সেদিন গাঙ্গুলীদের বড়গিন্নি বলছিলেন, তা হলে ঐ বৌ নিয়েই ঘর করছো তো? আর না করেই বা করছো

কি? পণ্ডিত-সমাজ যখন বিধেন দিয়েছে তখন গোলমাল তো কিছু হবে না?

শাশুড়ী বল্লেন, দিক্‌গে বিধেন! ও সব নিঘ্‌ঘিন্নে মিন্‌সেদের আর কি? যা হোক একটা বলে দিলেই হল। হত নিজেদের ঘরে, তা হলে কি বিধেন বেরোত একবার দেখতুম।—নিজেদের একটা ঘেন্না পিত্তি আছে তো?

বড় গিন্নি বল্লেন, তা যা বলেছ! বলে কথায় আছে, মেয়েমানুষ তো মাটির ভাঁড়; একবার কোনরকমে দোষ ধরলেই ফেলে দিতে হয়! আর তো ব্যাভার চলে না! চিরটা কাল এই বিধেনই তো চলে আসছে! এখন কালে কালে কতই হবে! তা ছেলে কি বলে? বৌকে ঘরে নিয়েছে তো?

শাশুড়ী বল্লেন, পোড়াকপাল! ঘরে নেবে! সে একদিনের তরে তার মুখও দেখে নি! তার মন বুঝতে আমি পেরথম দিন বৌকে নীচের ঘরে শুতে দিয়েছিলুম, বলি দেখি কি করে! তা ছেলে আমার তার সঙ্গে দেখাও করে নি ধারেও যায় নি!

পাড়ার ক'নে পিসী বল্লেন, তবেই তো! যুগ্যি ছেলে, সে-ই যদি ও-বৌ ঘরে না নেয় তবে আর বৌ নিয়ে তোমাদের হবে কি? তা এখন কি করবে স্থির করেছ?

শাশুড়ী বল্লেন, দেখি আর পাঁচদিন ছেলের মন বুঝি! তারপর আমি তার বিয়ে দেব! ও বৌ নিয়ে ঘর করা আমার দ্বারা পোষাবে না। কাছে এসে দাঁড়ালে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে! কোন্ সুখে যে আবার এলো এখানে তাই ভাবি। আমরা হলে গলায় দড়ি দিতুম। মরণ আর কি!

নিজের সম্বন্ধে সারাক্ষণ এই সব মন্তব্য শুনতে শুনতে চোখে জল আসে! আপনার অদৃষ্টের লিখন নিয়ে লোক-চক্ষের আড়ালে বসে কোন মতে দিন কাটছিল। শ্বশুর কেন যে আবার এই অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে এনে ফেললেন তা জানি না। এক তিনি ছাড়া আর তো কেউ আমার উপর সন্তুষ্ট নন। শাশুড়ী আমায় তাড়িয়ে ছেলের আবার বিয়ে দিতে ব্যস্ত, স্বামীর যে কি মনের ভাব সে তো স্পষ্ট কিছু বোঝবার যো নেই। আমি যে এখানে তবে কেন সকলের চক্ষুশূল হয়ে বসে আছি, সে দিন রাত্রে বসে বসে তাই ভাবছিলুম। এক একবার মনে হচ্ছিল, বাবাকে একখানা চিঠি লিখে দিই। সেখান থেকে কেউ এসে আমায় নিয়ে যাক্। যখন এখানে আমার কোন স্থান নেই তখন মিছে আর কেন? আমি চলে গেলে এরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচুক, আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

বসে বসে অনেক ভেবে সংকল্প স্থির হল বটে, কিন্তু এখানকার সব দাবী দাওয়া ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে চলে যাবার কথা মনে হতেই চোখের জল অসম্বরণীয় হয়ে উঠলো। আমার শাশুড়ী ঠিক কথাই বলেন, স্বামীর উপর স্বামীর সংসারের উপর আজও আমার আকর্ষণ কই কিছুই তো কমে নি! যখন নিজেকে অযোগ্য জেনে সর্ব্বক্ষণ নিজের মৃত্যুকামনা করেছি, স্বামীর পাশে দাঁড়াবার অধিকার আমার নেই ভেবে নিজেকে দূরে রাখতে চেয়েছি তখন বুঝি নি, সে আমার যথার্থ মনের ভাব নয়, সে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র! সে যদি আমার যথার্থ মনের ভাব হত তা হলে আমি আজ মন খুলে সব দাবী ছেড়ে সরে দাঁড়াতে পারতুম। আমি তো কই বলতে পাচ্ছি না, আমার যখন স্ত্রীর অধিকার নেই তখন স্বামী আবার বিয়ে করে সুখী হোন—আমার যে শুধু বুকের ভিতর থেকে আকুল রোদন ঠেলে উঠছে! খালি মনে হচ্ছে, আমার সব গেল! মন থেকে এর আকর্ষণ আমি কিছুই ছাড়তে পারি নি! বুঝি মেয়ের জীবন নিয়ে এলে কেউই পারে না!

কতক্ষণ যে নিজের মনে বসে বসে কেঁদেছি—জানি না! চোখ মুছে চেয়ে দেখলুম, জানলার বাইরে আমার স্বামী দাঁড়িয়ে! তিনি আমারই দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন!

এতদিন পরে হঠাৎ তাঁকে আমার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি অত্যন্ত চমকে উঠে দাঁড়ালুম! বুকের ভিতর কেমন কেঁপে উঠলো! আজ এ আবার কি নতুন কাণ্ড!

একবার মনে হল, তিনি দরজার দিকে দু-পা এগুলেন তারপর দেখি সেটা আমার দেখার ভুল—তিনি তখনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উপরে উঠে গেলেন! কি যে ঘটলো,

কেন এলেন, কেনই বা ফিরে গেলেন—কিছু বুঝতে পারলুম না!

সে রাত্রে আর আমার চোখে ঘুম এলো না। কেন তিনি ওখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন? আমাকেই কি তাঁর কোন কথা বলবার ছিল? সে কি কথা। কেবলি আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলুম। সমস্ত রাত থেকে থেকে কেবল তাঁর মুখই মনে পড়তে লাগলো। আদালতের বাইরে সেদিন তাঁর যে করুণ রূপ দেখেছিলুম, আজ আবার তাঁকে ঠিক সেই রূপেই দেখলুম? এই রূপ ধ্যান করেই তো আমার দুঃখের দিনগুলো আমি যথাসম্ভব শান্তিতে কাটিয়েছি! তবে প্রথম দিন কি আমার দেখা ভুল হয়েছিল? আমি কি এতদিন ভুল বুঝে নিজে এই মর্ম্মান্তিক কষ্ট পেলুম? কিন্তু তাই যদি হয় তবে এই এক মাসের ভিতর তিনি তো কই একবারও আমার কাছে আসেন নি? কি যে রহস্য—কে জানে?

তাঁর ঘরের জানলা খোলা ছিল। দেখলুম তিনি অনেক রাত পর্য্যন্ত কেবল ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিছু বুঝলুম না, মন যেন কেমন আনচান করতে লাগলো।

দিন দুই পরে শ্বশুর খেতে বসেছেন, আমার শাশুড়ী বল্লেন, বৌ তো অনেক দিন হলো এখানে এসেছে, এবার দিন কতক তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও না।

শ্বশুর কথাটায় বিশেষ মন দিলেন না, খেতে খেতে বল্লেন, অনেক দিন আর কই? এই তো সে দিন এলো! বিশেষ তারা যখন কেউ নিতে আসে নি তখন এত তাড়াতাড়ি পাঠাবার দরকার কি?

শাশুড়ীর অত্যন্ত রাগ হলো—শ্বশুরের বুদ্ধি বিবেচনার উপর তাঁর কোন কালেই আস্থা ছিল না। তিনি বল্লেন, নিতে তারা কোন কালেই আর আসবে না! কেনই বা আসবে? তারা তো আর তোমার মত ম্যাড়া নয়? ঘাড় থেকে পাপ বিদেয় করে তারা নিশ্চিন্ত হয়েছে! আমায় আবার তারা নিতে আসবে! কথা শুনলে গায়ে জালা ধরে!

তাঁর এই আকস্মিক উত্তেজনায় শ্বশুর অবাক হয়ে বল্লেন, তাতে আর হয়েছে কি? না নিতে আসে ভালই—আমার ঘরের বৌ আমার ঘরেই থাকবে! এই তুচ্ছ কথা নিয়ে তুমি মাথা গরম কচ্ছো কেন?

শাশুড়ী বল্লেন, কচ্ছি কি সাধ করে? ও বৌ নিয়ে ঘর করা আমার দ্বারা পোষাবে না। আমি ছেলের আবার বিয়ে দেব!

এবার আমার শ্বশুর কথাটা বুঝে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, শেষে বল্লেন, ছিঃ! তুমি এ কথা মুখে আনলে কি করে? তুমি না মা? সন্তানের জননী? একটা ছোট মেয়ে যার কোন দোষ নেই নিষ্পাপ, অদৃষ্টের ফেরে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে তোমার আশ্রয়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে! তাকে তুমি কোথায় ভালবেসে আদর করে তার সব লজ্জা মুছে নেবে, তা না—তুমি তার সম্বন্ধে এই কথা ভাবছো? মায়ের মুখে এমন কথা?

এই প্রবল ধিক্কারে আমার শাশুড়ী প্রথমটা থতমত খেয়ে চুপ করে রইলেন! তার পরেই সক্রোধে ঝঙ্কার দিয়ে বল্লেন, মায়ের মুখে এই কথা তো আসবেই! আমি মা—আমার নিজের সন্তানের ভাল মন্দ তো আমাকেই দেখতে হবে! তোমার ঐ ধিঙ্গী বৌয়ের জন্য কি আমার একটা মাত্তর ছেলে রাজ্যিভ্রষ্ট বনবাসে যাবে না কি?

শ্বশুর অবাক্! বৌয়ের জন্য ছেলে যে কেন রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসে যাবে, সেটা তাঁর সরল বুদ্ধিতে এলো না।

শাশুড়ী নিজের মনেই বলতে লাগলেন, হাঁ করে চেয়ে দেখছো কি? ঘরের খবর রাখ কিছু? দিবেরাত্তির তো পুঁথি নিয়েই মত্ত! এমন যে যোগ্যি ছেলে তার একটা মত নেওয়া নেই—কিছু না, সাত তাড়াতাড়ি ওই বৌ মাথায় করে হাজির করা হোল! এই যে এক মাস বৌ এসেছে তা এক দিনের তরে ছেলে তার মুখ দেখেছে? ছেলের আমার দিন দিন কি চেহারা হয়ে যাচ্ছে দেখেছ কোন দিন চোখ তুলে? তার আবার বিয়ে দিয়ে ঘরবাসী কত্তে হবে তো? ও বৌ এখানে বসে থাকলে সে সব কিছুই হবে না!

শ্বশুরের প্রসন্ন মুখ এবার গম্ভীর হয়ে উঠলো! তিনি স্ত্রীর অত কথা কিছুই শুনলেন না—খালি নিজের মনে

বলতে লাগলেন—এক মাস অনিল বৌমার সঙ্গে দেখা করে নি? আশ্চর্য্য তো! তার যে এ বিষয় কিছু অমত আছে তা তো কৈ মনে হয় না! কি হল?

তাঁর আর খাওয়া হলো না! খানিক থেমে তিনি বল্লেন, দেখ, তুমি এ বিষয় নিয়ে মিছে গোলমাল করো না। ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও! ড়ুদিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে! ওদের বিষয় ওরাই বুঝবে, তোমার মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই।

সে দিন রাতে সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে এসে শ্বশুর আমায় তাঁর কাছে ডাকলেন। বল্লেন, মা লক্ষ্মী, আমি সব শুনেছি; তোমার মায়ের কাছ থেকে তোমায় টেনে এনে ড়ুঃখের উপর ড়ুঃখ দিলুম!

আমি মাথা নীচু করে নীরবে রইলুম। কি বোলবো? তিনিও অনেকক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

কতক্ষণ পরে তিনি আবার বল্লেন, মা, বড় কষ্ট পাচ্ছ, সব বুঝছি কিন্তু আরো কিছু দিন সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় নেই। অনিল অবুঝ নয়—চিরদিন সে ভুল করবে না। একটু গোলমাল এ সব ক্ষেত্রে হয়েই থাকে। সেটা সামলে নিতে সময় লাগে। কি করবে মা! কপালের ভোগ জেনে আর কিছুদিন সহ্য কর।

তারপর তিনি আমায় মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন, আমি আশীর্ব্বাদ করছি মা! তোমার ভালই হবে। কিন্তু তুমি চুপ করে একলাটি ঘরের মধ্যে বসে থাক কেন? ওতে আরও মন খারাপ হয়ে যায়। বাইরে এসে সংসারের পাঁচটা কাজ কর্ম্ম করবে—যেমন আগে ছিলে তেমনি সহজ ভাবে থাকবে। তবে তো মন ভাল থাকে।

ভাবলুম, কাজ কর্ম্ম করতে পেলে তো বাঁচি কিন্তু করতে দিচ্ছে কে? স্পষ্ট কিছু বলতে পারলুম না—চুপ করে রইলুম।

তিনি বোধ হয় বুঝলেন। একটু হেসে বল্লেন, শাশুড়ী কিছু করতে দেয় না, বড় বকে—নয়? কি করবে মা? অবুঝ স্ত্রীলোক তাকে সব সইয়ে বুঝিয়ে নিতে সময় লাগবে। তা যাক্—তুমি আমার কাজগুলো আগের মত গুছিয়ে করবে—সন্ধ্যের পর কাজ কর্ম্ম সারা হলে আমার কাছে এসে বসবে। আমি বড় খুসি হব তাতে। যে যা খুসি করুক আমরা মায়ে-পোয়ে বেশ থাকব—কেমন?

এখানে এসে পর্য্যন্ত গৃহস্থালীর কোন কাজে শাশুড়ী আমায় হাত দিতে দেন নি। রান্না পরিবেশন সব তিনি নিজেই করতেন। বাইরের যে সব কাজ দাসী-চাকরে করে তারই কতকগুলো আমার ভাগে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। আমিও সেই সব কাজ ছাড়া আর কিছুতে হাত দিতুম না।

উঠানের এক কোণে বহুদিনের কতকগুলো আবর্জ্জনা জমা হয়ে ছিল। শাশুড়ী একদিন জায়গাটা আমায় পরিষ্কার করতে বল্লেন। আমার জন্ত এই রকম কাজই তিনি খুঁজে খুঁজে বের কত্তেন।

ড়ুপুর বেলায় ঝাঁটা নিয়ে আমি সেখানটা সাফ করছিলুম, শাশুড়ী তখন নিজের ঘরে ঘুমচ্ছিলেন। আমার কাজ যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় তিনি উপর থেকে নেমে বাইরে যাচ্ছিলেন। আমায় উঠান সাফ কত্তে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন!

আমিও তাঁকে দেখে বিব্রত হয়ে মাথার কাপড় টেনে একটু দাঁড়ালুম, ভাবলুম—তিনি চলে গেলে আমার কাজ করবো—তিনি কিন্তু একবার বাইরের দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলেন। একটু এদিক ওদিকে চেয়ে একবারে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, বল্লেন, তুমি এ সব কাজ করছো কেন?

আমার গায়ের ভিতর তখন কাঁপছে! অবস্থাটা বুঝতেই পারছো তো? আমি কিছু উত্তর দিতে পারলুম না।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বল্লেন, বুঝেছি, মা করতে বলেছেন। তুমি ঝাঁটা ফেলে হাত ধোও, আমি বাইরে গিয়ে নিধেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে সাফ করে দেবে।

তিনি চলে গেলেন। আমি বাকি কাজটুকু কোন

মতে সেরে ঘরে এসে বসে পড়লুম? এক মাস পরে আমার এই প্রথম স্বামী সম্ভাষণ!

তাঁর যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে আমি বেশ বুঝছি। মনে হয় যেন তিনি কোন ছলছুতোয় আমার কাছে আসতে চান বা কিছু বলতে চান। শাশুড়ী সব সময় কাছাকাছি থাকতেন বলে স্থবিধা পান না। শ্বশুর বলেছেন, আমার দুর্ভোগের শেষ হয়ে এসেছে। সত্যই কি তাই? বসে বসে এখন সেই কথাই শুধু ভাবি! শেষে কাল সকালে একটা ঘটনায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

কয়েকদিন থেকে শ্বশুর আমায় পূজার ঘরে গিয়ে তাঁর পূজার আয়োজন করে দিতে বলেছিলেন। শাশুড়ীর ভয়ে সে ঘরে ঢুকতে আমার সাহস হত না। আগে এ সব কাজ আমারই ছিল।

শ্বশুর তিন চার দিন বলবার পর কাল সকালে স্নান করে আমি পূজার ঘরে ঢুকলুম। ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছিল, শাশুড়ীর চোখে পড়লে না জানি কি অনর্থ বাধবে! আমার কি উভয় সঙ্কট অবস্থা, হলোও কি ঠিক তাই? সব কাজ শেষ করে চন্দন ঘষছি, শাশুড়ী তখন স্নানান্তে ঘরে ঢুকলেন, আমায় সে ঘরে দেখে তিনিও তো অবাক!

আমার এত বড় স্পর্দ্ধা দেখে তিনি প্রথমে রাগে ও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন! কর্ত্তার না হয় ভীমরথী ধরেছে কিন্তু আমার আক্কেলটা কি? আমি কোন্ সাহসে পূজার ঘরে ঢুকলুম?

অকথ্য ভাষায় তিনি গালাগালি আরম্ভ করলেন! তুমুল চীৎকারে বাড়ী সরগরম হয়ে উঠলো। দাসী-চাকর যে যেখানে ছিল, সব ছুটে এলো! শ্বশুর সকালে কি কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখনো ফেরেন নি। আমার তো হাতের চন্দন-কাঠ হাতেই রইল। লজ্জায় ভয়ে আমি একেবারে কাঠ হয়ে গেলুম!

হঠাৎ বাইরে থেকে শব্দ হল, মা!

আমরা চমকে দরজায় দিকে চাইলুম! চৌকাঠের বাইরে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে দেখে শাশুড়ীর উদ্যত বাক্যস্রোত বন্ধ হয়ে গেল।

স্বামী বল্লেন, মা, বৌকে যদি ঘরের বৌয়ের মত রাখতে না পারবে, তবে তাকে আনবার কি দরকার ছিল?

শাশুড়ী নির্ব্বাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন? তিনি যে আমার সম্বন্ধে মায়ের মুখের উপরে কথা বলতে এসেছেন, এ যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিছু পরে বাক্যস্ফূর্ত্তি হতেই তিনি বল্লেন, অমি তোমার বৌকে গলায় কাপড় দিয়ে মাথায় করে আনতে যাই নি, আমার যদি মত নিয়ে কাজ করা হত—

স্বামী বাধা দিয়ে বল্লেন, সে আমি জানি! তুমি যাও নি, বাবাই মাথায় করে এনেছেন; কিন্তু যখন আনাই হয়েছে তখন তাকে তার যা অধিকার তা পুরোপুরিই দিতে হবে। এমন করলে তো চলবে না।

তিনি চলে গেলেন। পরের তালটা আমার উপর কি ভাবে পড়লো তা অবশ্যই বুঝতে পারছো কিন্তু আজ আর আমার কোন দুঃখ নেই। তাঁর মুখে আজ শুনেছি যা পেয়েছি তার পরে যত কিছু দুঃখ যা কিছু লাঞ্ছনা সবই হাসিমুখে সহ্য করতে পারবো। আমার এত দিনের সব অপমান সব বেদনা এক মুহূর্ত্তে সার্থক হয়ে উঠেছে।

ভাই অলকা, আমার দুঃখের দিনের সাথী তুই। নিজে যেমন কেঁদেছি তোকেও তেমনি আমার দুঃখে অনেক কাঁদিয়েছি, আজ তুই শুনে সুখী হবি আমার আর কোন দুঃখ নেই; আমার নিজের স্থান আমি এতদিন পরে ফিরে পেয়েছি।

আমার ভালবাসা জানিস্, খোকাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিস। আবার শীঘ্রই চিঠি দেবো। আজ আসি। ইতি

মাধবী

সুশীলের পত্র

৮ই ভাদ্র

ভাই অনিল, তোমার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ব্যাপারটি ভালোয় ভালোয় শেষ হয়েছে জেনে আমরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। দেখা তো মহা উৎসাহে

তোমাদের বরণ করে নেবার জন্য বরণডালা সাজাতে বসে গেছে। আর তোমাদের অভ্যর্থনা যাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তার জন্য দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার রকমারি পরমার্শ ও প্রশ্ন করে করে আমায় অস্থির করে তুলেছে। কবে আসছো বল—তুমি না এসে পড়লে রেথা আমায় নিষ্কৃতি দেবে না।

সত্যি বলছি ভাই, আমি যে কত সুখী হয়েছি—কি বোলবো? যুগ যুগ ধরে যে সব ভুল ধারণা ও অন্ধ সংস্কার সমাজের বুকে চেপে বসে তার কণ্ঠ রোধ করছিল, কালধর্ম্মে সে সব ক্রমে আপনিই সরে যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মনের দিক থেকে আমরা ক্রমশই এগিয়ে চলছি। তোমার ভিতর দিয়ে তাই আজ নবযুগকেও শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন কচ্ছি।

তোমার—সুশীল
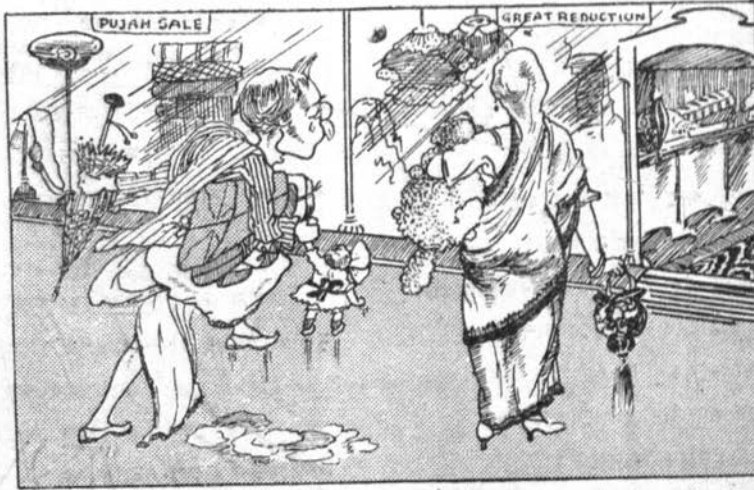
পূজার বাজার!

কোহিনূর

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

তোমারে ঘেরিয়া জাগে কত স্বপ্ন,— স্মৃতির শ্মশান,
ভূলুণ্ঠিত লুব্ধ অভিযান ;
সাম্রাজ্যের অশ্রু, রক্ত, সমাধি, পতন
হে হীরক,—একে একে করেছ চুম্বন !
স্পর্শে তব অনাদি অতীত যেন নিরন্তর মর্ম্মে ওঠে ধ্বনি'।
মাধবের বক্ষে তুমি ছিলে কি গো স্যমন্তক মণি !
শ্রীহরির বনমালা চুমি'
দিব্যগন্ধে অকলঙ্ক অঙ্গ তব ভরেছিলে তুমি
ওগো কোহিনূর !
হৃদে তব আজো বুঝি গাঁথা আছে গোপনীয় বাঁশরীর সুর,
যুগান্তের গাঢ়নীল পুলিনের ভাষা,
বাসনা পিপাসা !
অরুণ-ময়ূখ-স্পর্শে নিশান্তের স্বপ্ন যাও ভুলি !
নব-নবীনের লাগি যুগে যুগে উঠিছ মুকুলি
অভিনব রূপে !
নির্ম্মম কালের অগ্নি-অঙ্গারের স্তূপে
দেহ তব যায় না দহিয়া
হে অটুট বজ্রমণি,—কোটি কোটি প্রেমিকের বরণীয়া প্রিয়া !
গিয়েছিলে কবে তুমি পাঠানের অন্তঃপুরে পশি'
সুলতান-প্রেয়সী !
হারেমের অন্ধকারে লক্ষ বাঁদী বেগমের মাঝে
স্থিরপ্রভা দামিনীর সাজে !
মৌনশিখা স্পর্শে তব করেছিলে ইন্দুনিভা কতশত রূপসীর
বদন পাণ্ডুর
ওগো কোহিনূর !
কত রতিনিন্দিতার বক্ষে তুমি বাজাইলে বেদনার কেকা
ম্লান করি দিলে কত আননের সুশ্রী শশীলেখা,
বিচ্ছুরিলে জ্যোঃতিপাত মদগর্ব্ব মোগলের প্রমোদ-সভাতে ;
বিভ্রমের লীলাকক্ষে,—বিলাসের খুশ্‌রোজ রাতে
শাহী বেগমের আঁখি হয়েছিল অশ্রু ছলছল
তোমার সম্পদস্বপ্নে,—অলখিতে ছায়াচ্ছন্ন হয়েছিল
উল্লাসের সে মোতিমহল !
নিশীথ-লাঞ্ছন বিভা জ্বলিয়া উঠিল কবে কাম্য মণি-ময়ূরের
চোখে
কত দীর্ঘ শতাব্দীর অশ্রু দৈন্য শোকে
করে গেল জয়শ্রী-সম্পাত
উদয়-অরুণ সম,—তারপর, কবে অকস্মাৎ
অস্তগত সাম্রাজ্যের কবর ভাঙিয়া
অভিসারে চলে গেল, প্রিয়া-উদাসিয়া
দূর সিন্ধু পারে
ঐশ্বর্য্য-তোরণ-তটে তুঙ্গ সিংহ-দ্বারে !
নব অভিনন্দনের উন্মেষের দেশে,
আমাদের সৌভাগ্যের শোকরক্ত শুদ্ধ বেলাশেষে !

বাসে না সে অশ্রুহিম কুহেলিরে ভালো,
মৃত্যুর পিঙ্গলছায়া—প্রেতপুর কালো
আলেয়ার আলো
করে না ক' বিমুগ্ধ তাহারে !
পিরামিড সম সুপ্ত সমাধির দ্বারে
দাঁড়ায় না নিষ্পলক প্রহরীর বেশে !
—চেয়ে থাকে,
কবে কোন্ প্রেমাস্পদ এসে
অঙ্কে তার এঁকে দেয় যৌবনের অরুণ-চুম্বন
নিমেষের আঁখিপাতে কেড়ে লয় মন !

গান ও স্বরলিপি

দেশ—দাদরা

(হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব প্লুত উচ্চারিত হইবে)

কথা, সুর ও স্বরলিপি——শ্রীদিলীপকুমার রায়

করে   তব আনন   উতলা মন
আজি এ বিদেশে :
বাণী তব ভেসে
যায়   প্লাবি বিধুর   চিত্ত নূপুর-
—ধ্বনি উচ্ছল রেশে।
আজি   পড়ি মূরছি   প্রাণ উপছি
সুন্দর তব ছায়া
রচে   মধু-উৎসব   বন্দন-রব,
এ কি স্বপ্ন-মায়া!
মোর   চিত্তে প্রিয়   কতই অমিয়
ঢালি দেছ এসে—
কত   অশ্রু, বাঁশি,   লাস্য, হাসি,
নিতি নূতন বেশে।

দেশ — দাদরা

+ o + o

[ধর্সা ণা] [মপা মমা রা রমা পধা]

পরা রা | রা রা ণা | -া ধপা ধা | পা ধা পমা | গা মা পা | মমা রা রা | মা -া মা |
ক রে ত ব আ - ন ন উ ত লা - ম ন আ - জি এ - বি

পা -া পা | -া -া -া | মা পা মপা | ধণা ধপা ধা | পমা -া মা | রা রা -া |
দে - শে - - - বা - ণী - ত ব ভে - সে । - যা য়

রগা রা পা | মা মা মগা | রগা রগা রগা | রগা রসা সা | সা র্সা র্সা | -া র্সা র্সা |
প্লা - বি বি ধু র চি ত্ত নূ - পু র ধ্ব নি উ - চ্ছ ল

নর্সা র্রা র্সর্রর্সা | ণধা পমা গরা | রা রা ণা | -া ধপা পা | পা ধা পধা | র্রা র্সা র্সা |

রে - শে - - - ত ব আ - ন ন উ ত লা · ম ন

পধা র্সণা ধা | মপা ণধা পা | মগা ᵍগা ᵍসা | -া -া -া | রা -া ᵐরা ⁝ -া মা পা না -া র্সা |

আ - জি এ - বি দে - শে - - - বা - ণী - ত ব ভে - সে

-া র্সা র্সা | র্রা -া র্রা | রারা রা | মা -া মা । রা রা গা । সা রা ণা । -া ধপা ধা ।

- যা য় ভে - সে - এ বি দে - শে - ক রে ত ব আ - ন ন

পা ধা মপা । ধণা ধপা ধা । মরা -া রা । মা -া মা । পা -া পা । -া রা রা । মা মা মা ।

উ ত লা - ম ন আ - জি এ - বি দে - শে - আ জি প ড়ি মূ

-া মা মগা । ᵍগা -া ᵍগা । ᵍসা সা সা । সা রা মা । পা ধা না । পধা র্সা ণা । -া ণা ণা ।

- র ছি প্রা - ণ উ প ছি সু - ন্দ র ত ব ছা - য়া - র চে

ণা ণর্সর্রা র্রা । -া র্রা র্ররা । মা -া মা । মা রা রা । সা রা গা । গা -া মা । রগা পা মা ।

ম ধু উ ত্ স ব ব - ন্দ ন র ব এ - কি স্ব প্ ন মা - য়া

-া মা মা । মা পা না । -া না নর্সা । র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা । র্রা ণা ণা । ধা পা ধা ।

- মো র চি - ত্তে - প্রি য় ক ত ই অ মি য় ঢা - লি দে - ছ

মপা নর্সা র্রর্সা । র্রা -া র্সনা । না -া না । -া না নর্সা । র্সা র্সা র্রর্সা । ণধা ণর্সা র্সর্সা ।

এ - - সে - - চি - ত্তে - প্রি য় ক ত অ - - মিয়

রা ণা ণা । ধা পা ধমা । পা র্রর্সা র্রা । -া র্রা র্গা । র্রর্গা মা র্গা । র্গা -া র্গর্রর্সা ।

ঢা - লি দে - ছ এ সে ক ত অ - শ্রু বাঁ - শি

র্সর্রা র্গা র্রর্গর্রা । র্সনা র্সনা র্সা । পা না না । -া না র্সা । নর্সা র্রা র্সর্রর্সা । ণধা পমা গরা ।

লা - স্য হা - সি নি তি নূ - ত ন বে - শে - - -

রা রা ণা । -া ধা পা । পা ধা পধা । ণর্রা র্সা র্সা । ᵖণা ণা ধা । -া মা পা । ধা ধা পা ।

ত ব আ - ন ন উ ত লা - ম ন উ ত লা - ক রে উ ত লা

-া রা গা । মা মা গা । -া সা রা । গা ᵍগা ᵍসা । -া -া -া ।

- ম ন উ ত লা - ক রে উ ত লা - - -

গান ও সুর

কল্লোল সম্পাদক মহাশয়

করকমলেষু—

সম্পাদক মহাশয়,

লোকমুখে শুনি আপনাদের কল্লোল তরুণদের মুখপত্র হ'য়ে ফুটে উঠেছিল। আজ অন্তত সেই ভরসায়ই গানের প্রসঙ্গে ছু'চারিটি কথা ও একটি স্বরচিত গান পাঠাতে সাহসী হচ্ছি। সাহসী হচ্ছি বল্‌লাম এই কারণে যে, খুব সম্ভবত আপনাদের পত্রিকার উদ্দেশ্য সাহিত্যের প্রচার, সঙ্গীতপ্রচার নয়। কিন্তু আমাদের সনাতন সংস্কৃত লেখকগণ অন্তত "সঙ্গীতসাহিত্য রসনাভিজ্ঞঃ প্রায়ঃ পশুঃ পুচ্ছবিষানপহীনঃ" ইত্যাকার নানা বাণী প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও সাহিত্যকে একাসনে বসিয়েছেন; তাই আপনাদের সাহিত্য-পত্রিকার এক অংশে মাদৃশ সঙ্গীতশিক্ষার্থীর ছু'চারটি কথা মুদ্রিত হবে এ ছুঃসাহসিক আশা পোষণ ক'রে বসেছি। তাই ব'লে, সম্পাদক মহাশয়, অবশ্য এ কথা মনে ক'রে বস্‌বেন না যেন যে, সঙ্গীতকে সাহিত্যের সঙ্গে ছুতায়-নাতায় একাসনে বসিয়ে আমি গৌরব অনুভব করছি। কেননা, শুধু যে সঙ্গীতকারেরা অহঙ্কারে সাহিত্যিকদের চেয়ে ন্যূন নন তাই নয়, সঙ্গীতকে 'শ্রেষ্ঠতম' ললিতকলা ব'লে যদি প্রমাণ করতে চাই তা'হলে আমার আর যারই অভাব হোক্ না কেন, নজীরের যে অভাব হবে না এ কথা ধ্রুব। এবং এ নজীর একদেশদর্শীও হবে না মোটেই। কারণ "নাদব্রহ্ম" "গানাৎ পরতরং নহি" প্রভৃতি শ্লোক শুধু যে ভারতেই প্রচলিত তাই নয়, পাশ্চাত্য জগতেও শেক্ষপীয়র, শেলি, শোপেনহর, হেগেল, আইনষ্টাইন প্রভৃতি একগঙ্গা গালভরা নাম আবৃত্তি ক'রে যেতে পারি যাঁরা সঙ্গীতকে ললিতকলার মধ্যে কোনও কলার চেয়েই ছোট বলেন নি, বরং বড়ই বলেছেন।

প্রগল্‌ভতা ক্ষন্তব্য—বিশেষত সম্পাদক সম্প্রদায়ের কাছে। কেন না এ কথা বিশ্ববিদিত যে, ক্ষমাগুণ বিশেষ ক'রে সম্পাদকের একচেটে—নইলে তাঁরা আর যাতেই সাফল্যের টীকা লাভ করুন না কেন, মাসিকী চালানোর যে কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন না এ কথা নিশ্চিত।

সম্পাদক মহাশয়, আপনি তাই অসহিষ্ণু হ'য়ে প্রশ্ন ক'রে বস্‌বেন না আশা করি যে, আমার বক্তব্য কি? কারণ, যদি বক্তব্যের কথাই শুধান তাহ'লে আমারও আপনাকে শুধাতে হবে যে, বক্তব্য বলুন কার আছে? ইংরেজীতে বলে, All ideas are as old as the hills. কাজেই 'নিজগুণে আমার বক্তব্যের একান্ত ফাঁপা দৈন্যকে মার্জ্জনা' ইত্যাদি ইত্যাদি সবিনয় উক্তি।

কিন্তু কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্? স্বরলিপির সঙ্গে আপনাদের "কল্লো'ল-এ ছাপ্‌বার জন্যে প্রথমে একটি ফুট্-নোট মত লিখ্‌তে গিয়ে দেখলাম যে, বল্‌বার আমার কিছু আছে—অম্‌নি আর পাঁচজনের মতন অবশ্য। তাই "ফুট-নোটের" আতিথেয়তা পরিত্যাগ ক'রে আপনাদের কতিপয় 'স্তম্ভের' আতিথেয়তা ভিক্ষা করছি। যেহেতু জানি, 'আপনার তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতি অতিথিপরায়ণতা ত্রিলোকবিদিত' ইত্যাদি ইত্যাদি অতি শ্রুতিমধুর সম্পাদক-প্রশস্তি (Filling up the gap-এর কাজটি আপনারাই ক'রে নেবেন আশা করি)।

গানটির স্বরলিপির জন্যে যথাসম্ভব কম সঙ্কেতচিহ্ন ব্যবহার করলাম—কারণ আমার জানা আছে যে, আপনাদের প্রেসে স্বরলিপির সঙ্কেতচিহ্নের অনার্যাত্বরূপ ট্রাজিডি (আমার পক্ষে) অবধারিত। তাই স্বরলিপিটি বিশদ হবে না, তবে কাজ চলে যাবে ভরসা আছে। দয়া ক'রে অসম্পূর্ণ হ'লেও স্বরলিপি ছাপাবেন, যেহেতু অন্যথা আমার বক্তব্য একেবারেই দেউলে রকম হ'য়ে পড়বে। অবশ্য স্বরলিপিটি ছাপালেই যে সে বক্তব্য অর্থ ও ভাবসম্পদে ফলে ফুলে বিকশিত হ'য়ে উঠবে এমন ইঙ্গিত করা আমার নিহিত অহমিকারও উদ্দেশ্য নয়; তবে স্বরলিপিটি ছাপালে আমার বক্ষ্যমান কথাগুলির মধ্যে অন্তত একটা বোধগম্য অর্থ নিষ্কাশিত করা যাবে—এইটুকু মাত্রই আমি বল্‌তে চাই।

এটা একটা প্রবন্ধ নয়, চিঠি মাত্র। তাই আমার বক্তব্যটিকেই যে সব চেয়ে বড় স্থান দিতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা আমার নেই। আশা করি এ কথা আপনারা মান্‌বেন এবং পরিণামে বক্তব্য যদি ভণিতার চেয়ে ক্ষীণকলেবর হয় তাহ'লেও আমার দুঃসাহসকে পীনাল-কোডের ধারায় ফেল্‌বেন না, এইটুকু সাফাই গেয়ে এইবার নারায়ণ নমস্কৃত্য আমার যা দু'চারটি কথা এই স্বরলিপির টীকাটিপ্পুনি হিসাবে বল্‌বার আছে, বলে উজাড় ক'রে দেই, কি বলেন? কারণ, আপনাদের ধৈর্য্যের উপর খুব বেশি নির্ভর করা কি খুব যুক্তিযুক্ত—শুধু আমি তরুণ সম্প্রদায়ের একজন, এই গুজরের বিপর্য্যয় বলে?

আমি বাংলা গানে কি ধরণের সুরের সমৃদ্ধির পক্ষপাতী 'শুধু স্বরলিপিতে' তার কোনও সন্তোষজনক নমুনা দেবার উপায় নেই। তবে আমার মনের কোণে একটা অসমসাহসিক ভরসা আছে; সেটি এই যে, স্বরলিপি-দক্ষ ও সঙ্গীতজ্ঞ লোকে হয় ত এ গানটির সুর দেওয়ার ধরণটি দেখে বুঝতে পারবেন—কেমন ক'রে ও কোথায় সুরের মৌলিকতার সঙ্গে সঙ্গে আমি (আমার অন্যান্য গানের ন্যায়) এ গানটিতে গায়কের স্বাধীন কল্পনার অবকাশ বজায় রেখেছি। স্বাধীন অবকাশ বল্‌তে আমি ওস্তাদদের মতন গানের মাঝে মাঝেই সমাপ্তিহীন তানালাপের অবতারণা বুঝাই না, সুরের খেলানো বুঝাই। আমার পদ্ধতি—"সুরকে আদর করা (সুরকে নিয়ে হুহুঙ্কার করা নয়) এবং সুরকে খুব অনড় অচল রাখা তাকে আদর করার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নয় বলেই আমার মনে হয়।* কারণ তা করতে গেলে গান বড় বেশি কাব্য-ঘেঁষা হয়ে পড়ে। যাঁরা সঙ্গীতের মধ্যে কাব্যকেই বড় করে দেখেন (যেমন বর্ত্তমান 'প্রচলিত চালের' বাংলা গানের অনুরাগী সম্প্রদায়) তাঁরা এতে আপত্তির কিছু না দেখতে পারেন; কিন্তু যাঁরা গানের মধ্যে স্বরের সমৃদ্ধিও "সঙ্গে সঙ্গে" বাঞ্ছনীয় মনে করেন তাঁরা প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে একমত হতে পারেন না। বলা বাহুল্য, আমি এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। তাই আমি চাই, বাংলা সঙ্গীতের মধ্যে কাব্যের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সুরের একটা মহত্তর বিকাশ, যাকে এমন ভাবে গড়ে উঠ্‌তে হবে, যাতে করে সব জড়িয়ে গানটির মধ্যে একটা উচ্চতর 'হার্মনি' বা সৌষম্যের পরশ মেলা সম্ভব হয়। এ কথাটা শুধু লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। তাই স্বরলিপিটি ছাপাতে—যদিও স্বরলিপিতেও আমার এ নতুন দাবীর সারবত্তা অকাট্য ভাবে প্রমাণ করা অসম্ভব, তবু কেন এ ব্যর্থ চেষ্টা করছি এ প্রশ্ন যদি করেন তা'হলে আমাকে বল্‌তে হয় যে, নেই মামার চেয়ে কাণা মামাও যে ভাল—এ বিষয়ে সুধীসমাজে মতভেদ নেই। যতটা পারি স্বরলিপির সাহায্য নেওয়া যাক্—পরে কর্ম্মফল গীতাবিহিত পদ্ধতিতে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথাটা হচ্ছে—আমার দাবীটি একটি নূতন দাবী। রবীন্দ্রনাথ একদিন বোলপুরে আমাকে বলেছিলেন যে, কারুর কোন নূতন দাবীকে প্রথম থেকে অবিশ্বাস করা যে

---

* গত আষাঢ়ের ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনায় আমি এ সম্পর্কে সব কথা বলেছিলাম, সে সব কথা এখানে আবার বলা চল্‌ত, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তা কর্‌লাম না।

একটা প্রবৃত্তি আমাদের মগ্নচৈতন্যে উপ্ত আছে তার একটা সার্থকতা আছে, কেন না নূতনের মধ্যে যে সত্যটি থাকে সেটি এই অবিশ্বাস ও প্রতিরোধের বাধাতেই বেশি শক্তি সঞ্চয় ক'রে থাকে। তাই আমার এ আক্ষেপ নেই যে, আজ বাংলা দেশের একটা মস্ত সম্প্রদায়—যাঁদের চলতি বাংলা গানের বিশেষ অনুরাগী বলা যেতে পারে—আমার সঙ্গীতের ভঙ্গীর অপক্ষপাতী। আমার কেবল আক্ষেপ এই যে, আমি তাঁদের আমার গান যথেষ্ট শোনাতে পারি নি—পৃথ্বী বিপুলা ও কণ্ঠস্বরের ক্ষমতা বা ব্যাপকতা সীমাবদ্ধ ব'লে।

কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, এ সন্দেহ করবেন না যে, এ আক্ষেপটি ছাপার অক্ষরে দেখবার জন্তই আপনার পত্রিকার উপর অত্যাচার করতে আজ উদ্যত হয়েছি। আমার এ সব সূত্রে দু'চারটা ব্যক্তিগত কথা বলার ইচ্ছে আছে, যে রকম ধরণের কথা কেবল এইরূপ চিঠিতেই শোভা পায়—প্রবন্ধে নয়। প্রবন্ধ যত বেশী impersonal হয় ততই ভাল, অথচ personal কথা অনেক সময়ে না বললে বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা যায় না। তাই আরও দু'একটি ব্যক্তিগত কথা বলে আপনাদের ধৈর্য্যের সীমা পরখ করতে উদ্যত হচ্ছি (এবং সম্ভবত নিন্দাও কিছু লাভ হবে)।

কথাটা এই, আমার দাবী নূতন হ'লেও এবং আমি ক্ষুদ্রজন হ'লেও, আমি বিশ্বাস করি যে, আমার সঙ্গীতের অনুভূতির মধ্যে একটা মস্ত সত্য আছে। সে সত্যটি এই যে, সঙ্গীতকে বড় হ'য়ে উঠ্‌তে হ'লে এক দিকে যেমন ওস্তাদি সুরের দৌড়ঝাঁপকে বাদ দিতে হবে—অন্য দিকে তেম্‌নি কাব্যকেও একেবারে সর্ব্বেসর্ব্বা ক'রে তোলা এড়িয়ে চল্‌তে হবে। সুরের বিকাশের সমৃদ্ধি একটু বাড়ালে কাব্যের আবেদন হয় ত ততটা শক্তিশীল থাকে না। এ কথা মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় একদিন আমাকে ব'লেছিলেন। তিনি ব'লেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান যখন গান তখন তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে কাব্যের রসকেই উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরবার—সুর থাকে পিছনে প'ড়ে, শুধু সে কাব্যকে বহন করবার জন্যেই। পক্ষান্তরে আমি যখন তাঁর গান গাই তখন ব্যাপারটা হ'য়ে দাঁড়ায় ঠিক্ উল্টো—অর্থাৎ, সুরই হ'য়ে উঠে প্রধান, কাব্য যেন সুরকেই ব্যঞ্জনা দান করতে ব্যগ্র হ'য়ে উঠে। যতীন্দ্রবাবু উচ্চশিক্ষিত, অথচ সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ নন। কাজেই তাঁর কথাগুলি আমার অনুধাবনীয় মনে হ'য়েছিল প্রধানত এই কারণে যে, তাঁর এ কথাকে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত সমাজের রায়ের একটা নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাই তিনি যখন শেষে বল্‌লেন যে, তাঁরও মনে হয় কাব্যকে সর্ব্বেসর্ব্বা ক'রে তুলে ধরা সঙ্গীতকারের কর্ত্তব্য নয়—আবৃত্তিকারের কর্ত্তব্য—তখন আমি হৃষ্ট না হ'য়েই পারি নি।

কথাটা সত্য অথচ চিন্তনীয়। এর মধ্যে যে সত্য আছে তার কারণ এই যে, অনেক সঙ্গীতানুরাগীর মনেই এ রকম কথা বারবার মনে হ'য়েছে যে, গানকে নিতান্ত কাটাছাঁটা ভাবে গাইলে তার তৃপ্তিরস গভীর বা স্থায়ী হয় না। চিন্তনীয় এই জন্যে যে, সুরের অনন্তবিস্তার করতে গেলে আবার ভাবাত্মক গান মাটি হ'য়ে যায়। তাই আসল কথা দাঁড়ায়—"সৌষ্ঠবজ্ঞান" বা sense of proportion নিয়ে—অর্থাৎ কোথায় ও কেমন ক'রে সুরের ও কাব্যের সুষ্ঠু বিবাহ হ'তে পারে। এ প্রশ্নের মৌখিক উত্তর খুব সহজ, অর্থাৎ সুরের ও কাব্যের যথার্থ মিলনেই এ উদ্বাহ সম্ভব—একের দাবীকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করলে সে উদ্বাহ হ'তে দাঁড়ায় ব্যভিচার।" কিন্তু কার্য্যত প্রয়োগ ক'রে এ সত্যটির প্রমাণ দেখাতে পারেন—এক যথার্থ শিল্পী। কেন এ সত্যের প্রমাণ দেখানো কঠিন সে বিষয় কিছু বল্‌তে হ'লে দু একটা গোড়াকার কথায় যেতে হয়। হিন্দুস্থানী গানে শুধু সুরেরই প্রাধান্য। আমি নিজে এ শ্রেণীর সঙ্গীতের রসগ্রাহী হ'লেও মনে করি যে, এরূপ সঙ্গীত ঠিক্ পূর্ব্ব প্রণালীতে চালানো সম্ভব হবে না। কারণ এ প্রণালী antiquated বা archaic হ'য়ে গেছে। আর্টে antiquated বা archaic বস্তুর চর্চ্চার কোনও স্থান নেই, যাদুঘরে আছে। আর্টের "আর্টত্ব" নির্ভর করে তার প্রাণবন্ত হওয়ার উপর—এবং archaism মানে তার মধ্যে জীবন্ত অনুপ্রাণনার অভাব। লক্ষ্ণৌ

সঙ্গীতসম্মিলনে আমি এ কথার যাথার্থ্যের একটা মস্ত প্রমাণ পেয়েছিলাম—যেটি ব্যক্তিগত হ'লেও লিখতে যাচ্ছি পূর্ব্বোক্ত ভরসায় যে, এটি একটি চিঠি, প্রবন্ধ নয়।

লক্ষ্ণৌয়ে ওস্তাদের পর ওস্তাদ গান ক'রে যখন অমন সমজদার শ্রোতৃমণ্ডলীকেও অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলেন ও যখন শেষ দিনে একের পর এক ওস্তাদকে শেষে হাততালি দিয়ে "হুট" ক'রে থামাতে গেল, তখন আমাকে বাধ্য হ'য়ে গান গাইতে হয়েছিল। আমি গেয়েছিলাম মাত্র দুটি গান—একটি বেহাগ ভজন ও একটি মীরাবাইয়ের ঠুংরী। ফলে যে তুমুল হাততালি ও আঙ্কোর পাওয়া গেল সেটা বস্তুত আমার প্রাপ্য ব'লে গৌরব করতে পারলে আমার অহমিকা পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌ত সত্য, কিন্তু বস্তুত সে বাহবা প্রাপ্য ছিল আমার নয়, তা প্রাপ্য ছিল—আমার এই সহজ অনুভূতির যে, কথাকে খর্ব্ব ক'রে শুধু সুরকে নিয়ে টিটকার করলে লাভের মধ্যে হয় কেবল আজকালকার মনের মধ্যে একটা হাহাকারের সৃষ্টি। কণ্ঠসঙ্গীতে আজকের দিনে শুধু সুরের অনন্ত বিস্তারের পদ্ধতি antiquated হ'য়ে গেছে, উপায় নেই। এক সময়ে এ সমাপ্তিহীন সুরের বিস্তার জীবন্ত ছিল, আজ নেই। এ কথা সেদিন হঠাৎ সমগ্র চাঁদোয়ার উৎসাহিত জনমণ্ডলীর কাছ থেকে আমার সামান্য গানেও সাড়া পেয়ে আমার বেশি ক'রেই মনে হ'য়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার এ উপলব্ধিটি সেদিন দৃঢ়মূল হ'ল যে, কথার সঙ্গে সুরের একটা মনোজ্ঞ সামঞ্জস্যের বিকাশ সম্ভব। কারণ যদি সে দিন নিতান্ত কাটাছাঁটা ধরণে গান দুটি গাইতাম তা হ'লে যে লক্ষ্ণৌয়ের সঙ্গীতরসিক শ্রোতৃবৃন্দের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পেতাম না এটাও নিশ্চিত।

তাই আমার মনে হয় যে, হিন্দুস্থানী কণ্ঠসঙ্গীত যে কারণে আজ সভ্য সঙ্গীতানুরাগীর মনেও তেমন সাড়া তুল্‌তে পারে না, ঠিক্ সেই রকম কারণেই নিতান্ত কাটাছাঁটা সুরে গীত হ'লে ভাল কাব্যও সব-জড়িয়ে সঙ্গীতানুরাগীকে গভীর তৃপ্তি দিতে পারে না। অনেকে অবশ্য শ্রুতিমধুতাকেই সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতার চরম প্রামাণ্য মনে করেন। কিন্তু কোনও আর্টেরই বাইরের চাকচিক্যের আবেদনটি বড় নয়। কাটাছাঁটা গানে খানিকটা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখ হ'তে পারে—কিন্তু গভীর তৃপ্তি মেলে না, এটা হচ্ছে আমার প্রধান বলবার কথা। তাই আমার মনে হয় যে, এ কথা ব'লে কোনও লাভ নেই যে, "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এক, বাংলা সঙ্গীত আর, তাই তুলনা কোরো না।" আসল কথা, দুইই যখন সঙ্গীত তখন তাদের রসগ্রহণ সঙ্গীতের দিক্ দিয়ে খানিকটা করতেই হবে। মানুষের মন তৃপ্তি পেলেই অনুরূপ তৃপ্তির সঙ্গে তার তুলনা করতে বাধ্য—তা সে তুলনা সে মুখেই প্রকাশ করুক বা নাই করুক।

কাজেই বাংলা সঙ্গীতকে যদি বড় হ'তে হয় তাহ'লে একদিকে যেমন তাকে কাব্যে সুন্দর হ'তে হবে অপর দিকে তেম্‌নি তাকে সুরৈশ্বর্য্যেও সমৃদ্ধ হ'তে হবে।* এ মনোজ্ঞ সামঞ্জস্যে যে রসটি ফুটে উঠতে পারে সেটি নিয়ে আমি আজ এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করছি বটে, কিন্তু এ এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের ফলে বোধ হয় গুটিকতক সত্য পেয়েছি ব'লে দাবী করতে পারি। সংক্ষেপে এ আবিষ্কারগুলিকে চার পর্য্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে :—(১) কোনও সুগায়ক কোনও কাটাছাঁটা ভাবে গাইতে ভালবাসেন না, তাতে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব সমগ্রভাবে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন না ব'লে। (২) সুরকে খেলিয়ে গানের সঙ্গীতরসকে একটু উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরলে তারপর কাটাছাঁটা সুর যাকে বলে "জমে না"। (৩) খেলানো সুর বারবার গাইতেও ক্লান্তি আসে না—যেমন কাটাছাঁটা সুর গাইতে আসে † ও (৪)

* এ বিষয়ে আগামী কার্ত্তিকের সবুজ পত্রে লেখকের "রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক কথোপকথন দ্রষ্টব্য।

† এখানে মনে রাখ্‌তে হবে যে, আমি "সুগায়ক" কথাটি ব্যবহার ক'রেছি "সাধারণ গায়ক" কথাটি নয়। সুগায়ক বল্‌তে আমি বুঝতে চাই যাঁর স্বরবৈচিত্র্য দেবার কল্পনা আছে ও সে কল্পনাকে ফুটিয়ে তোল্‌বার মত কণ্ঠসাধনা আছে। কেননা সাধারণ গায়ক যে নিরুপায় হ'য়ে একই কাটাছাঁটা গান বারবার গেয়ে থাকেন সেটা প্রামাণ্য নয় এই জন্যে যে, তাঁর সুরকে নিয়ে আদর করবার বা খেলানোর ক্ষমতাই নেই। সব আর্টের ন্যায় সঙ্গীতেও সাধনা প্রয়োজন এবং সাধকের অভিজ্ঞতাই বেশি প্রামাণ্য—অনভিজ্ঞের রায় নয়।

কাটাছাঁটা সুর প্রথম বার কয়েক ভাল লাগে বটে কিন্তু তারপর সে এতই পরিচিত হ'য়ে ওঠে যে, তার আবেদন বড়ই একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে।

আমার শিক্ষানবিশি এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের আরও অনেক আবিষ্কার লিখ্‌তে পারতাম ; কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, জোর-জার ক'রে আপনাকে আমার গানের ওকালতি আর কত শোনাই বলুন। একটা ত চক্ষুলজ্জা আছে ? এটা চিঠি, প্রবন্ধ নয়, এ ওজরে আর কত অনুচিত আত্মজাহির করব বলুন ? মাত্র অল্পদিন হ'ল গায়ক ব'লে লোকসমাজে মুখ দেখাতে সুরু ক'রেছি—এর মধ্যে কি চক্ষুলজ্জারূপ বিড়ম্বনাটিকে এর চেয়ে বেশি বিসর্জ্জন দেওয়া সম্ভব ? বলুন ত ? ইতি

স্বরচনা-ছাপার-হরফে-দেখ্‌তে-উৎসাহী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

"তুমি যে

সুরের আগুন

লাগিয়ে

দিলে

মোর

প্রাণে,

সে

আগুন

ছড়িয়ে

গেল

সব

খানে"

—রবীন্দ্রনাথ

গোত্রহীনের মা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

বিদেশেই চিরদিন প'ড়ে ছিলুম! সুতরাং জন্মভূমির সঙ্গে পরিচয় ছিল না বল্লেই হয়। কিন্তু তবু একদিন গাঁয়ের মাটি তাঁর অদৃশ্য অথচ অত্যন্ত দৃঢ় স্নেহের ডোরটা ধ'রে যখন টান দিলেন তখন তাঁর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়্‌তেও দেরী করতে পারলুম না। কল্‌কাতা থেকেই ঠিক ক'রে এলুম, এবার Privilege leave-এর পাওনা ছ'টা মাস এই দেশের মাটিতেই কাটিয়ে যাব।

দেশের গাছপালা, নদীনালা, মাঠপ্রান্তরের ভিতর যতই বৈচিত্র্য থাক না কেন, লোকগুলোর ভেতর যে কোনই বৈচিত্র্য ছিল না সে কথা হয় তো না বল্‌লেও চলে। সব একই রকমের ছাঁচে ঢালা। তাস পাশার আড্ডায় রাজা-উজির মারা,গোপনে পরস্পরের কুৎসা রটিয়ে বেড়ানো, সামান্য স্বার্থ নিয়ে ইতরের মতো গালাগালি ও হাতহাতি—এই ছিল প্রত্যেকের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। সুতরাং জীবনটা ক্রমেই একঘেয়ে হ'য়ে উঠ্‌ছিল। এই একটানা জীবনকে মাঝে মাঝে সরস ক'রে তুল্‌ত কেবল একজন। চিরদিন পল্লীর মাঝে থেকেও পল্লীর আর কোন লোকের সাথে কোনখানেই তার কোন রকমের মিল ছিল না।

যার কথা বল্‌ছি, সে ছিল আমার পাশের বাড়ীরই চিররুগ্ন বাপের একমাত্র মেয়ে সুষমা। গ্রামের সুবাদে সে আমার বোন হ'তো। সহরের লোকের কাছে পাড়াগাঁয়ের মেয়েও যে বিস্ময়ের বস্তু হ'তে পারে এই মেয়েটিকে না দেখ্‌লে তা হয় তো কেউ বুঝ্‌তে পারবে না, অন্ততঃ আমি যে বুঝ্‌তে পারতুম না তাতে এতটুকুও ভুল নেই।

বাড়ী এসেই প্রথম যেদিন তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম, নিঃসঙ্কোচেই সে বেরিয়ে এসে আমাকে বসতে আসন দিয়ে প্রণাম করে বল্‌লে, দেশটাকে তাহ'লে সত্যি সত্যি এবার মনে পড়্‌ল নীহার-দা।

আমি বল্‌লুম, তোরা তো মনে করবি নে কখনো, তাই তো আমি নিজেই এলুম ঝালিয়ে নিতে আমার স্নেহের দেনা-পাওনাগুলো! আশা করি এখনো ওগুলো একেবারে বাতিল হয়ে যায় নি! কিন্তু দাবী যদি কখনো ভারি হয় সইতে পারবি তো!

সুষমা বল্‌লে, একবার যাচাই ক'রেই দেখো না! —সত্যি এবার কিছুদিন বাড়ীতে থাকৃছ তাহ'লে!

আমি বল্‌লুম, ইচ্ছা তো আছে, যদি তোরা তাড়িয়ে না দিস্।

সুষমা একটু হেসে বল্‌লে, তাই থাকো নীহার-দা! তোমরা যারা গাঁ-টাকে ভালো ক'রে রাখ্‌তে পারতে তারা সবাই একে একে বিদায় নিয়েছ ব'লেই তো গাঁ-টার আজ এত দুর্দ্দশা। আমরা না হয় কেউ নই, কিন্তু যে ভুঁইটা সবপ্রথম বুকে টেনে নিয়েছিল সেও কি তোমাদের কেউ নয়? আমি তো বুঝ্‌তেই পারি নে, গাঁয়ের মাটিকে ভালো না বেসে দেশের মা-টিকে মানুষ কি ক'রে ভালো বাস্‌তে পারে!

বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লুম,তুই তবে দেশের কথাও ভাবিস্?

সে হেসে উত্তর দিলে, না নীহার-দা, ওসব বালাই আমার নেই। নিজেকেই এ পর্য্যন্ত চিন্‌তে পারলাম না—তা আবার দেশ!

কিন্তু সে তাকে চিন্‌তে না পারলেও আমি হয় তো তাকে কতকটা চিনতে পেরেছিলুম। তাই তা'র সম্বন্ধে আমার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।

সুষমা ছিল কুলীনের মেয়ে। সুতরাং বিয়ের বয়স ঢের দিন পেরিয়ে গেলেও সে তখনো অবিবাহিতই র'য়ে গেছ্‌ল এবং তার যে কখনো তার বিয়ে হবে তারও সম্ভাবনা ছিল না। পাত্রের দুষ্প্রাপ্যতাই যে তার বিবাহ না-হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল তাও মনে হয় না। পাত্র হয় তো তার জুটত কিন্তু বাপের অসুখের দোহাই দিয়ে বিয়ের কথা উঠ্‌তেই মেয়েটি এমন ভাবে বেঁকে বস্‌তেন যে, বাপকেই হাল ছেড়ে দিয়ে বাধ্য হ'য়ে হার মান্‌তে হ'তো।

কিন্তু বিয়ে না কর্‌লেও সুষমার ব্রত-নিয়ম পালনের অন্ত ছিল না। সে মাছ পরিত্যাগ করেছিল, একবেলা খেত—তাও হবিষ্যান্ন, পান খেত না, দেহটাকে সমস্ত রকমের অলঙ্কার হ'তে বঞ্চিত করেছিল; ভেজা কাপড় রোদে না শুকিয়ে নিজের গায়েই শুকিয়ে নিত। কখনো কখনো দেখা যেত, সামনে তিন চার দিন সে জলটুকুও স্পর্শ না ক'রে কাটিয়ে দিচ্ছে!

আমার অনেক সময় মনে হ'তো সুষমার এই আত্ম-নির্য্যাতন খুব স্বাভাবিক জিনিষ নয়, এমন কি মানুষ তার রিপুগুলোকে দমন কর্‌বার জন্যে যে সব শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলে এগুলোর সঙ্গে তারও বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নেই। একটা বিশ্বাস কি ক'রে যে আমার মনের ভেতর বদ্ধমূল হ'য়ে গেছ্‌ল জানি নে, কিন্তু এ ধারণা কিছুতেই আমি দূর কর্‌তে পার্‌ছিলুম না যে, তার মনের ভেতর কোথায় যেন একটা অপরাধের অনুতাপ অহর্নিশি কাঁটার মতো বিঁধে আছে এবং এ আত্মনিপীড়ন তারি ফল। মানুষ তার নিজেকে যেমন ভাবে পীড়ন কর্‌তে পারে তেমন ক'রে তাকে পীড়ন কর্‌তে আর কেউ পারে না।

এই কৃচ্ছসাধন মনের দিক দিয়ে সুষমার ওপর যত বড় দুঃখের বোঝাই চাপিয়ে দিক না কেন, দেহের দিক দিয়ে তার সংযম তাকে একটা অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য দান করেছিল। ব্রহ্মচারিণীর নিষ্ঠায় তার তরুণ দেহটাকে দেখাতো একটা আগুনের শিখার মতো! কৃশ অথচ দীপ্ত, ম্লান অথচ তেজস্বী এই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে পাড়ার ব্রাহ্মণেতর জাতিরা বল্‌ত, হাঁ বামুনের মেয়ে বটে। আর ব্রাহ্মণেরা বল্‌ত—একেই বলে তপঃসিদ্ধ।

কিন্তু এই বাইরের দীপ্তিটা যে তার কিছুই নয়, তা সেই দিনই টের পেলুম, যে দিন তার জীবনে একটা গোপন অধ্যায় একান্ত আকস্মিক ভাবেই আমার চোখের সম্মুখে খুলে গেল। সেদিন লোকের কাছে সব দীপ্তি হারিয়ে সে ম্লান হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমার কাছে সেই দিনই নতুন ক'রে ধরা প'ড়ে গেল আগুনের সেই দীপ্তিটা যা ধ্বংস করে অথচ যা ক্লেদাক্ত জিনিষটাকেও শুচি শুভ্র ক'রে রেখে যায়।

* *
*

সে দিন ভোরে উঠেই দেখি, নদীর ধারের মাঠটা হঠাৎ একেবারে লোকের মাথায় মাথায় ভ'রে উঠ্‌ছে। এ লোক সমাগম যে কিসের জন্য তা অ'নুতুম না—জান্‌বার বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না। পাড়াগাঁয়ের হুজুক হয় তো বিনা কারণেই বেড়ে উঠেছে মনে ক'রে, কেবল একখানা বই-এর পাতা খুলে বসেছি, সুষমা ঝড়ের মত ঘরের ভেতর ঢুকে বল্‌লে,—নীহার-দা, তোমার বই রাখ, আমার সঙ্গে একবার উঠে এস ভাই।

আমি বল্‌লুম—কোথায় যেতে হবে?

সে বল্‌লে—ঐ মাঠের মধ্যে।

আমি বল্‌লুম—এ আবার তোর কি খেয়াল? হয় তো ওখানে একটা সন্ন্যাসী এসেছে, কি বেদের মেয়ে তার ভোজবাজীর কসরৎ দেখাচ্ছে, কি এমনি ধরণের আর একটা কিছু হচ্ছে এরি জন্য তোকেও ঐ ভিড়ের ভিতর ছুটতে হবে।

সুষমা বল্‌লে—তুমি ওঠো নীহার-দা, যা জানো না তা নিয়ে তর্ক ক'রো না।

ধমক খেয়ে মনটা একটু বেঁকে গেল, কিন্তু সে ধমকের ভিতর এমন একটা জোর ছিল যে, তাকে অগ্রাহ্যও কর্‌তে

পারলুম না। চাদরটা কাঁধে জড়িয়ে সুষমার সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়্‌লুম।

পথে পথে চল্‌তে চল্‌তে সুরমার মুখের দিকে চেয়ে দেখি সে মুখ ইস্পাতেব মত শক্ত কঠিন কিন্তু ইস্পাতের মতোই চক্‌চক্‌ করছে। তার ভিতর গলিয়ে কোনো কিছুর যে সন্ধান পাবো—তারও কোন উপায় নেই।

প্রায় ভিড়ের কাছে এসে পড়েছি, হঠাৎ একটা সদ্য জাত শিশুর কান্না কানের দোরে এসে ঘা দিলে। সুষমা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—ঐ শুন্‌ছ নীহার-দা—আহা বাছারে!

তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, এবার পাষাণ গ'লে ঝরণা নেমেছে। তার অত কঠিন মুখটা এক নিমেষে বেদনায় আর্দ্র হ'য়ে করুণায় গ'লে এমন কোমল হ'য়ে উঠ্‌ল যে, সে যে সুষমার মুখ তাও যেন চিন্‌তে পারা যায় না।

কল্পনার কাগজটাতে সবে মাত্র তুলির টান পড়েছে এমন সময় সে কান্নার শব্দ ছাপিয়ে জেগে উঠল পাড়ার রসিক ঠাকুরের কণ্ঠস্বর। শুনলুম, সে চীৎকার ক'রে বল্‌ছে—আ মর ছোঁড়া আবার কাঁদ্‌চে। ছিঃ ছিঃ মরণও হয় না তাদের যাদের এই কীর্ত্তি। কি কলঙ্কের কথা! নিজেকে সামলাতে যদি না পারিস, তবে এগুলোকেই বা চোখের সাম্‌নে এমন ক'রে ফেলে রাখা কেন?

সে না থাম্‌তেই সর্ব্বেশ্বর তার কথাটাতে ফোড়ং দিয়ে বল্‌লে—যা বলেছ রসিক-দা! দিন দিন এ সব কি হচ্ছে। এ রকমের দুর্ব্বলতা তো আগে ছিল না। মানুষ সব সময় আপনাকে সাম্‌লাতে পারে না জানি, কিন্তু তাই ব'লে কি কলঙ্কের ছাপ পথে ঘাটে ফেলে রেখে নিজেদের অধঃ-পতনের বড়াই কর্‌তে হবে! আর ওদেরকে পৃথিবীতেই বা আনা কেন? সমাজের কোন স্তরেই তো ওরা মুখ তুলে দাঁড়াতে পার্‌বে না।

হরিশ ঘোষ কিন্তু এ কথার সমর্থন করলে না। সে বল্‌লে, ঠাকুর তোমরা তো সকলে সকল কথাই বল্‌লে। কিন্তু মায়ের মনটাকেও তো দেখ্‌তে হবে, মনের দুর্ব্বলতা কম বেশী সব মানুষেরই আছে। একটা পাপের হাত হ'তে এড়াতে পারে নি ব'লেই যে আরও একটা পাপ কর্‌তে হবে কোনো শাস্ত্রেই তো তেমন কথা লেখে না।

রসিক ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্‌লে—বেটা শূদ্দুর, আবার শাস্তর আওড়াচ্ছে। দু'পাতা ইংরেজী পড়েছে কি না! কি হে বাপু, এত যে দরদ দেখ্‌ছি, কাজটা কি তোমারি নাকি!

এই বিশ্রী ইঙ্গিতে সকলে হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। কিন্তু এ হাসিকে হরিশ নির্ব্বিবাদে সহ্য কর্‌লে না, সে বল্‌লে—রসিক ঠাকুর, তুমি আর বড়াই ক'রো না। তোমার কীর্ত্তি-কলাপ এ গ্রামের কেই বা না জানে। বামী জেলেনীর কথা এখনো এ গ্রামের কেউ ভোলে নি।

এবার রসিক একেবারে মারমূর্ত্তি ধারণ ক'রে বল্‌লে—ভোলে নি তো ব'য়েই গেছে। রসিক চক্রবর্ত্তী ব্যাটা ছেলে। ওর জন্যে তার জাত যাবে না। কিন্তু সে কথা নিয়ে তোর অত মাথাব্যথা কেন বাপু! বেটা ব্রাহ্মণ-দ্বেষী ম্লেচ্ছ কোথাকার!

হরিশও তার সমান তালেই গলা ছাড়্‌লে, বল্‌লে—গাল দিও না ঠাকুর। তুমি তো জান রসিকের রসিকতা ভেঙে দেবার মতো জোর আমার এই দেহেই আছে। আর ঠাকুর বামুন যে আমি মানি নে তা ঐ ম্লেচ্ছ উপাধিটা দিয়ে তুমিই তো স্বীকার করে নিয়েছ।

এই হট্টগোলে কখন যে পা'র গতিটা থেমে পড়েছিল মনে নেই। হঠাৎ সুষমার কথাতেই চলচ্ছক্তি হীনতার কথাটা ধরা পড়্‌ল। সুষমা বল্‌ছে—ছিঃ নীহার-দা, ওকি ইতরোমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছ তুমি! তার চেয়ে এগিয়ে চল ভাই। অতটুকু শিশু—তার দুঃখের কথা মনে ক'রেও কি করুণা হয় না তোমাদের।

ধীরে ধীরে ভিড়ের ভিতর ঢুকে প'ড়ে সাম্‌নের দিকে চাইতেই দেখ্‌তে পেলুম,—একটি সদ্য প্রসূত শিশু, রং তার তরুণ সূর্য্যের আলোতে দপ্‌ দপ্‌ কর্‌ছে—ঠিক একটা ভোরের ফোটা স্থলপদ্মের মতো।

হয় তো রোদের আঁচ লেগেই ছেলেটা আবার কেঁদে উঠ্‌ল। কিন্তু সে কান্না থাম্‌বার আগেই সুষমা ছুটে গিয়ে দু'টো হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে নিয়ে বুকের ভিতর চেপে ধর্‌লে। চেয়ে দেখ্‌লুম—তার চোখে জল, ঠোঁটের

কোণে মিষ্টি হাসি এবং সমস্ত মুখটা ছেয়ে র‍্যাফেলের 'মা' জেগে উঠেছে।

সাপের উদ্যত ফণার সাম্নে খানিকটা কার্ব্বলিক এসিড ঢেলে দিলে তার ফণা যেমন আপনা হ'তেই নেমে পড়ে, সব উত্তেজনা যেন মন্ত্রের বলেই শান্ত হ'য়ে গেল। সেই মন্ত্রমুগ্ধ জনতার ভিতর দিয়ে ছেলেটাকে বুকে ক'রে সুষমা ধীরে ধীরে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—এইবার আমাকে বাড়ী নিয়ে চল নীহার-দা!

* * *

গাঁয়ের পার্লামেণ্ট হ'তে এক মুহূর্ত্তে পাশ হ'য়ে গেল যে, সুষমার নিয়ম-কানুন, আচার-ব্রত সবই ছিল ভণ্ডামি। দু' এক জনে এমন কথাও বল্‌লে যে, তারা বরাবরই জান্‌ত যে, ও মেয়েটা তেমন সুবিধের নয়। তার কৃচ্ছ্রসাধন ছিল কেবল লোকের চোখকে ফাঁকি দেবার ফন্দি। নইলে কেউ নাকি আবার এত বয়স পর্য্যন্ত ইচ্ছে ক'রে আইবুড়ো থাকে। যে সুষমা সারা গ্রামের আদর্শ ছিল, এক দণ্ডে তাকে পথের ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে মাড়িয়ে যেতেও কারো বাধ্‌ল না।

কিন্তু ব্যাপারটা এই অসাক্ষাতের নিন্দেতেই শেষ হ'ল না। এ নিয়ে গ্রামে যে ঘোট পাকিয়ে উঠ্‌ল সে দিনকার স্নানের ঘাটের উত্তেজনার চাইতেও তার জোর ছিল ঢের বেশী। সমাজপতিরা শিউরে উঠে এর প্রতিকারের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'য়ে উঠ্‌লেন।

তখন কেবল সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠেছে, প্রাতঃকালে সেই জনতা আবার ভিড় পাকিয়ে জমে উঠল্ সুষমাদের ঝকঝকে, গোবর দিয়ে নিকানো পরিষ্কার উঠানটার মাঝখানে।

সেই রসিক ঠাকুর এখানেও হেঁকে বল্‌লেন—সুষমা, তোমার এ অনাচার আমরা সইতে পার্‌ছি নে। তোমার জবাব দেবার কি আছে বল।

সুষমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্‌লে—জবাব দেবার মতো হয় তো অনেকই আমার আছে, কিন্তু আমার জবাব নেবে কে শুনি?

—গ্রামের দশজন, যাঁদের নিয়ে সমাজ তাদের সকলেই আজ এখানে হাজির আছেন।

সুষমা বল্‌লে—কিন্তু যে সমাজ একটা সদ্যজাত শিশুকে পথের মাঝে ফেলে রেখে নির্লজ্জের মতো হল্লা কর্‌তে পারে, তার কাছে আমার জবাবদিহি কর্‌বার কিছু নেই।

রসিক বললেন—তোমার না থাকলেও সমাজের হয় তো আছে। তবে তুমি যদি সমাজ না মানো সে আলাদা কথা।

সুষমার স্বরের ভিতর এতক্ষণ কেবল একটা কঠোর তীক্ষ্ণতাই ছিল; এবার তার সেই তীক্ষ্ণতাকেও ছাপিয়ে উঠ্‌ল একটা বিপুল ঔদাসীন্যের আভাস। সে বল্‌লে—মানবো না ব'লেই তো তোমাদের মতো শিশুটাকে পথের মাঝে ফেলে কুস্তি লড়্‌তে পারি নি, তাকে বুকে তুলে নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছি।

রসিক। কিন্তু সমাজ তো জড় পদার্থ নয়; তাকে অপমান কর্‌লে সে তার শাস্তি কড়ায় গণ্ডায় বুঝে আদায় কর্‌তে জানে, সে কথাটাও তা হ'লে তোমার জেনে রাখা উচিত!

সুষমা এবার হেসে বল্‌লে—নিজেকে যে কোনো শাস্তির হাত থেকেই রেয়াৎ দেয় নি, সমাজ তাকে আর নতুন ক'রে কি শাস্তি দেবে ঠাকুর? কিন্তু তুমি যে এত শাস্তির কথা বলছ, সমাজের হাত থেকে তোমার নিজের প্রাপ্য শাস্তিটা বুঝে নিয়েছ তো?

রসিক আবার কি বল্‌তে যাচ্ছিল—কিন্তু তাকে বাধা দিয়া বুড়ো তর্কালঙ্কার মশাই বল্‌লেন—মা লক্ষ্মী, তোমার অন্তরের কথা আমি বুঝেছি, কিন্তু সমাজের দিকেও তো একবার তাকাতে হবে; নইলে সমাজ যদি উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে পড়ে, তবে তো সুখ কারো বাড়্‌বে না মা। যে দুঃখের হাত থেকে তুমি মানুষকে বাঁচাতে চাচ্ছ, সেই দুঃখই যে তখন নিদারুণ হ'য়ে উঠে' তোমাদের কোমল মনকেই পীড়ন ক'রে জর্জ্জর ক'রে তুল্‌বে—সে কথাটাও তো একবার ভেবে দেখ্‌তে হয়।

সুষমা বল্‌লে—কিন্তু তর্কালঙ্কার কাকা, একটা অসহায় শিশুকে মৃত্যুর পথে পাঠিয়ে দিলেই কি সমাজের সব

ভুল শুধরে যাবে! ঐ শিশুর ওপরেও তো সমাজের কর্ত্তব্য আছে।

—আছে বই কি মা। আজ কাল তো অনাথ-আশ্রমের অভাব নেই। ওকে সমাজের ভিতর তুলে না নিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দিলেও তো সে দায়িত্ব পালন করা হয়।

সুষমা বল্লে—আপনার সঙ্গে তর্ক করব সে প্রগল্ভতা আমার নেই তর্কালঙ্কার কাকা। কিন্তু আমার মনে হয়, ঐ সব অনাথ আশ্রমে ছেলে পাঠানো আর স্নেহ-শূন্য মায়া-শূন্য কলের হাতে ছেলেমানুষ করার ভার ছেড়ে দেওয়া তো একই কথা। পয়সা নিয়ে যারা পালন করবার ভার গ্রহণ করে, তারা সে স্নেহ কোথায় পাবে যা শিশুর রক্তের সঙ্গে মিশে তাকে মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলে। অবশ্য ও যে মন্দের ভালো তা আমি অস্বীকার করছি নে। কিন্তু রোদ, হাওয়া, মাটির রস যেমন ফুলটাকে বর্ণ দেয়, গন্ধ দেয়, ফল ধারণের উপযোগী ক'রে তোলে, শিশুকে মানুষ করতেও যে তেমনি স্নেহ মায়া মমতা মা'র হৃদয়ের দরকার হয়। তর্কালঙ্কার কাকা, আমার তো সংসারে কোন বন্ধনই নেই —আমিই না হয় ওর মা হ'য়ে ওকে মানুষ ক'রে তুলুম। সমাজের তাতে কোথায় কি ক্ষতি হচ্ছে সে তো আমি কোনো রকমই বুঝে উঠ্‌তে পারছি নে।

চোখের জলে সুষমার গলার স্বরটা ভিজে ভারি হয়ে উঠ্‌ল। সে তাড়াতাড়ি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে উদ্গত জলের ধারাটা মুছে ফেলে আবার বল্‌লে—তার চেয়ে তর্কালঙ্কার কাকা, সমাজের যথার্থ উপকার যদি করতে চান তবে সত্যটাকে চাপা না দিয়ে যারা আসল অপরাধী, ওর সেই কাপুরুষ বাপ-মাকে খুঁজে বার ক'রে দণ্ড দিতে চেষ্টা করুন। নির্দ্দোষীকে শাস্তি দিয়ে কোনো পাপকে যে কখনো বন্ধ করা যায় না, এই সব নাম-গোত্রহীন ছেলে-মেয়েগুলোই তো তার প্রমাণ।

তুষারের মত শুভ্র চুলের গোছার ভেতরে শীর্ণ শিরা-বহুল হাতের আঙ্গুলগুলো বুলোতে বুলোতে বৃদ্ধ তর্কালঙ্কার বল্‌লেন—এ দিক দিয়ে যে সমস্যাটাকে এমন ক'রে ভেবে দেখ্‌বার কারণ থাকতে পারে, সে কথাটা তো এর আগে কোনো দিন মনে পড়ে নি মা। রসিক, এ কথা গুলো আর একবার ভালো ক'রে বিচার না ক'রে তো সুষমাকে আমি ঐ ছেলেটিকে আর ফিরিয়ে দিতেও বল্‌তে পারি নে। তারপর তর্কালঙ্কার ঠাকুর একটু স্তব্ধ হ'য়ে থেকে আবার ব'লে উঠ্‌লেন,—কিন্তু মা, আমি বুঝ্‌তে পারছি নে আমার এই বুড়ো পাকা মাথাটাতে যে কথাটা ঢুকল না, তোর তপঃক্লিষ্ট, আচার-নিয়মের বেড়াজালে ঘেরা মনে সে কথাটা একমুহূর্ত্তেই এমন ক'রে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল কি ক'রে? যুক্তি মান্‌তে গেলে তো এর ঠিক উল্টো জিনিষটাই হওয়া উচিত ছিল! কিন্তু সে যাই হোক, বিপদে যদি কখনো পড়িস্ তবে তোর এই অক্ষম তর্কালঙ্কার কাকা যে তোকে পরিত্যাগ করবে না, এ কথা তোকে নিশ্চয় ক'রেই জানিয়ে গেলুম—আর তাদেরকেও জানিয়ে যাচ্ছি যারা আজ তোর এখানে দল বেঁধে এসেছে তোকে অপদস্থ করতে। বলেই তিনি ধীরে ধীরে যেমন ভাবে এসেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবেই জনতা ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন।

সুষমা দোর পর্য্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বল্‌লে—আপনারা যাঁরা দয়া ক'রে আমার ঘরে পায়ের ধূলো দিয়েছেন, এইবার তাঁরাও উঠুন। আপনারা আমার ওপর যে সামাজিক দণ্ড বিধান করবেন, আমি নতশিরে তা গ্রহণ করব। কিন্তু ছেলেটাকে আমি ত্যাগ করতে পারব না। বলেই সে ঘরে ঢু'কে সকলের মুখের ওপরে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

* * *

রাত তখন অনেক হয়েছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই মনে হ'ল, কার করুণ কান্না যেন জানালা গলিয়ে আমার বিছানার ওপরেই লুটিয়ে পড়ছে। বাইরের দিকে তাকাতেই দেখি, আকাশের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত চাঁদের অগাধ অজস্র আলোকে উচ্ছসিত। কান্নার সুর আর আলোর ধারা আমাকে হাতছানি দিলে। মানুষকে যখন নিশীথে পায়, ঘরের মানুষ নাকি তখন টের

না পেয়েও বাইরে পথের ওপরে ছুটে' আসে। আমাকে কোন্ নিশীথে পেয়েছিল জানি নে, কিন্তু দোর খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই কান্নার শব্দটা আমার কানের কাছে আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। মনে হ'ল, কে যেন তাকে প্রাণপণে চাপ্‌তে চাচ্ছে অথচ কিছুতেই চাপ্‌তে পার্‌ছে না। মনের সমস্ত শাসন না মেনেই সে যেন বেরিয়ে আস্‌ছে এই নিশীথ রাত্রির শুব্ধ বুকটাকে একটা করুণ বেদনার রাগিণীতে ভ'রে দিয়ে। আরো একটু মনোযোগ দিতেই বুঝ্‌তে পার্‌লুম, প্রাণের হাহাকারের এ রুদ্ধ উচ্ছাস কাল্পনিক তো নয়ই— সাম্‌নের প্রান্তর থেকেই সেটা ভেসে আস্‌ছে।

আমাদের বাড়ীর কয়েক বিঘে জমির একটু ফাঁকা যায়গার পরেই সুষমাদের বাড়ী! তার পরেই পল্লীগ্রামের বিস্তৃত মাঠ—ধূ ধূ করা বিরাট শূন্যতার রাজ্য। যন্ত্র চালিতের মতো ঘর থেকে নেমে সেই কান্নার উদ্দেশে মাঠের ভিতর বেরিয়ে পড়্‌লুম। কিন্তু খুব বেশী দূর যেতে হ'ল না। সুষমাদের বাড়ীটা কেবল ছাড়িয়ে এসেছি, দেখি বকুল গাছের অন্ধকারে কে একজন বুক-ফাটা ব্যথায় গুম্‌রে গুম্‌রে উঠ্‌ছে। কোনো পর্ব্বতের গুহার ভিতর আট্‌কে প'ড়ে নদী যখন তার সমস্ত জলটা বাইরে ছড়িয়ে দিতে পারে না, তখন তার ভেতর যে, আকুল আর্ত্তনাদ উঠ্‌তে থাকে, এ কান্নার শব্দ কতকটা তেমনি ধরণের।

আরো একটু এগিয়ে যেতেই বুঝ্‌তে পার্‌লুম, কার বুকের ব্যথা এই নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নার ধারার ভেতরেও রোদনের বন্যার সৃষ্টি করেছে। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে ঠিক তার পাশটাতেই হাঁটু গেড়ে বসে ডাক্‌লুম— সুষমা!

বুকের কাছটাতে বাণ বিঁধলে হরিণ যেমন ক'রে চম্‌কে লাফিয়ে ওঠে, সুষমা তেমনি ক'রে চম্‌কে উঠে' আমার দিকে তার বড় বড় করুণ চোখ দুটো তুলে তাকালে, তারপর কান্না-ভেজা সুরে বল্‌লে—বাবার দুঃখ বাঁচাতে গিয়ে তোমার শান্তি নষ্ট কর্‌লুম—সে জন্যে আমায় মাপ ক'রো নীহার-দা। কিন্তু তুমি যে এত রাত্রিতেও ঘুমোও নি সে তো আমি জান্‌তুম না।

আমি বল্‌লুম—জীবনে শান্তিই তো সব চেয়ে বড় জিনিষ নয়! কিন্তু কি তোর এত ব্যথা, যা জ্যোৎস্নার চোখেও জলের রেখা টেনে দিয়েছে? ভাইয়ের কাছে কোনো কথা লুকুস নে সুষমা।

দেখ্‌লুম সুষমার মুখে সেই দীপ্তিটা ফিরে এসেছে, যে দীপ্তি তার কঠোর নিষ্ঠার ফল। সেই দীপ্তির ওপর ম্লান হাসির একটা রেখা টেনে দিয়ে সে বল্‌লে—কিন্তু আমার সব কথা তো বল্‌বার মতো নয় নীহার-দা। নারীর এমন অপরাধও আছে যা ভাইয়ের কাছেও বলা যায় না।

—যে ভাই বন্ধুত্বের দাবী করে তার কাছে কিছু না লুকোলেও দোষ হয় না। আমাকে তোর গ্রামের আর দশজনের মতো মনে না কর্‌লেও তো পারিস্।

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে সজোরে মাথাটা নেড়ে সুষমা বল্‌লে—তা তো কোনো দিনই মনে করি নি। কিন্তু যার কলঙ্কের শেষ নেই, সে তার কলঙ্কের কথা কি করেই বা পুরুষের সাম্‌নে প্রকাশ করবে? কিন্তু তুমি যা জেনেছ সে-ই ঢের নীহার-দা! তার বেশী আর কিছু জান্‌তে চেও না!

আমি বল্‌লুম,—বেশ, তা না হয় না-ই জান্‌তে চাইলুম —কিন্তু ঐ পরিত্যক্ত ছেলেটাকে ঘরে তুলে নিয়ে তুই মিথ্যা কেন লোকের লাঞ্ছনা নিজের ওপরে টেনে আন্‌ছিস্, তার কারণটাও কি ভায়ের কাছে ব্যক্ত করা যায় না?

সুষমার অশ্রু-সজল দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন শুকিয়ে আগুনের মতো জ্বালাময় হ'য়ে উঠ্‌ল। তার পর সেই দৃষ্টিটা আমার মুখের ওপরে ফেলে সে বল্‌লে—যে শিশুটাকে আজ আমি বুকে তুলে নিয়েছি, তোমরা হয় তো তার মা'র দুর্ব্বলতাটুকুই মাপ কর্‌তে পার্‌ছ না, কিন্তু আমিই জানি, এ রকমের দুর্ব্বলতা এ দেশের এক-আধ জনের নয়, অনেকের ভেতরেই আছে। আর সে দুর্ব্বলতার জন্য জীবনের বাকী দিনগুলি ধ'রে তারা যে রকমের প্রায়শ্চিত্ত করে, তোমরা তার কল্পনাও কর্‌তে পার না। তোমাদের সমাজ বা আইনের হাতে এমন কোন্ দণ্ড আছে যা তার চাইতে কঠোর, যা সেই নিঃসহায় মা সহ্য করে, যে তার পুত্রকে নিতান্ত নিরুপায় হ'য়েই বিসর্জ্জন দিয়েছে। সব কাজের ফাঁকে,

দিনের আলোকে, নিশীথ রাতের অন্ধকারে, যখন অসহায় পরিত্যক্ত শিশুটার মুখ তার মনে পড়ে, তখন সে যে পাগল হ'য়ে যায় না, সে তো তার নিজের প্রায়শ্চিত্তটাকে নির্ম্মম ভাবে সহ্য করবার জন্যেই। ব'লেই যেন একটা আকস্মিক ব্যথাকে দমন করবার নিমিত্ত বুকটাকে চেপে ধ'রে মাঠের মাঝখানেই সুষমা আবার ব'সে পড়ল।

তার সেই মূর্চ্ছাহত মুখের দিকে চেয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম মনে নেই—কিন্তু তার কথা শুনেই আমার ভেতর চেতনা ফিরে আস্‌ল। সুষমা আমাকে ডেকে বল্‌লে—ভয় নেই নীহার-দা, ব্যথাটা আমি সাম্‌লে নিয়েছি। কিন্তু এত রাতে আর বাইরে দাঁড়িয়ে থেকো না ভাই, বাড়ী ফিরে যাও।

ধীরে ধীরে সুষমার মাথাটা স্পর্শ করে বল্‌লুম—তোর যে কি দুঃখ সে আমি বুঝেছি ভাই, আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝ্‌তে পারছি—দুঃখ তোকে খাঁটি সোনা ক'রেই রেখে গেছে—তার ভেতরে আর এতটুকুও খাদ নেই। তোকে ছুঁয়েই আজ শপথ করছি সুষমা—এ দেশে এই ধরণের অত্যাচারিত মাদের সন্ধান হয় তো পাবে না, কিন্তু এ জীবন আমি উৎসর্গ ক'রে দিলুম এই সব অজানা মায়ের নাম-গোত্রহীন ছেলেদেরই জন্য।

ঝড়

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

ঝড় এস গো বর এস গো
আমার বুকের বনে,
আকুল কাঁপন মদির মাতন
অধীর আলোড়নে।
সু-দুঃসহ ব্যথায় সুখে
প্রবল সাড়া বহাও বুকে,
নিদ্রা-নীরব মনের বধূ
চমকে জাগুক্ মনে!

বাসনা-ফুল যে-সব আছে
পাতার সঙ্গোপনে,
লাজের আড়াল ভাঙো তাদের
নবীন নিষ্ক্রমণে;
বোঁটার বাঁধন যদিই টুটে,—
পড়ুক তারা ধুলায় লুটে!
হাসি মিলাক্ হাহাকারে
অপূর্ব্ব মিলনে!
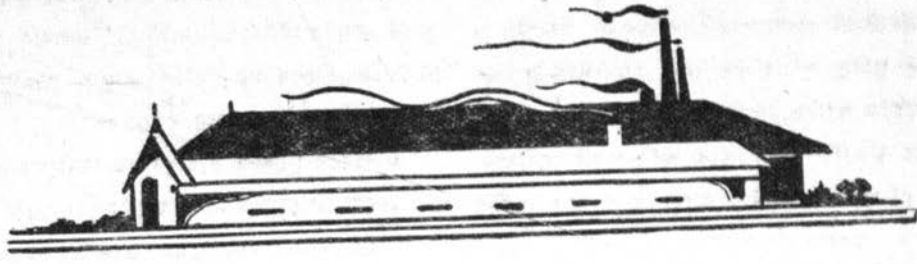
জ্বরশনির গ্রহশুদ্ধি

শ্রীজগদীশ চন্দ্র গুপ্ত

১

কে বড় ইহাই লইয়া বিবাদ।

ফিলাডেল্‌ফিয়া প্রত্যাগত ডাক্তার চ্যাটার্জ্জির ম্যালেরোডিনা বড়, না কবিরাজ হরিহর রায় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত জ্বরশনি বড়? কে বড়? পশুর মধ্যে সিংহ বড়—গায়ের জোরে; ঋতুর মধ্যে বসন্ত বড়—কাব্যকাননে; কদলীর মধ্যে মর্ত্তমান বড়—বহু পরীক্ষায়। ম্যালেরোডিনা বা জ্বরশনি গায়ের জোরে বড় হইতেই পারে না; কাব্যকাননে তাহাদের স্থান নাই; পরীক্ষা তাদের চলিতেছে,—তবু কে বড়? প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নহে।

ম্যালেরিয়া-রোগী যারা তাদের অধিকাংশই মুখ বিকৃত করিয়া উভয়কে সমান অবিশ্বাস করিয়াছে; তথাপি ম্যালেরোডিনার কাটতি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ঠিক্ কথা—পেটেণ্ট ঔষধ বড়, চাহিদার টানে কাটতির হিসাবে, আর কোনো তুলাদণ্ড তাদের নাই। তবে ম্যালেরোডিনাই বড়।

ঐ দেখুন—রাজপথের দুইধারে বিচিত্র বড় বড় হরফে প্ল্যাকার্ড লাগান রহিয়াছে—

চ্যাটার্জ্জির
—ম্যালেরোডিনা—
জ্বরের অঙ্কুর নির্ম্মূল করে।
অব্যর্থ, অমোঘ, সুলভ।

ঐ দেখুন—ডাক্তার চ্যাটার্জ্জির লোক মোড়ে মোড়ে হাজারে হাজারে হ্যাণ্ডবিল দুহাতে অজস্র বিতরণ করিতেছে, ছড়াইতেছে; ঐ দেখুন—চায়ের দোকানে, মুদির দোকানে, বস্ত্রালয়ে, বৈঠকখানায়, বাড়ীর বাবুদের, মেসের ছেলেদের, হোটেলবাসীদের শিয়রে শিয়রে ম্যালেরোডিনার জয়বার্ত্তাসমন্বিত সুশোভন ক্যালেণ্ডার ঝুলিতেছে; প্রত্যেক জংসন ষ্টেশনে তাহা গাড়ী গাড়ী বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে; এজেণ্টগণ সুদূর পল্লী পর্য্যন্ত দলে দলে ছুটিয়া আসিয়াছে—তিনদাগ ঔষধ বিনামূল্যে না চাহিতেই দান করিতেছে; তাহাতে ফল দর্শিলে গরীবের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া একটাকা মূল্যের বড় বোতল মাত্র দশ আনায় দিয়া আসিতেছে। ম্যালেরোডিনা অযাচিত প্রশংসাপত্র এত লাভ করিয়াছে যাহা একত্র করিয়া ছাপাইলে মহাভারত তুল্য বিরাট

একখানা গ্রন্থ হয়! লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন ভুক্তভোগীর, পাঁচজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের, দশজন সবজজ, উকিল, মুন্সেফ, মোক্তার এবং একজন ইংরেজ মহিলার প্রশংসাপত্র পঞ্জিকার মলাটে ও দুর্গোৎসবের ছবির পশ্চাৎদিকে এবং বহুসংখ্যক ইংরেজী বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক সংবাদপত্রের ও সাহিত্য পত্রিকার অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ স্থানে ভূরি ভূরি ছাপাইয়া তাহা ঘরে ঘরে পঠিত হইতেছে।

ম্যালেরোডিনা জ্বরশনির চোখের উপর দিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া দিগ্বিজয় করিয়া চলিয়াছে!

বেচারা জ্বরশনির এ-সব অহঙ্কার আড়ম্বর কিছুই নাই—পরমুখাপেক্ষী মা-মরা নিরন্ন ছেলের মত সে বিষণ্ণ, সজ্জাহীন; গুপ্ত-প্রেস্ পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনীর আড়াইশত পৃষ্ঠার একটি পৃষ্ঠায় জ্বরশনির পরিচয় টিম্ টিম্ করিতেছে—তাহাতে না আছে উল্লাস, না আছে বাক্যচ্ছটা, না আছে প্রলোভন; রথযাত্রার ভিড়ের মধ্যে উপেক্ষিত সামান্য লোকের মত সে একস্থানে ম্লানমুখে বসিয়া আছে—কেহ তাহাকে লক্ষ্যও করিতেছে না। এজেন্টগণ একে একে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে—খরিদ্দার মিলে নাই!

অবস্থা যখন এম্নি ট্র্যাজিক্ তখন হরিহরের ছাত্র অনাথের মাথায় একটা দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইল!—

ডাক্তার নীলমণি চক্রবর্ত্তী ম্যালেরিয়া-স্পেশ্যালিষ্ট, তাঁহার প্রশংসাপত্র একখানা সংগ্রহ করিতে পারিলেই জ্বরশনিও জয়ডঙ্কা বাজাইতে পারে ইহা হরিহরও জানিতেন, অনাথও জানিত; চক্রবর্ত্তী হেলায় অবহেলায় জ্বরশনির দিকে মাত্র কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি তুলিলেই রোগী তাহা গিলিবার পথ পাইবে না ইহা যেমন সত্য, চক্রবর্ত্তীকে দিয়া ঐ তুচ্ছ কাজটুকু করানো ঠিক্ তেম্নি অসম্ভব।

> "ঔষধসাগরে আজ পর্য্যন্ত অনেক বুদ্বুদ উঠিয়াছে; তাহারা দিবালোকে এক মুহূর্ত্ত নৃত্য করিয়াই চিরদিনের মত বিলীন হইয়া গেছে। কিন্তু ম্যালেরোডিনা অক্ষয় জীবন লইয়া ব্যাধিনাশ করিতে আসিয়াছে। সে বাঁচিবে ও বাঁচাইবে।"—

ম্যালেরোডিনার ঐ সমস্ত ঘোষণালিপির নিম্নে স্বাক্ষর আছে ডাক্তার নীলমণি চক্রবর্ত্তীর। নীলমণি ডাক্তার ডাঃ চ্যাটার্জ্জির বিশেষ বন্ধু; বলিতে গেলে, নীলমণি ডাক্তারই ম্যালেরোডিনার জয়যাত্রার প্রধান রথী।

হরিহরের নিস্পন্দ ভাব দেখিয়া অনাথের গা জ্বলিত। উহারা বোতল বোতল ময়লা জল বেচিয়া ঘড়া ঘড়া টাকা ঘরে তুলিতেছে, আর এমন জ্বরশনি কি না মানুষের চোখে পড়িল না! এ ক্ষোভ রাখিবার স্থান অনাথের নাই! অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া ছেলেবুদ্ধির খেয়ালে সে একদিন এক কাণ্ড করিয়া বসিল;—কবিরাজ মহাশয়কে লুকাইয়া সে "দৈনিক জনসময়ে" বিজ্ঞাপন দিয়া আসিল;

সুসংবাদ!

ভিষক্‌প্রবর হরিহর রায়

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত

জ্বরশনি

ব্যবহার করাইয়া ডাক্তার

শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী এম্, ডি, মহাশয়

শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রেই

আশ্চর্য্য

সাফল্য লাভ করিয়াছেন!!!

হরিহরের ঠিকানাসহ বিজ্ঞাপন যথাসময়ে বাহির হইল।

অনাথ মনে মনে আশা করিয়াছিল, নীলমণি ডাক্তার ব্যস্ত লোক, তার স্নান আহারেরই সময় নাই—সে আবার দেখিতে যাইবে কোথায় কোন্ কোন্ কাগজের কোন্ কোণে কি 'সুসংবাদ' বাহির হইল। অনাথ অনুমান করিয়াছিল ঠিকই, কিন্তু ভবিতব্য অন্যরকম; 'সুসংবাদ' নীলমণি ডাক্তারের ব্যস্তচক্ষু এড়াইলা গেলেও ডাঃ চ্যাটার্জ্জির অনুচরবর্গের চোখে পড়িয়া গেল—জুয়াচুরী ধরা পড়িল।

কবিরাজ মহাশয় প্রাতে ছাত্র অনাথকে চরক পড়াইতেছিলেন, এমন সময় একখানা মোটর আসিয়া তাঁহার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ও বিদ্যালয়ের দ্বারে দাঁড়াইল; সাহেব-বেশধারী কাগজহাতে একজন গৌরবর্ণ বাঙালী নামিয়া পড়িলেন। পেনটুলানের পদার্পণ এই ক্ষুদ্র গৃহে পূর্ব্বে কখন হয় নাই, হরিহর মুখ তুলিয়া বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

হরিহর নীলমনিকে চিনিতেন না, কিন্তু অনাথ চিনিত, সে নীলমনিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কবিরাজের চরকের চাইতেও শুষ্ক এবং ডাক্তারের মোটরের চাইতেও বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

নীলমণি চট্‌পট্ ঘরে ঢুকিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—হরিহর কার নাম?

প্রশ্নের ধৃষ্ট সুরটা হরিহরের বাজিল; অধিকতর বিস্মিত হইয়া সবিনয়ে বলিলেন,—আজ্ঞে, আমার নাম। তারপর আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন,—আসুন, বসুন।

—বস্‌ছি! বলিয়া নীলমনি না বসিয়াই ফর্ ফর্ করিয়া হাতের কাগজখানার ভাঁজ খুলিয়া হরিহরের সম্মুখে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন,—এই বিজ্ঞাপনটা আপ্‌নি দিয়াছেন?

—কোন্‌টা?

নীলমণি মনে মনে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—ন্যাকা। প্রকাশ্যে বলিলেন,—ঐ লাল পেন্সিলের মার্কা দে'য়াটা।

—আজ্ঞে, না।

কথাটি সত্যি, হরিহরের বিস্ময়ও ভাণ নহে, কিন্তু নীলমণি ক্রোধে, একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন!—আশক্ষিত হাতুড়ে', এতবড় জুয়াচুরী করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, তবু কেমন অম্লানবদন! অসহ্য!—হরিহরের ব্যাকুল মুখের দিকে রুদ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দুর্জ্জয় ক্রোধে নীলমণি আপনি ও তুমির পার্থক্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন, বলিলেন,—আমারই নাম নীলমণি চক্রবর্ত্তী। জানো কি অপরাধ করেছ তুমি? আইনে এ অপরাধের কি দণ্ড তা জানো?

দিশেহারা হরিহর হাত জড়িয়ে বলিলেন—আমায় ক্ষমা করুন।

—কাল যেন তোমার 'সুসংবাদ' না বেরোয়। নির্লজ্জ!—বলিয়া নীলমণি মোটরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন; হরিহর হাত-পা গুটাইয়া বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। এ কি কাণ্ড! কোথা হইতে আসিয়া কেন ঐ লোকটা অকারণ এই অকথ্য অপমান করিয়া চলিয়া গেল! নিদারুণ ব্যথায় জর্জ্জর বৃদ্ধ হরিহরের দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

অনাথ এতক্ষণ ঘাড় গুঁজিয়া নিঃশব্দে বসিয়া ছিল—হঠাৎ সে হরিহরের পায়ের উপর ঠাস্ হইয়া পড়িয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভীতভাবে "কি হ'ল, কি হ'ল" বলিতে বলিতে হরিহর অনাথকে ঠেলিয়া তুলিলেন।

অনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—আমায় ক্ষমা করুন।

অনাথের অপরাধ কোথায় হরিহর তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। বলিলেন,—কি হয়েছে বল, বাবা।

অনাথ বলিল,—ঐ বিজ্ঞাপন আমি দিয়েছিলাম। অত বুঝতে পারি নি—আমার দোষে আপনাকে যাচ্ছেতাই অপমানিত হতে হল। বলিয়া সে আরো কাঁদিতে লাগিল।

—তুমি দিয়েছিলে? কেন দিয়েছিলে?

অনাথ কথা কহিল না কিন্তু হরিহর তার মনের কথা বুঝিলেন। অনাথের মাথার উপর হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন—আমার ভালর জন্যই, নয়? তবু অপরাধ তোমার হয়েছে, বাবা; কিন্তু আমি তোমায় ক্ষমা করেছি।' যাও বাহিরে একটু বেড়িয়ে এস। বলিয়া হরিহর অশ্রুতপ্ত অনাথকে শান্ত করিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন।

২

উপর্য্যুক্ত ঘটনার ছ'মাস পরে আবার একদিন একখানা মোটর আসিয়া হরিহরের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ও বিদ্যালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই দিকে চোখ তুলিয়া হরিহরের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—ছ'মাস আগে একদিন এম্নি সময় নীলমণি শাসন করিয়া গিয়াছিলেন। আবার কি অপরাধ করিয়া বসিয়াছি?

কিন্তু এবার নীলমণি নয়—সুদর্শন সুবেশ একটি ছেলে নামিয়া আসিয়া হরিহরকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—আপ্নাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে।

—কোথায় ?

ছেলেটি দূরবর্ত্তী একটি পাড়ার নাম করিল।

—কার বাড়ী ?

ছেলেটি বলিল—একটি মেয়ের বড় অসুখ।

—কি অসুখ ?

—জ্বর।

—কার বাড়ী ?

ছেলেটি বলিল,—আজ আঠাস্ দিন জ্বর, জ্বর লেগেই থাকে, বিচ্ছেদ হয় না। আপ্নি আমার সঙ্গে এই মোটরেই চলুন।

হরিহর সেকালের অচতুর লোক হইলেও বুঝিতে পারিলেন, কার বাড়ীতে রোগী তাহা প্রকাশ করিতে ছেলেটি অনিচ্ছুক। তবে যে-পাড়ায় সেই বাড়ী সেটা ভদ্রপল্লীই।

হরিহর উঠিয়া পড়িলেন, এবং প্রস্তুত হইয়া মোটরে উঠিয়া রোগীদর্শনে যাত্রা করিলেন।

বৈঠকখানায় পৌঁছিয়া অন্দরে খবর পাঠান হইল, কবিরাজ মহাশয় আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর ভৃত্য আসিয়া আহ্বান করিল,—আসুন।

হরিহর ছেলেটির সহিত দ্বিতলে উঠিয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিতেই পাশের দরজা দিয়া একটি মহিলা ত্বরিত-পদে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। হরিহর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, আট নয় বছরের একটি মেয়ে বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশিয়া শুইয়া আছে। ছেলেটি পালঙ্কের ধারে চেয়ার আগাইয়া দিল; হরিহর তাহাতে বসিলেন না; চটি খুলিয়া বিছানায় উঠিয়া চৌকা হইয়া বসিলেন, এবং চশ্মা খুলিয়া চোখে পরলেন।

—জ্বর কত দিন ?

ছেলেটি বলিল,—আজ আঠাস্ দিন।

—হুঁ। দেখি মা, তোমার বাঁ হাতখানা।

হরিহর অতীব মমতার সহিত মেয়েটির বিশীর্ণ বাঁ হাতখানা হাতের মধ্যে লইয়া নাড়ী পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন; এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্নমালা গাঁথিতে সুরু করিয়া দিলেন,—মেয়ের বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ তিথিতে জ্বর প্রথম হইয়াছিল তাহাও তিনি জানিয়া লইলেন; এবং খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তিনি এত সংবাদ জানিতে চাহিলেন যে, তাহার কূল-কিনারা হিসাব-কিতাব্ নাই। যে ছেলেটি হরিহরের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল সে মাঝে মাঝে তাঁহার অন্ত-মনস্কতার সুযোগে অদূরবর্ত্তী সেই দরজার দিকে চাহিয়া কখন ভ্রূভঙ্গী কখন হাস্য করিতেছিল।

যাহা হউক, সব কাজেরই শেষ নিশ্চয়ই আছে—তাই দেখা গেল, হরিহর কর্ত্তৃক নাড়ীপরীক্ষারও শেষ পর্য্যন্ত শেষই হইল।—তারপর হরিহর তাঁর সুবিপুল কামিজটার সুপ্রসর পকেটের ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া টানিয়া টানিয়া বাহির করিলেন কাগজে-কাপড়ে প্রস্তুত বৃহদায়তন একটি পুঁটুলি; পুঁটুলির অভ্যন্তরে অসংখ্য পুরিয়া ছিল—তাহার ভিতর হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিলেন একটি পুরিয়া, এবং পুরিয়া খুলিয়া বাহির করিলেন একটি বড়ি—সিঁদুরের মত লাল টক্‌টকে, এতটুকু, মটরের মত।

হরিহর মাথা হেঁট করিয়া এত কাণ্ড করিতেছিলেন, এবং ছেলেটি দরজার দিকে চাহিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। হরিহর বড়িটি দুই আঙ্গুলের মধ্যে করিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়াই দৃষ্টি নত করিয়া বলিলেন,—এই বড়িটি—

বলিতেই ছেলেটি হাসি ঢাকিয়া তাঁহার দিকে ফিরিল। হরিহর পুনরায় মুখ তুলিয়া বলিলেন,—চার ভাগ করে' তিন ভাগ খাওয়াবে। অনুপান প্রথমবার—

ছেলেটি বলিল,—দাঁড়ান্, লিখে নি'। যদি আবার ভুলে যাই—

বলিয়া কাগজ-পেন্সিল আনিয়া সে লিখিতে বসিল; লাল বড়ির বিভিন্ন অনুপান ও সেবন-বিধি লিখাইয়া দিয়া হরিহর একটি কালো বড়ি ছেলেটির হাতে দিয়া বলিলেন,

—কা'ল ভোরেই জ্বর ছেড়ে যাবে, ছেড়ে গেলে এই বড়িটি খাইয়ে দেবে। আমি এখন উঠি। আমার আসার আর দরকার হবে না।—বলিয়া হরিহর পা নামাইয়া চটির মধ্যে দিলেন।

ছেলেটি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিল,—যদি অপরাধ না নেন্ তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

খাপে চশমা ভরিবার চেষ্টায় হাত এ-দিক্ ও-দিক্ করিতে করিতে হরিহর বলিলেন,—বল, বল।

—কি ওষুদ দিলেন ?

হরিহর খাপের যথাস্থানে চশমা রাখিতে সমর্থ হইয়া বলিলেন,—জ্বরশনি।

হরিহরের কথা ফলিয়াছে—মিনুর জ্বর ভোরেই ছাড়িয়াছে।

৩

নীলমণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—জ্বরশনির গুণ আছে ত!

গৃহিণী বলিলেন,—যখন সাতদিনেও জ্বর ছাড়িল না তখনই ত আমি বলেছিলুম, হরি কব্‌রেজকে ডাক। তুমি ত তখন থু থু করে উঠেছিলে!

নীলমণি বলিলেন,—তা' উঠেছিলাম বটে। তখন কি জান্‌তাম যে, এক লাল বড়িতেই—

গৃহিণী বলিলেন,—অনর্থক মেয়েটাকে ভুগিয়েছ। একে রোগের যন্ত্রণা, তার ওপর তোমাদের দলে দলে এসে মেয়েটার সারা গায়ে স্ঁচ ফোটান!

—কার মেয়ে তা' জান্‌তে পেলে বোধ হয় আস্‌ত না।

—আস্‌ত।

—কি করে' জানলে ?

—বিলিতী ধাত্‌ নয় বলে। তুমি সেদিন কি বলে' এসেছিলে তা' বোধ করি ওঁর মনেও নেই। সেকালের মানুষ কি না, ভোলানাথ।

খোঁচা খাইয়া চক্রবর্ত্তী যেন লজ্জিত হইলেন।

মেনু মিহিসুরে বলিল,—ভাত কবে খাবো বাবা ?

—কব্‌রেজ বলেছেন, আমাবস্যা আস্‌ছে, তার পর ভাত দিতে।

শুনিয়া মেনু আরও মলিন হইয়া গেল।

৪

এই ঘটনার দিন পনর পরে একদিন, সেই দু'দিনের মত, একখানা মোটর আসিয়া হরিহরের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ও বিদ্যালয়ের দ্বারে থামিল। হরিহর গ্রন্থ হইতে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, ডাক্তার নীলমণি চক্রবর্ত্তী নামিতেছেন—একটা দিনের স্মৃতি হঠাৎ বড় তাজা হইয়া উঠিল। আজও নীলমণি সাহেব সাজিয়া আসিয়াছেন। পেন্টুলানকেই রণসজ্জা মনে করিতে শিখিয়াছিল—তাই নীলমণির অঙ্গে পেন্টুলান দেখিয়া তিনি শঙ্কিত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নীলমণি আজ ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের উপর অনাহুতই বসিয়া পড়িলেন; স্বাভাবিক স্বরেই বলিলেন,—কব্‌রেজ মশাই, আপ্‌নার জ্বরশনি কত তৈরী আছে ?

অনাথ বড়ি প্রস্তুত করিতেছিল; নীলমণির প্রশ্ন শুনিয়া সে তাঁহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। হরিহর সেদিন্‌কার চাইতেও বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—কেন বলুন ত' ?

—দরকার আছে। আপনার যত বড়ি তৈরী আছে, যতই থাক্ না, সব আমার ডিস্‌পেন্সারীতে আজই পাঠিয়ে দেবেন। দাম ধরে' দেবেন—সেই অনুসারে রসিদ দেব। ক্রমশ টাকা পাঠাইতে থাক্‌ব, বিক্রীর সঙ্গে সঙ্গে। বুঝেছেন ?

হরিহরের চোখের পলকপাত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; কোনোমতে তিনি উচ্চারণ করিলেন,—আজ্ঞে পেরেছি।

—যত পারেন তৈরী ক'রতে থাকুন, কাটাবার ভার আমার। আজই যেন আপনার লোক যায় আপনার জ্বরশনির যত বড়ি আছে সব নিয়ে। হরিহরের চোখের পলকপাত বন্ধই রহিল, অনাথের হাঁ খোলাই থাকিল, নীলমণি যাইয়া মোটরে উঠিলেন।

নীলমণি চট্‌পট্‌ আসিলেন, চট্‌পট্‌ কহিলেন, তাঁহার অনুরোধ আদেশের মত শুনাইল, এবং হরিহরের বুদ্ধি-শুদ্ধি তাল পাকাইয়া দিয়া তিনি চট্‌পট্‌ মোটরে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। এ কি কাণ্ড!

হরিহর অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—সেদিন লোকটা অপমান করিয়াছিল, আজ তামাসা করিয়া গেল। তার রাগের কারণ ছিল, কিন্তু এই তামাসার কারণ কি!

কিন্তু ব্যাপারটা যে ঠিক্‌ তামসা নয় তাহার হাতে হাতে প্রমাণ হরিহর অল্প দিনেই পাইলেন।

* * * *

ম্যালোরোডিনার আবিষ্কর্ত্তা ডাঃ চ্যাটার্জ্জি এখন "আই-স্পেশ্যালিষ্ট"; হরিহর অল্প দিন হইল গ্রে ষ্ট্রীটে তাঁর নিজস্ব দ্বিতল অট্টালিকায় উঠিয়া আসিয়াছেন, এবং অনাথ এখন হরিহরের জরশনি-প্রস্তুতের কারখানার কর্ম্মকর্ত্তা; কিন্তু ললাট-লিপির এই আকস্মিক পাঠ-পরিবর্ত্তনের রহস্যটা আজিও তাঁর অজ্ঞাত।

মাঠের হরষ

সৈয়দ উদ্দীন

আজকে আমার মেঠো হাসির সবুজ হাওয়ায় এলিয়ে গা
আয় রে ও তুই পরাণ-লোভা, নীদ পারাবার চুমিয়ে যা!
নতুন শাড়ীর চমক মেলি' ধূসর মাটির বুকের 'পরে,
তরুণ স্বপন জাগিয়ে দে রে মাঠের বুকে চাষার ঘরে!
হেসে হেসে বউরা চলুক ঘাটে ঘাটে জল তুলিতে
পূবো-বাতাস টোল খেয়ে যাক নোলক নাড়ার তর-তরিতে!
রাখাল চলুক পাচন হাতে তাড়িয়ে ধেনু মাঠের পানে,
বাছুর ছুটুক পাছে পাছে ঘুঙুর দোলার মিষ্টি তানে!
[illegible]হের পাড়ে নদীর ধারে বগাবগী থাক দাঁড়িয়ে,
নেয়ে টানুক গুনের রশি ভাটীর সুরে গান জাগিয়ে!
আধখানা চাঁদ আকাশ কোণে শাদা মেঘের বোর্‌খা খুলি
ধানের পাতায় মুচ্‌কি হাসি' গা ঢালা দিক্‌ আপনা তুলি!

পথটি গেছে এঁকে বেঁকে দু'ধারেতে ধানের পাথার
ইচ্ছে করে বুক ভরিয়ে তার মাঠেতে দিই গো সাঁতার!

ক্ষেতগুলো সব আর্শী-সবুজ ফ্রেম-বাঁধা তায় উচ্চ হাতাল,
ওপাড়ার এক কল্‌মী-বধূ মুখ দেখিতেই হচ্ছে নাকাল!
বাতাস তারে দোলায় খালি পোড়ামুখোর নাই ক' খেয়াল
রাঙা ঠোঁটের হাসি দেখে মাঠটি ভরে' নেচেই মাতাল!
এখান দিয়ে আয় রে নেড়ে রাঙা পায়ে সোনার নূপুর
মেঠো গানের মিঠে সুরে ব্যথিয়ে দে রে উদাস দুপুর!
ফুল বানিয়ে নোলক গড়ে' পরিয়ে দেব নাকে কানে,
দখিন হাওয়া বর-বঁধূ তোর দোল দে যাউক শাড়ীর টানে!
চাষারা গাক উদাস তানে পাট-বাছুনীর হরষ গান,
বিলের জলে হেলেদুলে কোঁড়ার সুরে ডাকুক বান!
বুলাও তোমার আকাশ-তুলি গেঁয়ো গাঙের উছল জলে,
গগনচারী নীলের পরী মুখ দেখে যাক্‌ নাওয়ার ছলে!
হ'লুদ-গুলা পিচ্‌কিরী-ঘায় কুমড়ো-পাতা বাউল-সাজে
দিক্‌ ভাসিয়ে উত্তরী তার কচি পাতার বুকের মাঝে!
আকাশ বাতাস মাঠের মাঝে নূতন দিনের আলোক ঢেলে
সোনামুখী! মোদের বুকে নতুন হরষ দাও গো মেলে।

পণ-ভঙ্গ

শ্রীসুনীতি দেবী

বোসজা মশায়ের দশটি সন্তানের মধ্যে মৃণালিনী সব চেয়ে ছোট। কোলের মেয়ে বলে বোস-গিন্নি তাকে খুকু বলে ডাকেন, বাড়ীর সকলের কাছেও সেই নামই বাহাল ছিল। শুধু বন্ধু-মহলে আর বাইরে তার নাম মিন্নু। খুকু বললে মিন্নু ভারি চটে যায়। অবিশ্যি তার কারণও আছে। একবার দারজিলিং-এ তাদের পাশের বাড়ীর নূতন বন্ধুরা পিক্‌নিক্‌-এর ব্যবস্থা করছিলেন। দূরে যেতে হবে বলে নানাপ্রকার যানবাহনের বন্দোবস্ত হচ্ছিল। তাঁরা বোসেদের বাড়ী থেকে কে কে যাবে হিসেব নিচ্ছিলেন। বোস-গিন্নি সব নামের মধ্যে খুকুর নাম করলেন। পাশের বাড়ীর গিন্নি ভাবলেম মিন্নুর বড়দির মেয়ে বুঝি, তাই বললেন,—খুকুর জন্যে একটা donkey নিতে হবে তাহলে। অমনি ভীষণ হাসির ধূম পড়ে গেল। খুকুর মা ডাক দিলেন—খুকু-মা এদিকে আয় ত।

মিন্নু তার সাড়ে পাঁচফুট দেহের সঙ্গে সাড়ে তিনফুট লম্বা বেণী ঝুলিয়ে এসে দাঁড়াতে সে ভদ্রমহিলার ত চক্ষু স্থির! Donkey-র কথা নিয়ে আর একচোট হাসি হতে ব্যাপারটা বুঝে মিন্নু চটেমটে সেবার পিক্‌নিক-এই গেল না। বাড়ীর লোক সেই থেকে খুকু নামটা একটু বুঝে সুঝেই ব্যবহার করে।

মিন্নুর তিন দিদি ও চার দাদার বিয়ে হয়ে গেছে। এখন মিন্নুর বিয়ের জন্য তার মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মিন্নুর সবে ষোল বছর বয়স,—ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্ত্তি হয়ে তার ভারি ইচ্ছা সে বি, এ, এম, এ, পাশ করে। মিন্নুর দিদিরা বলেন, তাঁদের যখন পাশ না হতেই বিয়ে হয়েছে, তখন মিন্নুরই বা এত লেখাপড়ার দরকার কি? ভগ্নীপতিরা ঠাট্টা করে বলেন, বি, এ, পাশ করলে বিয়ের ঠিকে দেওয়া হয়ে যায়। সে মেয়েদের বিয়ে হয় না।

তবু মিন্নুর জেদ্ সে কলেজে পড়বে। মা যদি বলেন, বুড়ো মেয়ের বিয়ে যে কবে হবে ঠিক্ নেই। অমনি মিন্নু তার অবিবাহিত দুই দাদাকে দেখিয়ে বলে, তারা ত মিন্নুর চেয়ে আরও বড়, তাদের আগে হোক। মা ধমক্ দিয়ে বলেন, তারা পুরুষমানুষ, পাশটাশ না সেরে কি করে বিয়ে হবে। অমনি মিন্নু বেঁকে বসে, সেও পাশটাশ করে তবে বিয়ে করবে। আর সে ত মায়ের 'খুকু,' বড় আবার কবে হল?

আদুরে মেয়ের সঙ্গে না পেরে' মা ছেলেদের বকেন, কেন তারা বর জোটাতে পারছে না। মিনুর ছোড়দা হতাশ-ভাব দেখিয়ে বলে, তোর কি আর বিয়ে হবে? যা লম্বা ধেড়ে মেয়ে তুই। বাঙালী বরেরা সব ভয়েই পালাবো। তোর বিয়ে না হলে মা আবার আমাদের বিয়ে দেবেন না বলেছেন। চিরটাকাল আইবুড়ো থাক্‌তে হবে দেখ্‌ছি! ঠাট্টাতেও মিনুর প্রতিজ্ঞা টলে না।

মিনুর আই-এ পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেল। তার মা কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন যে, এই বছরেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। মুখখানা তার খুকুর মত কচি হলেও দৈর্ঘ্যে সে যেন বেড়েই চলেছে।

সেই বছরেই ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে বাঙালী সৈন্যদল যাচ্ছিল। কেউ কেউ ফিরে এসে রোমাঞ্চকর গল্প সব বল্‌ছিল। মিনুকে যদি বা এবার দিদিরা বিয়েতে রাজি করলেন, তার নূতন পণ হল "যুদ্ধ-ফেরৎ" বর চাই।

বড় ভগ্নীপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার। তিনি হেসে বল্‌লেন, তোমার দিদিদের বেলায় বিলেত-ফেরৎ হলেই চলত, তোমাদের সময় যুদ্ধ-ফেরৎ দরকার হয়েছে। দেখো যেন শেষে মুখ-পোড়া কোন লঙ্কা-ফেরৎ না জুটে পড়ে!

চারিদিকের হাসি তামাসায় মিনু বিব্রত হয়ে পড়ল। কিন্তু বাড়ীর সকলের আদুরে হওয়াতে ছেলেবেলা থেকেই একগুঁয়েমি করা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। চিরকালই মায়ের খুকুর জেদ্ বজায় থাকৃত। মা বড়ছেলেকে ডেকে বললেন, লক্ষ্মী বাবা, ছোট বোনটির জন্য একটু কষ্ট করে খুঁজে দেখ না। যুদ্ধ ঘুরে এসেছে এমন ভাল ছেলে যদি পাওয়া যায়। বড়ছেলে বল্‌লেন, যুদ্ধে ত যত বাপে তাড়ান মায়ে খেদান ছেলে যায়। তারা কি মিনুর যোগ্য?

একথা শুনে মিনু আরও ক্ষেপে গেল। দাদারা সব কাপুরুষ, তাই হিংসা করে বাঙালী সৈন্যদের নিন্দা করছে, এই হল তার বিশ্বাস। 'ননী গোপাল' পুরুষের আদর্শকে সে আন্তরিক ঘৃণা করত। রামায়ণ মহাভারতের বীরের গল্পে ছেলেবেলা থেকে তার গভীর অনুরাগ ছিল। 'বীর পূজা' তার স্বভাবেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাই বাঙালী ছেলে-দের যে-কোন রকম শারীরিক বলের পরিচয় তাকে উৎসাহিত করে তুলত। হকি, ক্রিকেট, ফুটবল এ—সব খেলায় বাঙ্গালী ছেলেরা কেমন খেলে এ সব খবর সে দাদাদের কাছে খুঁটিয়ে শুনত। তার দাদারা বল্‌তেন, মিনুটা পুরুষ মানুষ হলেই মানাত ভাল।

এতদিন খেলাধুলায় ছাড়া বাঙালী ছেলেরা শারীরিক বলের পরিচয় দিতে পারে নি। এবারে যুদ্ধে নেমেছে এ উৎসাহ রাখবার জায়গা মিনু আর খুঁজে পায় না। বাঙালী সৈন্যদের জন্য জামা সেলাই মিনুর মত এত বেশি কেউ করেছিল কি না সন্দেহ। তাদের একজনকে বরণ করে জীবন সার্থক করবে, তাতেও লোকের উপহাস!

বিধাতা বুঝি এবার মুখ তুলে চাইলেন। একদিন কলেজ থেকে ফিরবার সময় মিনুদের ঘোড়াটি গেল ক্ষেপে। একা মিনু গাড়ীতে বসে। দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ঘোড়া ছুটেছে, রাস্তার চারপাশের লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে, কেউ সাহায্য করতে এগুচ্ছে না। হঠাৎ একটি যুবক ছুটে এসে উন্মত্ত ঘোড়ার মুখের লাগাম এক হাতে চেপে ধরল। তার অন্য হাতখানা ব্যাণ্ডেজ করা আর গলা থেকে রুমাল দিয়ে ঝোলান। ঘোড়া থাম্‌তেই সহিস কোচম্যান নেমে এসে সামলাতে লাগ্‌ল। মিনু গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। তার মুখ সাদা, হাত পা তখনও কাঁপ্‌ছে। যুবকটি সহিসদের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে মিনুর কাছে এসে বল্‌ল, চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দি। কোচম্যানের কাছে ঠিকানা নিয়েছি।

কৌতূহলী দর্শকবৃন্দের ভিড় থেকে মিনুকে সরিয়ে একটা ঠিকাগাড়ীর ভিতর তুলে দিয়ে যুবকটি কোচবাক্সে উঠে বস্‌ল। বাড়ী পৌঁছতেই মিনুর ছোড়দা ছুটে এসে বল্‌ল, এ কি মোহিত যে! আরে মিনু কোত্থেকে? ঠিকে গাড়ীতে কেন?

এতক্ষণে মিনুর গলার স্বর ফিরে এসেছে। সে ঘটনাটা বল্‌তেই তার ছোড়দা মোহিতকে টান্‌তে টান্‌তে ভিতরে নিয়ে চল্‌ল। যেতে যেতে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, মোহিত, তোমার হাতখানার কি হল আবার? Sling-এ ঝুলিয়েছ যে? মোহিত উত্তর কর্‌ল, যুদ্ধে এর চেয়ে কত জখম হয়, আমার ত শুধু হাত।

মিনু অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। বাকি কথাবার্ত্তা শুনতে পেল না। কিন্তু যুদ্ধ ঐ একটি কথাতেই তার বুকের মধ্যে তুমুল তরঙ্গ উঠল। হাঁ, এই ত বটে বীর। এ যেন সব্যসাচী। ডান হাত বাঁধা, তবু বাঁ হাতে ক্ষীপ্ত ঘোড়াকে নিশ্চল করে রাখলেন। এ রকম লোক না হলে কি যুদ্ধ চলতে পারে? একেই ত বলে পুরুষ।

মিনু নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। নূতন উত্তেজনায় তার মন আলোড়িত হয়ে উঠল। বাড়ীতে এতক্ষণ মোহিতকে নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে। সে যে ছোড়দার বন্ধু এ কথাটি জেনে মিনুর ভারি আনন্দ হতে লাগল। একটু পরে মিনুকেও ঘর থেকে বার করা হল। সে সন্ধ্যাটা একটা বিপুল উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল। মোহিতের সঙ্গে সকলের ভাব হয়ে গেল। সে বলে গেল, মাঝে মাঝে আসবে।

ছদিন পরে মিনু ছোড়দাকে জিজ্ঞাসা করল, মোহিত বাবু কবে যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন ছোড়দা? যুদ্ধে কি করে হাত ভাঙ্গল এবারে এলে জিজ্ঞাসা করো ত। আমরা শুনব।

ছোড়দা অবাক্ হয়ে বলল, যুদ্ধ! পর মুহূর্ত্তেই তার সেই দিনকার কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি গজিয়ে উঠল। সে বলল, ও হাঁ হাঁ, সে ভয়ানক যুদ্ধ। তা তোদের সাম্‌নে নিজের বাহাদুরির গল্প ও কিছুতে করবে না। আমি বরং জিজ্ঞাসা করে তোকে সে সব বলব এখন।

মিনু মোহিতের মুখে শুনতে পাবে না ভেবে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও এতেই রাজি হল।

সেদিন দুপুরে মিনু কলেজে যেতেই বাড়ীতে দাদা-বৌদিরা মিলে প্রকাণ্ড একটা ষড়যন্ত্র করে ফেলল। ষড়যন্ত্রটা এই যে, মোহিতের সঙ্গে মিনুর বিয়ে দিতে হবে। এখন আসল কথা মিনু যেন জানতে না পারে যে, মোহিত কোন যুদ্ধেই কখনও যায় নি। সেদিন মোহিত কথায় কথায় 'যুদ্ধ' বলেছিল, কেননা সে সময়ে যুদ্ধের কথা সবাইরই মুখে লেগে থাকত। ব্যাপারটা কিন্তু আর কিছু নয়,—ফুটপাথে কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গিয়ে মোহিতের হাতের কব্জিতে চোট লেগেছিল। যাহোক্ সব দিক্ দিয়ে মোহিত চমৎকার ছেলে। গায়ের জোরে তাকে আঁটতে পারে এমন বাঙালী কেন সাহেবও মেলা ভার। কাজেই মিনুর আদর্শের সঙ্গে খুব মিলবে। আসছে বছর ডাক্তারি পাশ করে বেরুবে। তখন হয় ত বিয়ে করবে। আগে থাকতে তাকে হাত করা চাই।

ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কাজ বেশ চলতে লাগল। মোহিতকে প্রায়ই ডেকে আনা হত, আর তার অনুপস্থিতিতে যুদ্ধে তার বীরত্বের গল্প সব মিনুকে শোনান হত। মোহিতের কাছেও পাকে প্রকারে মিনুর প্রশংসা ও বীর-পূজার কথা তোলা হত। মোহিত শুনে খুসি হয়ে উঠত যে, মিনু তাকে বীর ভেবে মহা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে। মিনু তার সামনে বেশি বেরুত না, বেরুলেও অন্যদের চেয়ে ঢের কম কথা বলত। মিনুর এই লজ্জাশীলতাটুকু যে বিশেষ ভাবে মোহিতের কাছেই, তা বুঝে মোহিতের বড় ভাল লাগত। এমনি করে দুজনের প্রতি দুজনের টান বেড়ে চলল।

মোহিত শেষে একদিন মিনুর ছোড়দার কাছে মনের কথাটা বলেই ফেলল। ছোড়দা ভালমানুষের মত মুখ করে বলল, তোমরা যে রীতিমত রোম্যান্স গড়ে তুললে দেখছি। নায়িকাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে তার সঙ্গে প্রেমে পড়া। এ সব হল কি!

মোহিত লজ্জিত হয়ে বলল, না ভাই, ঠাট্টা করো না। তোমার বোনটির মত মেয়ে বাস্তবিক আমি দেখি নি।

মিনুর ছোড়দা বলল, সে আবার তোমার মত ছেলে আর দেখেছে কি না সে খোঁজটা ত নেওয়া দরকার?

মোহিত বলল, নিশ্চয়ই। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত কিছু হতেই পারে না।

শেষে অনেক পরামর্শ ও তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হল, মোহিতকে নিজে মিনুর মত জানতে হবে। কেউ তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবে না।

যে মোহিতের ভয় কাকে বলে জানা ছিল না, মিনুর কাছে যাবার আগে তারও আজ বুক দুর দুর করতে লাগল। মিনুদের বাড়ী যেতেই মিনুকে তার কাছে রেখে একে একে সবাই কাজের ছুতায় উঠে পালাল। মিনু দেখল, বেগতিক। কথা না বললে অভদ্রতা হয়। সে ভাবল যুদ্ধের কথা

তুল্‌লেই মোহিতকে কথা বল্‌তে হবে, আর সে চুপ্ করে শুন্‌বার সুযোগ পাবে।

তাই সে দুচার কথার পর জিজ্ঞাসা করে বস্‌ল, যুদ্ধের সময় আপনাদের দেশে ফিরতে খুব ইচ্ছা করত না?

মোহিত অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বল্‌ল, আপনি কি আমার কথা জিজ্ঞাসা করছেন? যুদ্ধের সময় আমি ত এখানেই ছিলাম। আমি ত যুদ্ধে যাই নি কখনও।

মিনুও অবাক হয়ে গেল। এক মুহূর্ত্তে ছোড়দাদের গল্পগুলো মনে পড়ে গেল। কি অভিসন্ধিতে সে সব গল্পগুলো তাকে বলা হয়েছিল তা বুঝতে তার একটুও দেরি হল না। গভীর লজ্জায় তার দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সে ভদ্রতা পর্য্যন্ত ভুলে গিয়ে ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের শয্যায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

বৌদিদিরা কাছেই আড়ি পেতে ছিলেন। ছোট দেওরটিকে ধরে মোহিতের কাছে জবাবদিহি করতে হাজির করলেন। আর নিজেরা গেলেন মিনুকে বোঝাতে।

সব শুনে মোহিত উত্তেজিত হয়ে বল্‌ল, প্রবঞ্চনা দিয়ে এমন সরল মেয়েকে ভোলাতে গিয়েছিলে? ছি! ছি! তিনি হয় ত ভাবছেন, আমিও এর মধ্যে ছিলাম। কি লজ্জা! আমি আর মুখ দেখাতে পারব না। এই বলেই মোহিত কোন কথা শুন্‌বার অপেক্ষা না রেখে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে চলে গেল। মিনুও কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে বাড়ীর লোকের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করল। ষড়যন্ত্রকারীরা ম্রিয়মান হয়ে পড়ল, আর পাছে কর্ত্তা-গিন্নির কাছে নিজেদের অপকর্ম্ম প্রকাশ হয়ে পড়ে এই ভয়ে তাদের চোখের ঘুম উড়ে গেল।

নিজের সু-অভিসন্ধির ফল এমন বিপরীত হয়ে দাঁড়াল দেখে মিনুর ছোড়দা সব চেয়ে কষ্ট পেল। শেষে থাকতে না পেরে একদিন মিনুর কাছে গিয়ে বল্‌ল, লক্ষ্মী বোন্‌টি, আমার দোষ হয়েছে জানি। কিন্তু তোকে ক্ষমা করতে হবে। মোহিতের কাছে আমায় অপরাধী করে আর লজ্জা দিস্ না। সে সত্যি তোকে ভালবেসে ফেলেছে, তাকে এমন করে কষ্ট দেওয়া কি উচিত? যুদ্ধটাই বড় হল, আর সে মানুষটার কোন দাম নেই?

মিনু কোনও উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। তার ছোড়দা আবার বল্‌ল, বেচারার এমন চেহারা হয়ে গেছে, চেনা যায় না। এবারে পরীক্ষাও দেবে না শুন্‌ছি।

মিনু এবার কেঁদে ফেল্‌ল। বল্‌ল, কেন তবে তিনি সেদিন চলে গেলেন?

ছোড়দা মিনুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌ল, সে ভেবেছে তুই তাকেও দোষী ঠাউরেছিস্। কিন্তু বাস্তবিক সে আমাদের দুষ্টুমির কথা কিছুই জান্‌ত না।

দুই ভাই-বোনে অনেকক্ষণ কথা হল। মিনু যে সত্য সত্যই মোহিতের প্রতি অনুরক্ত, শুধু তার কাল্পনিক যুদ্ধ বিদ্যাটার প্রতিই নয়, এ কথা বুঝতে তার ছোড়দার দেরি হল না।

সে তখনই ছুটে গিয়ে মোহিতের কাছে ক্ষমা চেয়ে সব কথা জানাল। আর তারপর মায়ের কাছে এসে চুপি চুপি বল্‌ল, মা তোমার amazon মেয়ের বর জুটিয়েছি, আর মেয়েকেও বিয়েতে রাজি করিয়েছি।

বিয়ের পর শালী, শালা, শালাজ, ভায়রাভাইরা মোহিতকে ঘিরে বল্‌লেন, খুকুর হৃদয় জয় করেছ ভাই, এ যুদ্ধ-জয়ের চেয়েও শক্ত ব্যাপার। Victoria cross একটা নিতান্তই তোমার প্রাপ্য।

মিনুর বড় ভগ্নীপতি কাঁচাপাকা গোঁফজোড়াতে চাড়া দিয়ে বল্‌লেন, খুকুর কপালে নিতান্তই লঙ্কা-ফেরৎ ছিল আমি জান্‌তাম। না হলে কলার খোসায় পা-পিছলে কেউ হাত ভাঙ্গে! দেখো ভায়া আর কলাটলা খেও না।

মেজ ভগ্নীপতি বল্‌লেন, Shell না হয় না ফাট্‌ল, আহা hockey stick লেগেও যদি হাতটা ভাঙ্গত, তা হলেও খুকু একটু সান্ত্বনা পেত! তা না, শেষে কলার শেষে!

ছোট ভগ্নীপতি বল্‌লেন, আর তাতেও কি না পরাজিত হয়ে আছাড়!

বন্ধুরা দল বেঁধে এসে বল্‌ল, কই ভাই মিনু, তোমার ধনুর্ভঙ্গ পণ ভাঙ্গলেন কে দেখি!

আজ এত ঠাট্টাতেও না দমে মোহিতের দিকে আড়-চোখে চেয়ে মিনুর বুকটা গর্ব্বে ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল!

নেশার জের

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সাত দিন জর ভোগের পর অন্ন-পথ্য ক'রে ছাতের এক কোণে শুয়ে পড়েছিলাম। বেশ মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছিল, অনেকক্ষণ একদিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল; হঠাৎ উড়ে বেহারাদের বিকট চীৎকারে চম্‌কে তাড়াতাড়ি উঠে ব'সলাম। অল্পক্ষণ পরেই ছোট বোন শান্তি ছুটে এসে বল্লে, দিদি, দেখে যাও কে এসেছে।

বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন কর্‌লাম, কে?

বড়দি আর দাদা। ব'লে শান্তি ছুটে চলে গেল।

বুকটা যেন ধড়াস ক'রে উঠ্‌ল। দিদির আসার ত কোনই কথা ছিল না; দাদাও সপরিবারে চাকুরীস্থলে। হঠাৎ আসবার কারণ বুঝ্‌তে না পেরে মনটা একটা অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠ্‌ল। শরীর দুর্ব্বল, অতি কষ্টে নীচেয় এসে দাঁড়াতেই দেখলাম, দাদা আর বাবা দুই জনে দিদিকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছেন।

দিন পনের আগেও দিদি আমার কাছে চিঠি লিখেছিল, কিন্তু তাতে অসুখ বিসুখের কথা কিছু লেখে নাই, এমন কাহিল হয়েও আমাদের কোন খোঁজ খবর দেয় নি, এখানে আসবার কথাও জানায় নি, এ সব যেন আমার কাছে একটা সমস্যার বিষয় হয়ে উঠল। দাদার কাছে খবর জানতে তাঁর সম্মুখে যেতেই তাঁর মুখের চেহারা দেখেই প্রশ্নটা আমার মুখে ফুটল না। সদানন্দ দাদার মুখ, আজ আঁধারের মেঘের মত গম্ভীর। মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এলে যেমন ধারা মুখের চেহারা হয় দাদারও, মুখের চেহারা ঠিক তেমনি। বাবা জিজ্ঞেসা ক'ল্লেন, আজই যাবে?

দাদা ব'ল্লে, হ্যাঁ, আজই। ছুটি না নিয়েই চলে এসেছি, দেরী ক'রবার উপায় নেই।

বাবা ব'ল্লেন, ওর অসুখ হয়েছে কত দিন?

দাদা কি ভাবছিলেন; বেশ হঠাৎ চাবুকের বাড়ি প'ড়ল এমনি ভাবে তিনি চম্‌কে যেন জেগে উঠ্‌লেন। একটু ইতস্তত করে ব'ল্লেন, দিন পনর।

প্রভাস কেমন আছে?

আছে ভালই।

এরা কি দেওঘরেই ছিল?

দাদা মুখ ফিরিয়ে আস্তে একটা 'হ্যাঁ' ব'লেই সেখান থেকে চলে গেলেন।

দিদির অসুখ যে খুব বেশী তা নয়। সামান্য একটু জর, মুখে অরুচি; এই অসুখেই সে দিন দিন শুকিয়ে একেবারে কাঠি হয়ে গেছে।

ওষুধ সে খায় না, কেউ কাছে না থাকলে জানলা দিয়ে ফেলে দেয়।

তার জন্যে আমরা যদি কেউ কিছু ব'লতাম দিদি তাকিয়ে একটু হাসত, আর কিছু ব'লত না। কত অনুরোধ ক'রতাম, পায়ে ধ'রতাম—ঐ একই উত্তর।

দিন দশেক কাটল।

দিদির অবস্থা দেখে সবাই হতাশ হ'য়ে উঠ্‌ল। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল, জীবনের কোন আশা নেই, দিদি বোধ হয় তা জানতই; পরের মুখে শুনে সে যেন একটু প্রফুল্লই হ'ল।

আমি দিদিকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, দিদি জামাই বাবুকে আস্‌তে লিখব? দেখলাম একটা বিপ্লব দিদির চোখ মুখের উপর দিয়ে বয়ে গেল। সে আমাকে ছুই হাতে জড়িয়ে ধরে আর্ত্তস্বরে কেঁদে বল্ল, না, না, তার নাম মুখেও আনিস নে।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, সে কি দিদি, রাগা-রাগি করে আস নাই ত? দিদি ছুই হাতে মুখ ঢেকে ব'ল্লে, সে কি কখন আমার উপর রাগ ক'রতে পারে?—সে যে দেবতা! দেবতা! কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জোরে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ সেটাকে বুকের ভেতর পুরে রেখে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলে—যেন কতকগুলো আগুনের হলকা বুক থেকে বের হয়ে গেল।

ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলাম না; রাগারাগিও হয় নাই, অথচ তার নাম মুখে আনতেও নারাজ। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন ক'রলাম, দিদি তোমার পায়ে পড়ি—বল না কি হয়েছে?

দিদি নিজের হাত ছুখানা শক্ত ক'রে বুকের উপর চেপে রেখে একটু উচ্চ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বল্লে, সে কথা তোকেই বলে যাব লীলা, কিন্তু আজ নয়।

ক্রমে দিদির জীবন-প্রদীপ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হ'য়ে পড়্‌ল, শরীরে আর কিছুই রইল না,—কেবল হাড় ক'খানা। ডাক্তার এসে বলে গেল, যে-কোন সময়ে মৃত্যু ঘটতে পারে।

এক দিন দিদির পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, এমন সময় দিদি হঠাৎ চম্‌কে উঠে বল্‌লে, কে?

আমি লীলা, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না?

দিদির যেন সংজ্ঞা ফিরে এল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, হ্যাঁ, সেদিন যা শুন্‌তে চেয়েছিলি আজ তা বলব, লীলা। আমি তাড়াতাড়ি ব'ল্লাম, না দিদি, আর বলে কাজ নেই, তোমার কষ্ট হবে।

দিদির শরীরের অবসন্নতা যেন অনেকটা কমে গেল। আমার কথা শুনে একটুখানি হেসে ব'ল্লে, আমার কোন কষ্ট হবে না—আজ বেশ আছি। ব'লে দিদি খানিক চোখ বুঁজে রইল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থেকে দিদি বলতে লাগল, আজ কোন সত্যকেই আর মিথ্যের আবরণ দিয়ে ঢেকে নূতন করে পাপের বোঝা ভারি ক'রতে চাই নে। আজ যে সব কথা তোর কাছে বলে যাব, শুনে অসীম ঘৃণায় তোর মন ফিরে দাঁড়াবে তা আমি জানি; কিন্তু মনে রাখিস বোন, আমি সহস্র অপরাধী হলেও তোর দিদিই। ব'লে খানিক চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বলতে সুরু ক'রলে, বাবা যার হাতে আমাকে স'পে দিয়ে গৌরব অনুভব ক'রেছিলেন, আমি কিন্তু তাকে ভাল বাসতে পারি নাই। প্রথম জীবনের একটা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ তাকে দেখেই একটা ঘা খেয়ে ফিরে এসেছিল। বহু চেষ্টা ক'রেছি—এত চেষ্টা ক'রেছি যে, অবাক হয়ে যাবি, কিন্তু আমার মনের গতি সরল করতে পারি নাই। কিন্তু ঐ কুৎসিত কদাকার চেহারার অন্তরালে টাটকা গোলাপের মত একখানি কোমল প্রাণ ছিল, তার সন্ধান এতদিন কাছে থেকে পাই নি, এখন পেয়েছি। ব'লে, দিদি থেমে যেন সেই প্রাণের পরশ অনুভব ক'রে নিল।

তোমার যদি কষ্ট হয় তবে থাক, আমি আর শুনতে চাই নে।

দিদি আমার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে বলে যেতে লাগ্‌ল, মাঝে মাঝে ছুঃখ ক'রে ব'লত, আমার হাতে পড়া তোমার ঠিক হয় নি, এ-বানরের গলায় মুক্তার হার হয়েছে।

তার মুখের অতবড় সত্যটাকে আমি তার সামনেই অস্বীকার করতে পারি নি; আমার প্রাণে অতৃপ্তির ইতিহাস আমার মুখেই ফুটত, গোপন করবার দরকার কখনও বুঝি নি।

রক্ত আমাশয় হ'য়েছিল আমার সেবার, সে যে কি যত্ন—কিসে আমার যন্ত্রণার একটু লাঘব হবে তাই সে

দিনরাত খুঁজত। আমার মুখে একটু হাসি দেখ্‌লে তাব আর আনন্দের সীমা থাকত না।

কিন্তু এর প্রতিদানে আমি কি দিয়েছি জানিস? আমার অসুখ সারলেই সে অসুখে পড়ল। একটি বার দেখা পাবার জন্যে তার তৃষিত চক্ষু দুটি দরজায় পড়ে থাকত; আমি তা দেখেও দেখি নি।

এক দিকে অসীম অনুরাগ অন্যদিকে অনন্ত বিরাগ, এরই মাঝে আমাদের নিদারুণ দিনগুলি কাট্‌ছিল; এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেল।

ক'দিন বাড়ী ছিল না, জমিদারী দেখতে গিয়েছিল; হঠাৎ একদিন ফিরে এল সে একা নয়, সাথে একটা বছর বাইশের ছেলে, বেশ সুন্দর ফুটফুটে চেহারা—নাম সৌরেন।

অন্তরের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই, রূপেরই যে উপাসক, তার পতনের বেশী দেরী লাগে না। পাপের প্রথম সোপানে নামতেই জীবনের গতি একেবারে বদলে গেল। যে হৃদয় মরুর মত শুষ্ক ছিল, সেই মনটা কোন্ যাদুকরের মায়া-দণ্ডের স্পর্শে একেবারে রসে ভরপূর হ'য়ে উঠল—সৌরেন আমার হৃদয় জুড়ে ব'সল।

কি জিজ্ঞাসা ক'রছিস?—স্বামীর কথা? হ্যাঁ, সে দিকে কি তাকাবার আমার অবকাশ ছিল! আগে খাবার সময় কাছে গিয়ে একটু বসতাম, তাও বন্ধ করে দিলাম। সে দশটায় খেয়ে আফিসে চলে যেত, ফিরত রাত আটটায়; আমাদের কোন ব্যাঘাত হত না, হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার বেগ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল, কোন দিকে লক্ষ্য নেই—অন্তর বাহির সৌরেন-ময়।

একদিন দুপুরে সৌরেন আমার কক্ষে, এমন সময় দরজা ঠেলে সে বলল, দরজা খোল।

দুজনেই চমকে উঠলাম; হাজার হলেও সব বিষয়েরই একটা সীমা আছে। তারই বাড়ীতে তারই বুকের উপর বসে এই অত্যাচার—ধর্ম্মে আর সইবে কত! রুদ্ধ কক্ষে দুজনে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলাম। দ্বিতীয় বার শোনা গেল আর একটু চড়া গলায়, দরজাটা খুলে দাও। সাহস হ'ল না সে আদেশ অমান্য করি। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালাম।

সে ঘরে ঢুকে একবার আমার, আরবার সৌরেনের দিকে চেয়েই মুখখানা নীচু ক'রে বললে, একখানা বই ফেলে গেছি। বলে আলমারী থেকে একখানা বই নিয়ে চলে গেল।

অত বড় আঘাতটা যে নির্ব্বিবাদে বহন ক'রে চলে যেতে পারে সে কি মানুষ? যে মানুষের সুখ দুঃখের অস্তিত্ব নেই, হাসি আর কান্না যে সমান আদরেই গ্রহণ করে—সে দেবতা।

আর ঢেকে রাখার কিছু ছিল না, তবুও যেন পাপ লুকাতেই কপট ব্যবহার সুরু ক'রলাম।

এই ঘটনার পর থেকে স্বামীকে আদর যত্ন ক'রতে লাগলাম। সে দেখে একটু হাসত, আর কিছু না। আমি ভাবতাম কিছুই সে জানতে পারে নাই। এখন বুঝছি সে হাসির অন্তরালে কতটা আত্মত্যাগ আর কতখানি ব্যথা সঞ্চিত ছিল।

একদিন সে আমাকে ব'ললে, তোমার শরীর দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, চল দিন কয়েক দেওঘরের বাড়ীটায় থেকে আসা যাক। বেশী লোকজন নিয়ে দরকার নেই। তুমি আমি আর সৌরেন।

আপত্তি করতে পারলাম না; যাবার দিন হল। অনেক বার স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে গেছি কিন্তু এবারকার আয়োজন একটু নূতন ধরণের। আমায় সুখী করার চেয়ে বড় জিনিস যে তার কিছু আছে তা আমার বোধ হল না। যত ভাল দামী দামী জামা-কাপড় ভারি ভারি গয়না—সমস্ত আমার বাক্সে ক্যাশবাক্সে বোঝাই ক'রে দিল। আমি আপত্তি করতেই সে ব'লল, এবার কিছু বেশী দিনের জন্যে যাচ্ছি কি না—তাই।

দুখানা গাড়ী রিজার্ভ করা হ'ল। আমি ব'ললাম—যাব আমরা দু' জন, দুখানা গাড়ী নিয়ে কি দরকার?

হেসে ব'লল, দরকার আছে।

আমি গাড়ীতে উঠেছি ; গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় সৌরেনকে আমার গাড়ীকে তুলে দিয়ে স্বামী ব'লল, আমি পাশের গাড়ীতে উঠলাম। আমার ক্যাশবাক্সটি রাখ খুব সাবধান, চাবিটাও থাক্ ; ব'লে সে চলে গেল, গাড়ীও ছেড়ে দিল।

আর তার দেখা পাই নি। যে সৌরেন আমার সর্ব্বস্ব ছিল, তাকে আমি শেষে লাথি মেরে তাড়িয়েছি। ব'লে দিদি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রল।

আমি এতক্ষণ হাঁ করে কথা গিলছিলাম, দিদি থামতেই আমি ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, দিদি, সে ক্যাশবাক্সে কি ছিল?

দিদির যেন চমক ভাঙ্গল।—সে বাক্সে?—প্রায় দশ হাজার টাকার নোট আর ছিল একখানি ছুলাইনের চিঠি! বলে দিদি পাশের বালিসটাকে বুকের মধ্যে শক্ত করে'চেপে ধরল।

আমি দিদির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ব'ললাম, দিদি, সে চিঠিখানা আছে?

দিদি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে ছ'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে হা হা ক'রে কেঁদে উঠল। একটা মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদ তার গলা থেকে বেরুল, বলতে প্যারিস লীলা, আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে গাঢ়স্বরে ব'ললাম, কিসের প্রায়শ্চিত্ত দিদি—কি ক'রেছ তুমি? যে অনুতাপের আগুন তোমার হৃদয়ে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে তাতে ওর চেয়ে বহু গুণে বড় অপরাধকেও পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলতে পারে।

দিদি আমার হাত ছুখানি চেপে ধরে ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, পারে লীলা?

হ্যাঁ দিদি। আমি কি মিছে কথা ব'লছি!

দিদি একটি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে চুপ ক'রে রইল।

খানিক পরে আমি আবার জিজ্ঞাসা ক'রলাম, দিদি, সে চিঠিখানা—

দিদি স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বুকের কাপড়ের ভেতর থেকে একখানা চিঠি বের ক'রে আমার হাতে দিয়ে ছুই হাতে মুখ ঢেকে চুপ ক'রে রইল।

দেখলাম চিঠিখানিতে লেখা আছে—আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও। একটা কুৎসিত কদাকার জানোয়ার নিয়ে এত দিন কি ভাবে কাটিয়েছ তা মনে করতেও তোমার উপর শ্রদ্ধায় আমার অন্তর ভরে ওঠে। যাতে তোমার কোন কষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা সঙ্গেই রইল। যদি কোন কিছুর দরকার পড়ে—চেও।

চিঠিখানির প্রত্যেক অক্ষরটি যেন বুকের রক্ত দিয়ে লেখা। শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে প'ড়ল।

শারদ-সঙ্গীত

শ্রীগোপাললাল দে

তরুণ অরুণ-হাসি আর নব জীবনানন্দে ভরা,
বরষা-হরষ নিখিলের নব শ্যামলতা দিয়ে গড়া
সাথে ল'য়ে শত কল-কণ্ঠের সুরকুহরিত বাণী,
দাঁড়ায়েছে আজি হেম-মুর্দ্ধজা শরত-প্রভাতখানি ;
শারদ উষার আলোয় ফুটেছে সোনার কমলকলি,
তাহারই পানেতে উড়ে চল্ ওরে নব মধু-লোভী অলি !

মেঘ মলিনতা অমলতা হ'য়ে আকাশে আকাশে রাজে,
কাকলী কণ্ঠ-কোলাহল আজি কাননে কাননে বাজে,
গলিত-হিরণ অলোক আলোকে নীপপুলকিত প্রাণ,
বুকে বুকে ভরা পরিপূর্ণতা চোখে মুখে অভিমান ;
কি আলোয় ছে'য়ে গে'ছে মরি মরি অম্বর ধরাতল,
ওরই পানে ওরে চিত্ত-চকোর উড়ে চল্ উড়ে চল্ !

দুঃখ যা আছে সে ত আছে ভাই চি:দিবসের জমা,
যে দিয়েছে ব্যথা শুধু ক্ষণতরে করে' আজ তারে ক্ষমা,
দিনেকের তরে হিসাব-খাতার জের-টানা করে' শেষ,
ভুলে গিয়ে' কথা আশা নিরাশার, ভুলে গিয়ে দিক্‌দেশ ;
বন্ধ করিয়া অতীতের ঘরে খোঁজা ব্যথা পাতিপাতি,
ছুটে চল্ ওরে ছুটে চল্ মোর উৎকণ্ঠিত সাথী !

ফুটেছে করবী আঁখি মেলিতেছে কণক চাঁপার কলি,
মৃদু সৌরভে গুঞ্জনরবে ছুটে ছুটে আসে অলি,
আকাশের কোলে ফুটিয়া উঠেছে মোহন স্বপনখানি,
অশথের শাখে বসি' দুটি ছোট পাখী করে কানাকানি ;
ওরে শোন্ শোন্ মেঘ-সীমানায় কে ওই ডাকিছে নাকি ?
উড়ে চল্ ওরে উড়ে চল্ মোর মুক্ত-পক্ষ পাখী !

রাতের তারা

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বাড়ীটার সামনেই ক'টা খাপরা-ছাওয়া ঘর। একটাতে এক অস্বাভাবিক মোটা এবং কালো লোক দু'চারটা ছেলে-ছোকরার সঙ্গে চোখে ঠুলি দিয়া ঘড়ির কাজ করে; আর একটায় এক গয়লানী গরু এবং উৎকল-বাসী ভাড়াটে লইয়া দিবারাত্র চীৎকার করে। শেষেরটায় থাকে অনির্ণীত বয়সের বুড়ী এবং তা'র জাঁদরেল ছেলে গোবরনাথ। কি উপায়ে যে শেষের সংসারটি চলে সেইটাই পাড়ার লোকের বিস্ময় এবং আলোচনার বিষয়।

ছেলে গোবর তা'র ডবল বয়সের লোকগুলির সঙ্গে বেলা চারটার পর হইতে পরদিন প্রাতে গ্যাসের আলো নিবিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত দাবা খেলে। গ্যাসের ধারেই একটা বড়-বাড়ীর র'কে খেলার আসর বসে বলিয়া তেলের খরচটা মিউনিসিপালিটির ঘাড়ের উপর দিয়াই চলে। এবং সেই বাটীর কর্ত্তা স্বয়ং এ রসে রসিক বলিয়া এই নিত্য-যুদ্ধমান খেলোয়াড় দলটিকে নোটীস দিতে কেহ সাহস করে না। খেলার ঝোঁকে রাত্রে প্রায়ই গোবরের খাবার ফুরসৎ হয় না। এটি দরিদ্র সংসারের পক্ষে ভাল হইলেও পাড়ার সমালোচকরা বলেন, সে নাকি বেলা চারটার পূর্ব্বে সোপকরণ যে সূক্ষ্ম দ্রব্যটি সেবন করিয়া আসে তা'তে রাত্রে আর আহারে বসিবার প্রয়োজন হয় না, আর সে কথাটা স্মরণও থাকে না!

এ খরচও বুড়ী চালায়; কিন্তু যেদিন চালাইবার খরচার অভাব হয় সেই দিনই ঘরের ভিতর গোবরের ক্রুদ্ধ কণ্ঠের রুদ্ধধ্বনি শোনা যায়, কালী-মার জট নইলে এ দেহ একটি দিনও টিকবে না—এই শুনে রাখ।

গর্জ্জনও শোনা যায়, মীমাংসাও হয়। এবং তা'র জন্যে মাঝে মাঝে স্যাকরার নিকট যাইবার প্রয়োজন হয়। অবসর সময়ে বুড়ী আসিয়া ঘড়ির দোকানে বসে। বলে, মিস্ত্রী, ছেলেটার কথাই দিবারাত্রি ভাবি!

জগদ্দল মিস্ত্রী উত্তর দেয় না। ঘড়ির কলগুলো চোখ দিয়া দেখে আর ছোট্ট হাতুড়ীটা দিয়া ঠুক্ ঠাক্ শব্দ করে। মধ্যে মধ্যে হাসে—কালো পাহাড়ের বুকচেরা নদীটির মত হাসি।

বুড়ী বলে, বড় ছেলেটাই মানুষের মত ছিল; রেলে রেলে ঘষাঘষিতে মলো! শেষ দেখতেও পেলুম না। ছোট্টা ত' ঐ চব্বিশঘণ্টা দেখ্চ! মেজটা বারবছর নিরুদ্দেশ।...

ঘড়ীর কারবারী সময়ের দর জানে; ঘড়ীর টিক্-টিক ভেদ করিয়া বুড়ীর কাহিনী তার অন্তরে পৌছায় না। জগদ্দল ভোরের ম্লান অন্ধকারে আলো জ্বালিয়া কাজ শুরু করে। রাত এগারটার পর দোকান বন্ধ করিতে করিতে বলে, ওরে ছুলো, জানিস্, সেই অত রেতে যখন কাজ করতে আসি, তখন দেখি—বুঝ্‌লি কিনা, তখন সেই বুড়ীটে রোজ তা'র মেটে ঘরের ভাঙ্গাজানলায় মাথা রেখে পথের দিকে চেয়ে থাকে!...

বাজে কথা বলিবার অন্য সময় তা'র হয় না।

ছুলো বলে, বুড়ী ওর ছেলের আসা দেখে! মিস্ত্রী, তুমি ত বছরে এক হপ্তার বেশী একটি দিনও ছুটী দেবে না! আমার গাঁয়ে আমারও মা'টি বুঝি অমনি করে তাঁর লক্ষ্মী-ছাড়া এক ছেলের পথ চেয়ে থাকেন।...

কল-কব্জার মিস্ত্রী মানব-হৃদয়ের ভাঙ্গা-গড়ার খবর বুঝে না। গম্ভীরমুখে তালা চাবিটা ঠিকভাবে আঁটা হইল কি না পরীক্ষা করে!

দূর বনগ্রামে গরীবের মা ছেলের পথ চাহিয়া থাকে; আত্মপ্রতিষ্ঠা-ব্যাকুল মহানগরীর এক খোলার ঘরে বুড়ী আপনার পলাতক ছেলের আসিবার প্রহরটির প্রতীক্ষা করে! রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া শেষ হয়, তবু জাগা শেষ হয় না!

এমনি করিয়াই বারটি বছর কাটিয়াছে।

পাড়ায় সরকারী কল একটি, এবং সেটি গয়লানীর আটচালার নিকটে বলিয়া অন্যের হাত ঢোকানো সেখানে শক্ত হয়। আটটার পূর্ব্বে মহাপ্রভুর শিষ্যরা কল ছাড়ে না। অথচ বুড়ীর ছেলের আটটার মধ্যে ভাত না হইলে চলে না। ভাত পেটে দিয়া সেই বিছানায় পড়ে, তিনটার এ-দিকে ঘুম ভাঙ্গে না।

বুড়ী ছোট টিনের বালতি লইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া থাকে। মুখে জল দিতে দিতে কন্দর্প বলে, বুড়ীর ছেলেকে সে এবার দেশে বিয়া করিতে গিয়া পুরীর পথে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছে। অন্নসত্রে ভাত খায়, এ-ধারে সে-ধারে পড়িয়া থাকে। কন্দর্প আজ পনের বছর কলিকাতায় বাস করিতেছে, তাই বুড়ীর ছেলেকে সে একটু জানে।

অন্য প্রভুরা চেষ্টা করিয়া দেরী করে দেখিয়া কন্দর্প বলে, এ'বুড়ী-মা, নাও, তুমো আগে নাও। বসন্ত, শ্রীকান্ত প্রভৃতি দেশীয়দের নিকট সে গল্প করে, তারও অমনি এক উড়িয়া মা ছিল। সেই বাংলায় বাইশ সনে যখন কাঁটা পুকুরের গোঁসাইরা তা'র কাপড়ে একটা নিষিদ্ধ জীবের আঁশ পাইবার অপরাধের সঙ্গে আরও কয়েকটি অজ্ঞাত অপরাধ একত্র করিয়া তাকে জেলে রাখিয়া আসে, সেই সময় সেই বুড়ী তা'র কন্দর্পের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া হঠাৎ এক শীতের ভোরে সব ভাবনা চিন্তা শেষ করিয়া গেল।

বছর দুই পরের কথা।

একদিন সন্ধ্যার সময় দেখা গেল, বুড়ীর সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলেটা দেড়খানি ঠ্যাং, একখানি হাত এবং পূর্ব্ব আকৃতির অর্দ্ধেকটুকু লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিন জগদ্দল মিস্ত্রীও চোখ হইতে টুপী নামাইয়া একবার সেই বিকলাঙ্গকে দেখিয়াছিল।

বুড়ীর সংসারে দুটি লোক ছিল, একটি বাড়িল। বুড়ী কিন্তু খুসীই হইল, পাড়ায় পাড়ায় কাঁদিয়া হাসিয়া সংবাদ দিয়া আসিল। শুধু গোবরনাথ একটু বিরক্ত। এখন সে সংসারে অন্যকিছু আসিবার পূর্ব্বেই তা'র কালীর জটা আনাইবার পয়সা কাড়িয়া লয়। পীরুর অধিকাংশ সময় কাটে কন্দর্পের কাছে বসিয়া।

পীরু বলে, ভাই কন্দর্প, তোমারই দয়ায় বুড়ীর দোরে ফিরে এসেছি। ভাগ্যি তুমি দেশে··· বলিয়া হাঁপায়—বুঝি এই মুহূর্ত্তে শেষ হইয়া যায়। এমনি রুগ্ন ক্ষীণ দেহ।

কন্দর্প তার দেশী দোক্তা দিয়া পান সাজিয়া দেয়, বলে, তুমি ভাই, এমন কি করে হ'লে তাই বলো।

পীরু একহাতে লাঠিটা ধরিয়া কাঁপিয়া উঠে।

···আগুনের রাজ্যরে ভাই লঙ্কাপুর!···ভোরে উঠে ইস্তক শোনো শালা যন্তরের যন্তরণা আর চীৎকার। রাতেও দেখ আকাশ আলো করে রাঙা হাতীর মত বয়লারগুলো জ্বলচে! দুপ'রে—কারখানার ভিতরটা সূর্য্যের তাপকেও ছাড়িয়ে যায়।...কণকণে শীতের ভোরে উঠে চলেচি সবাই ঘুমভেঙ্গে! দেহের মধ্যে শীরেগুলো সব আড়ষ্ট হয়ে যায়!·· তখন কি তা'রা মানুষ থাকে ভাই কন্দর্প,...সব বেটা পেরেত! পেরেত তা'দের কথা বলায়, তাদের ঘুমভাঙ্গায়,—'ভোঁ—', দিয়ে কারখানায় নিয়ে যায়! আর যখন ডিউটি নিয়ে ছেড়ে দেয়, তখন দেখো, কোনো বেটাকে আপনার জন বলে ঠাওরাতে পারবে না।...কি ভয়ানক ডাক বাঁশীগুলোর, যেন রক্ত দিতে ডাকচে!...

একেবারে এতগুলো কথা বলিয়া পীরু অবসন্ন হইয়া লাঠিটার উপর ঝুঁকিয়া পড়ে! কন্দর্প এবং তা'র বন্ধুরা ভাবে, সে দৈত্যপুরী না জানি কি!

পীরু আবার আরম্ভ করে, শালার দেশের চাকরী! মনিব হয়েই একদম ভুলে যায়, শালারা আমাদেরই মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়! আমাদেরই মত হাত-পা-অলা

জন্তু !...বলি, কন্দর্প, আমরা যদি ক্ষেপে উঠি, তাহ'লে শয়তানের পুষ্যিপুত্তররা দাঁড়াও কোথা! কিন্তু মজা এই, আমরা ক্ষেপার মত ক্ষেপিও না, তারাও তাই নিযুত কোটী বুকের উপর পা দিয়ে দাঁড়াতে ছাড়ে না!...সব শালা বজ্জাত!

রুগ্ন শীর্ণ দেহটা ঘন ঘন কাঁপাইয়া পীরু তাহার নিপীড়িত জীবনের এক একটি পাতা তা'র মুগ্ধ শ্রোতাদের সামনে খুলিয়া দেয়। সব তারা বুঝে না, তবু সেই ক্ষয়িষ্ণু লোকটার কথা তা'দের বুকে গাঁথিয়া যায়। তারাও বর্ণনার তালে তালে উত্তেজিত হইয়া তা'দের বন্ধুর পিষ্ট ক্লিষ্ট জীবন-কথা শুনিয়া যায়।

পীরু বলে, ওরা আমাদের জাত হ'লে আমাদের এমনি করে লাতি মারতে পারে। জাত হারিয়ে মনিব হয়েচে কন্দর্প!...ঐ মনিবরা একদল, আর আমরা একদল! এই জগৎ জুড়ে রয়েচে শুধু ঐ দুটো জাত, মনিব আর মজুর! বন্ধু আর শত্রু!...

কন্দর্পের মধ্যে একটা পুরাতন স্মৃতি সাড়া দেয়। সে তখন কয়েদখানায়! পীরু বলে, সখি বলে ডাকি তারে। কাজ আলাদা রকমের, তাই দু'জনে আলাদা খাটি। আর মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে খাটতেও দেয় না, কল-অলাদের অসুবিধে হ'য় বলেই বোধ হয়। সখিটে কেমন একটু গায়ে-পড়া। তারে কাচে পেলেই মনটা রঙে উঠে!...ফিটার-মিস্ত্রীর কালো মন!...

একদিন কি একটা দরকারে সখি ফারণেশের মধ্যে এল। ইনচার্জ্জ সায়েবটা তখন বুঝি টিপিন করতে গেচে। সখিরে কাচে ডেকে দুটো কতা শুধোচ্চি— শালা পেছন থেকে এসে মারলে এক লাতি! থুবড়ে প'লুম গিয়ে কলের কাচে। পিছনে সামনে আগুনের মত কলগুলো গজরাচ্চে...পা'টা আর ঠ্যাংটা ভাগাভাগি হয়ে গেল।—

দেড় বছর পরে যেদিন এই অবস্থায় কারখানার হাসপাতাল থেকে বা'র করে দিলে, সেদিন একটা লোক এসে খপর দিয়ে গেল, সখির একটা ছেলে হয়েচে। বাচ্চাটা নাকি ঐ শালা ইনচার্জ্জেরই মত রাঙা!...

অপসর, সায়েবদের ব্যারাক বাংলা সমেত কারখানাটা শীতের সন্ধ্যেয় ধোঁয়াচ্ছিল। চারিধারে যন্তরের চীৎকার, সবে দু'চারটে আলো জ্বলেছে, কুয়াসা-ঢাকা কারখানার দিকে শেষ বার চেয়ে নিয়ে ইষ্টিসেনের ঝড়জঙ্গলে ঢাকা পথের মধ্যে মিশে গেলুম!...নিজ দেহের অংশ দিয়ে আমি যন্তর-দানবের পুজো করে এবেচি...

এ কাহিনী পীরুর বলা নূতন কিছু নয়! ইহাই সব কারখানার অন্তরের ইতিহাস।

পীরু মেটে ঘরের সঙ্কীর্ণ র'কটায় পড়িয়া থাকে। গোবর তা'কে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। কত আঁধার-ঘন শীতের রাতে বুড়ী পুঁটুলী মারিয়া বাহিরেই কাটাইয়া দেয়। বৃষ্টি বাদলের সময় সেইখানেই চুপটি করিয়া গুড়ি গুড়ি দিয়া বসিয়া থাকে, আর নিতান্ত না পারিলে কন্দর্পের খোঁয়াড়ের একপাশে গিয়া শুইয়া পড়ে।

জগদ্দল মিস্ত্রী দিনরাত মুখ বুজিয়া খাটে। অনবসর গাধার মত খাটুনি! শুধু এই খাটা এবং গাম্ভীর্য্যে বাধা পড়ে তখন, যখন ক্ষিরি গয়লানী আসিয়া তা'র দোকানের দ্বার জুড়িয়া বসে! এই সম্পর্কে পাড়ার সমালোচকেরা, ক্ষিরি এবং জগদ্দলকে জড়াইয়া দু'একটা গর্হিত কথাও রটনা করে। মিস্ত্রী যে কখন ক্ষিরির হাতে ঘর ভাড়ার টাকা গণিয়া দেয় তাহা এতদিনেও কেহ দেখিতে পায় নাই। উপরন্তু ক্ষিরি ঠাকুরাণী প্রতিদিন প্রাতে আধ সের-আড়াইপো দুধ গেলাসে করিয়া মিস্ত্রীকে দিয়া যায়। মিস্ত্রী বলে, ইহার জন্য প্রতিদিন ক্ষিরিকে তা'র নগদ চৌদ্দ পয়সা দিতে হয়! তা' সত্ত্বেও দোকানের ছেলেরা বলে, মিস্ত্রী দেশ থেকে এসে দুবলা হয়ে পড়চে কিনা, তাই ত ক্ষিরি গয়লানীর দয়ার শরীল!

কিন্তু জগদ্দলের চেয়ে রোগা লোকের বাস ক্ষিরির খুব নিকটে থাকিলেও ক্ষিরিকে তা'দের প্রতি দয়া দেখাইবার অপরাধ এখনো কেহ দেয় নাই। সেই ক্ষিরি মধ্যে মধ্যে র'কে বসিয়া বলে, ঘর থেকে বড্ড দুধ কমে যায় মিস্ত্রী! কি ক'র যে...

জগদ্দল ঘড়ি রাখিয়া বলে, এই—বুঝলে কিনা, তোমায় আমি বলে দিলুম ক্ষিরি ঠাকুরুণ, এ যদি পীরে বেটার কাণ্ড না হয় ত' কি বলেচি! এই বুঝলে—এইখানে বসে সবই দেখ্‌চি!...শালা চোট্টা!

পীরু কন্দর্পের কাছে গল্প করে, মা বুড়ীর বড় মায়া কন্দর্প! খোঁড়া ছেলেটার জন্যে রোজ আধসের তিনপোয়া দুধ কিনবে! কোথায় যে পয়সা পায়!

বুড়ী যে দুধ জোগাড় করে তা'র জন্য হয় ত পয়সার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু অত বড় সূক্ষ্মকাজের মিস্ত্রী জগদ্দল—তার অনুমান যে মিথ্যা হইয়া যায়।

সে দিন সামনের মাঠে শীতলা দেবীকে শীতল করিবার উদ্দেশ্যে পাল টাঙাইয়া পূজামণ্ডপ ঘেরিয়া যাত্রা হইবে। লোকে জানিত, যাত্রা রাত্রি আটটার পর সুরু হইবে। কিন্তু আটটার পর—ক'টা বাজিয়া গেল, তবু ঢোলের আওয়াজ শোনা গেল না। সেদিন দাবার আড্ডাও বসে নাই। কন্দর্পের দল বিরক্ত হইয়া সারি সারি র'কে শুইয়া পড়িল। ঢোলে ঘা পড়িলেই উঠিয়া যাইবে।

গোবর অনেক রাত্রে যাত্রার আসর হইতে ফিরিয়া দেখিল স্থান বে-দখল হইয়া গেছে। একে একহাত খেলায় বসা হয় নাই, তায় শয়নের স্থান গিয়াছে, গোবরনাথ স্থির থাকিতে পারিলেন না। গোবর তার উর্ব্বর মস্তিকের ফলে যে ফন্দী আবিষ্কার করিলেন তাহার প্রয়োগে নিদ্রিত কয়জন পায়ের একটু উপরিভাগে অগ্নির উত্তাপ অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিল।

গোবর অবশ্য তখন আর ছিলেন না।

উৎকলবাসীরা আস্ফালন করিতে লাগিল, মারিবু। গোটে দেখাই দিয়—শড়াকে মারিবু।

পীরু র'ক হইতে সব দেখিয়াছিল, বলিল, গোবরবাবুকে জিগ্যেস করগে—কন্দর্পের দল পলাতক আততায়ীকে ধরিতে গেল।

...যাত্রার আসরে ঢোলের বাদ্যি শোনা গিয়াছে।...

গোবর আসিয়া বলিল, চোর। বসে বসে দুধভাত মারবে, আর উড়েদের— সঙ্গে সঙ্গে পিঠে একটা লাথিও পড়িল।

পীরু বলিল, গোবর, আজ যদি আমার হাত থাক্‌ত, আমি উড়েদের হয়ে হাতের ব্যবহার তোকে শিখিয়ে দিতুম। কি কর্‌ব! আজ তাই তোর হাতে মার খেয়ে তোকে মারতে হচ্চে। গোবর, তারা সারাদিন খেটেখুটে ঘুমোলে তোকে জ্বালাতন করে না, তারা তোর চেয়ে অনেক ভাল, অনেক ভদ্র।

গোবর ভদ্রতার আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। নুলো খোঁড়া ভাইটার পিঠে আরও দুচারটা লাথি-চড় দিয়া ভদ্রতার পরিচয় দিল।

রাত তিনটার পর যাত্রার আসরে লোকসমাগম হইতে লাগিল, বাজনা বাদ্যি শোনা গেল। জটার জঙ্গলে মুখ চোখ ঢাকিয়া কে একজন প্রস্তাবনা গাহিতে আসিল।

রুগ্ন পীরু তখন জীবনের দ্বন্দকোলাহল শেষ করিয়া মরণের সঙ্গীত গাহিতেছিল।

ভাঙ্গা ঘরের জানালায় বুড়ীকে দেখা গেল। একদিন যেমন করিয়া সে তার হারাণো ছেলের জন্য পথের পর চাহিয়া থাকিত, ঠিক তেমনি ভাবে আজও সে পীরুর রক্তমাখা পথ-ধূলির প্রতি চাহিয়া আছে!

মুখ ফুটিয়া বলিবার অধিকার বোধ করি তার নাই! দলে দলে লোক তখন যাত্রার আসরে ছুটিয়াছে!

জীবনের দেবতা হাসে না কাঁদে বোঝা যায় না।

ব্যথার পূজা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আজি জলে-ভরা ভাদ্রের চোখে
শরতের দিঠি জ্বলে,
স্নিগ্ধ করুণ আর্দ্র আলোকে
আঁকিয়া জলে স্থলে ;
হাসি হাসি আর কান্না কান্না,
হয় হীরা নয় জানি তা পান্না,—
এ যে অসহন মর্ম্মবেদন
চাপিবার শুধু ছল ;
এ হাসির চেয়ে শতবাঞ্ছন
বাদলের আঁখিজল !

হাহাকারে-ঘেরা শোকের আগারে
রাজার অভ্যুদয়
করায় যাহারে পারে বা না পারে,
উৎসব অভিনয় ;
সেই বুঝে এর গভীর অর্থ
আর্ত্তি লুকানো প্রাণের তত্ত্ব—
বিধবার মুখে বিলাস লজ্জা
প্রণয়ের সম্ভাষ,
কুসুমের হারে সমাধি সজ্জা
লুকালো সর্ব্বনাশ !

চির সুধাময় এই কি শরৎ—
দিগ্বিজয়ের দিন !
আজি না মুক্ত মিলনের পথ,
ত্রিজগৎ দ্বিধাহীন ?
যোগায় ধরণী ক্ষুধার খাদ্য
ঘরে ঘরে বাজে বিজয়বাদ্য,
বরষার বারি সাথে নাকি শেষ
নিরাশা অন্ধকার ?
এই কি শরৎ সুশুভ্র বেশ—
মূর্ত্তি সে ভরসার !

এ যে দেখি, হায়, বোধনের মাঝে
বাজে রোদনের ধ্বনি,
বিসর্জ্জনের বেদনা ভরা যে
আনন্দ-আগমনী !
বিকচ কুন্দ কাশের আস্তে
হাসে পরিহাস বিকট হাস্তে
হাঁসের পাখায় বিধুনিত আজ
আকাশের অন্তর ;
আলোর আড়ালে আঁধারের বাজ
গরজে নিরন্তর।

আর্ত্তপীড়িত পরপদানত
দুর্ব্বল দীনহীন,
নিত্যচকিত মৃত্যুআহত
দিনে দিনে ক্ষয়ক্ষীণ,—
তার চোখে এ কি প্রাণের দীপ্তি
তার মুখে এ কি হরষতৃপ্তি,
অন্ধ আগার ভেদ করি তার
একি আলোকের শিখা,
উঠে' বসে রোগী করি পরিহার
নিরাশার যবনিকা !

কোন্ উত্তরে হিমগিরিপারে
পড়িল স্নেহের সাড়া,
জাগিল লক্ষ বক্ষ মাঝারে
মমতার মধুধারা!
মৃত্যুর বুকে অমৃতস্পর্শ
ফুটায় যেমন প্রাণের হর্ষ
টুটাইয়া দিয়া নিমেষের তরে
পুঞ্জিত অবসাদ;
উথলিয়া উঠে অশ্রুসাগরে
আলোর আশীর্ব্বাদ!

তাই আয় মাতা, আয় শারদীয়া
শ্মশানসাহারামাঝে,
দীর্ণ দলিত বক্ষে ঘা দিয়া
বাজা না যে সুর বাজে;
আশায় রিক্ত ব্যথায় তিক্ত
শত সংগ্রামে শোণিতসিক্ত,
তবু তারি মাঝে দিব তোর পূজা
জীবনরক্তদানে,
দশ হাতে তাই নে মা দশভুজা
ভক্তের আহ্বানে।

তোমার কথাটি

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

তোমার কথাটি শেষ কথা আজ,
তবু সে প্রথম মোর,
বালিকার মনে নবোদিত লাজ,
শৈশব-শেষের ভোর!
সাদা ছিল আঁখি কাজলবিহীন,
সিধা ছিল দেখা তার,
ভোলা-কথা আর খোলা নিশিদিন,
হাসিধারা ঝরণার--
তুমি এনে দিলে নতুন মানুষ
সব পুরাণোর মাঝে,

ক্ষেপা যে আছিল, আছিল বেহুঁষ
সাজিল নতুন সাজে!
খোলা দুটি চোখ অভয় সরল,
সহসা পড়িল নুয়ে'
শূন্যে ছিল যার গতি অবিরল,
সে আজি নামিল ভুঁ'য়ে!
আকাশ কুসুম রহিল কোথায়?
সাজিল মাধবী ফুলে,
কি নব বেদনা, কথায় কথায়
অশ্রু আঁখির কূলে!

নিবেদন

এবার কয়েকদিন আমাদের কার্য্যালয়ের ছুটি থাকিবে। সুতরাং এর মধ্যে কোনও চিঠি পত্রাদির উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না।

অগ্রহায়ণ সংখ্যা আবার ১লা অগ্রহায়ণই প্রকাশিত হইবে।

কল্লোলের পাঠকপাঠিকা ও বন্ধুবর্গের প্রতি আমাদের সবিনয় সম্ভাষণ জানাইয়া আমরা এই পূজাবকাশ গ্রহণ করিতেছি।

এই অবসরে, এই নূতন বৎসরের ছয়মাসকাল ও তাহার পূর্ব্বে যিনি যে ভাবে কল্লোলকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে আমাদের সবিনয় নমস্কার জানাইতেছি।

কতকগুলি ভাল গল্প ও রচনা বিলম্বে পাইয়াছি বলিয়া কার্ত্তিকের সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা হইয়া উঠে নাই।

শিল্প-চিত্র—

এবারকার ছবিখানি যশস্বী শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয়ের অঙ্কিত। কল্লোলের প্রতি তাঁহার অনুরাগবশতঃ তিনি এই ছবিখানি নিতান্ত অনবসর সত্ত্বেও আঁকিয়া দিয়াছেন। এই তরুণ শিল্পী অতি অল্পকালের মধ্যেঃ তাঁহার plaster work, clay-modelling ও জল-রঙের (water colour) কাজের জন্য সমগ্র ভারতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা বিশেষ অভিবাদন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সাধক-শিল্পী, বাঙলার কলা শিল্পের অনুবর্ত্তক শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয়ও কল্লোলে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র দিয়া আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়াছেন। তাঁহাকেও আমরা আন্তরিক প্রীতি সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

দান স্বীকার

সুকুমার ভাদুড়ীর ঋণ-ভাণ্ডারের জন্য আরও কিছু সাহায্যের দান লাভ করিয়াছি। দাতাগণের এই মহৎ দান আমরা কৃতজ্ঞ অন্তরে ও ঈশ্বরের নামে স্বীকার করিতেছি।

শ্রীমতী বীণাপাণি রায় (কলিকাতা)	১০৲
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লোধ (পুনা)	৫৲
'প্রগতি সমিতি' (ঢাকা)	১০৲
	২৫৲

গত সংখ্যায় একজন দাতার নাম ভুল প্রকাশিত

হইয়াছে। দিল্লীর শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ছাপা হইয়াছে।

ধারাবাহিক রচনা

গত সংখ্যায় আমরা জানাইয়াছিলাম ধারাবাহিক উপন্যাসগুলি ও শরৎচন্দ্রের অধ্যায় যাহা হাতে পাইব, তাহা কার্ত্তিকের সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারিব। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে 'স্মৃতির আলোর' কয়েকটি পরিচ্ছেদ পাইয়াছি। অপর রচনাগুলির কিছু পাই নাই। কার্ত্তিকের সংখ্যা তাড়া-তাড়ি করিয়া ছাপিতে হয়, কারণ ছাপাখানার পূজার ছুটি হইয়া যায়। এই কারণে কাজেরও একটু ভীড় পড়ে। লেখক মহোদয়গণের নিকট হইতে লেখাগুলি পাইবার জন্য আর অপেক্ষা করিতে পারি নাই।

লিটনের চিত্র ও প্রদ্যোত কুমার

ইংলণ্ডের মরনিং পোষ্ট পত্রিকায় প্রকাশ যে, স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, জি, পি, জ্যাকস-হুড্ নামক শিল্পীকে কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রাখিবার উদ্দেশ্যে ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লিটনের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কন করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই শিল্পী নাকি পরে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন এবং ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার পরিবারের কাহারও কাহারও চিত্র আঁকিবেন। এদেশে তাঁহাকে একবার পাইলে, হয় ত অনেক ধনবান মহাজনই এই চিত্রীর দ্বারা বহু চিত্র আঁকাইয়া লইবেন। কারণ চিত্রের প্রয়োজন যত থাকুক বা না থাকুক, অন্য ধনিকের সঙ্গে টেক্কা দিবার অভিপ্রায়েও ধনবানরা ফ্যাসান হিসাবে এই শিল্পীর অঙ্কিত ছবি রাখিতে প্রলুব্ধ হইবেন।

স্যার প্রদ্যোতকুমার বাংলা দেশের লোক। লর্ড লিটনের প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত প্রীতি ও শ্রদ্ধা থাকাও অসম্ভব নহে। তাঁহার না থাকিলেও, গবর্ণমেণ্টের প্রীতি আকর্ষণ করিবার জন্যও বাঙলার অনেক মূর্খ ধনিক হয় ত এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইবেন। কিন্তু স্যার প্রদ্যোতকুমার শিক্ষিত ও গুণবেত্তার উৎসাহদাতা। তাঁহার পক্ষে একজন বিদেশী শিল্পীকে দিয়া এত অর্থ ব্যয় করিয়া লিটনের চিত্র অঙ্কিত করান শোভন হইতেছে মনে হয় না। এমনও হইতে পারে যে, স্যার প্রদ্যোতকুমার চিত্র-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন লাভ করিবার জন্যই এরূপ অর্থব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশেও বহু লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিত্রকর আছেন। তাঁহাদের কাহারও পক্ষেই লর্ড লিটনের বা আমাদের দেশের ধনী পরিবারের লোকজনের চিত্রাঙ্কন অসম্ভব নহে। তাঁহাদের কাজও যে সাহেব শিল্পর কাজ হইতে নিকৃষ্ট হইতেই এমন ধারণা থাকা দুঃখের বিষয়। সুতরাং দেশীয় চিত্রীদিগকে বঞ্চিত করিয়া বিদেশী শিল্পীকে কার্য্যভার দেওয়া স্যার প্রদ্যোতকুমার অথবা অন্য কোন ধনী ব্যক্তির পক্ষেই সুবিবেচনার কার্য্য নহে। প্রদ্যোতকুমার দেশীয় শিল্পীদিগকে বহুবার নানা প্রকার কাজ দিয়া উৎসাহ দান করিয়াছেন। দেশীয় শিল্পের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনেকেরই অবিদিত নহে। এই কারণেই বিদেশীকে এরূপ কার্য্যভার দেওয়া তাঁহার পক্ষে আরও অশোভন বলিয়া বোধ হয়।

দেশের লোক, প্রতি কার্য্যে যদি দেশবাসীকে সকল অবস্থায় সাহায্য না করেন, তাহা হইলে দেশাত্মবোধের আদর্শ ক্ষুণ্ন হয় এবং সেই সঙ্গে দেশের উন্নতির পথে বাধা পড়ে।

সঃ

বাঙ্গালা গল্পের স্থান

রস-সাহিত্যে আজকাল অনুরাগটা একটু বেশী বেড়েছে বলে' অনেকে বড় বিরক্ত। গল্প-উপন্যাসের নাম শুনলেই অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। গল্পের ওপর অনুরাগ কিন্তু এ যুগের একটা নতুন উপসর্গ নয়। ঠাকুমা দিদিমার কোলে মাথা রেখে শিশুকালে আমরা কত গল্প

শুনেছি, শোনবার জন্যে পাগল হয়েছি। আমাদের পিতামহ বৃদ্ধপিতামহরাও তাই করে গেছেন। তবে সেটা হ'ল মানুষের শৈশবের কথা। শৈশবে যা' প্রয়োজন, যা' শোভা পায়, পরিণত বয়সে তা ক'রতে গেলে লোকে হাসে। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞরা বলে' থাকেন, ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটী শিশুই বাস করে, এখানে নাকি পরিণত বয়সের মানুষ নেই। আজকালকার গল্প পড়ার বাতিকটা এই কথায় প্রমাণ হিসেবে ধরা যায় কি না, বলা শক্ত। তবে এ কথা বলা যায় যে, ভারতের মানুষ আকমাড়া-কলে চারিদিক থেকে অহরহ এমন নিঃশেষে পিষে ম'রচে যে জীবনে যে রস তা'রা হারিয়ে ফেল্‌চে সাহিত্যে তা'র ছিটে ফোঁটার জন্যে লালায়িত হওয়াটা মোটেই অস্বাভিক বলা চলে না; তা' ছাড়া, ছেলেবুড় সবাই রসের কাঙ্গাল। জীবনের অভাব চিরদিনই সাহিত্য পূরণ করে বা পূরণ করার জন্যে প্রয়াস করে। মানুষকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেওয়াই হল সাহিত্যের লক্ষ্য। রসসাহিত্যে মানুষের মনে সত্য ও সুন্দরের রূপ ফুটিয়ে তুল'তে চায়। ছোটখাট ঘরকন্নার কথা অনেক সময়েই এর অবলম্বন, এর মসলা; কিন্তু কৃতি রাঁধুণী যেমন সামান্য মসলা দিয়ে পরম রুচিকর ব্যঞ্জন তৈয়ারী করে' আমাদের জীবনের একটা প্রকাণ্ড প্রয়োজন সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রসাস্বাদের বাসনার তৃপ্তিসাধন করে, তেমনই তুচ্ছ নৈমিত্তিক জীবনের ঘটনা অবলম্বন করে' রসসাহিত্য এমন ব্যঞ্জনা, এমন প্রেরণা দেয় যে, তাকে কোন মতেই নিরর্থক বলা যায় না। বাঙ্গালার গল্পলেখক ও গল্পের পাঠককে এ হিসেবে ক্ষমা করা যায় কি না, তা, বিজ্ঞদের ভেবে দেখা দরকার।

তবে একটা কথা। বর্ত্তমান রসসাহিত্য বাঙ্গালীর প্রাণে কতটা প্রেরণা দিচ্চে, কতটা রসাস্বাদের বাসনা পরিতৃপ্ত ক'রচে, বা যে প্রেরণা দিচ্চে তা'তে আমাদের জাতীয় জীবনে সত্য ও সুন্দরের রস ফুটিয়ে তু'লতে কতটা সাহায্য করচে, এটা অবশ্য বিবেচনার কথা। আজকাল অনেকে মনে করেন আমাদের বর্ত্তমান রসসাহিত্য হয় বিরস অপদার্থ, না-হয় রসাল কিন্তু বীভৎস। কথাটা অনেকটা ঠিক। এক দল লেখক আছেন, যাঁরা মনে করেন, মানুষকে দেবতা নামক রক্তমাংসবর্জ্জিত অজ্ঞাত এক রকম অদ্ভুত জীবরূপ চিত্রিত করলেই মনুষ্যসমাজের পরম উপকার সাধিত হয়। মানুষ এ রকমের দেবতা হ'তে পারে না, বোধ করি, হ'তে চায়ও না। তাই সেরূপ চরিত্র মানুষের মনে যে রসের ভাণ্ডার লুকান আছে, তা'কে টেনে বার ক'রতে সাহায্য করে না, বরং শুকিয়ে তোলে। আবার অন্য দিকে একদল লেখক রসসৃজনে এমন কৃতিত্ব দেখাচ্চেন যে, বিশ্ববিধাতা মানুষের মনে যে রসপিপাসা দিয়েছেন, তা'কে নিছক রক্তপ্রবাহে মুক্ত ক'রতে চাইচেন। মানুষের অভাবকে রক্তমাংসের সঙ্কীর্ণ ক্ষণভঙ্গুর গণ্ডীর মধ্যে সোনার শিকল দিয়ে বেঁধে তাণ্ডব করে তু'লতে চাইচেন, এবং সেই প্রমত্ত অভাবের পূরণকেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব মনে করে' তাকে ডাকের সাজে মণ্ডিত করে' রস-পিপাসুর অগ্নিতৃষা সহস্রগুণ বাড়িয়ে তু'লচেন। এই দু'রকম রসের স্রোতে বাঙ্গালা রস-সাহিত্য তরঙ্গ তুলে চলেচে।

এই দু'রকম আতিশয্যের মোহ কাটিয়ে যদি বাঙ্গালা সাহিত্য কোন দিন মানুষের রক্তক্লেদের দাবী অস্বীকার না করে' তা'র অন্তরতম সুন্দরের চেহারা আঁকতে পারে তবেই বাঙ্গালা রস-সাহিত্য সার্থক হবে।

শ্রীপঞ্চানন মজুমদার
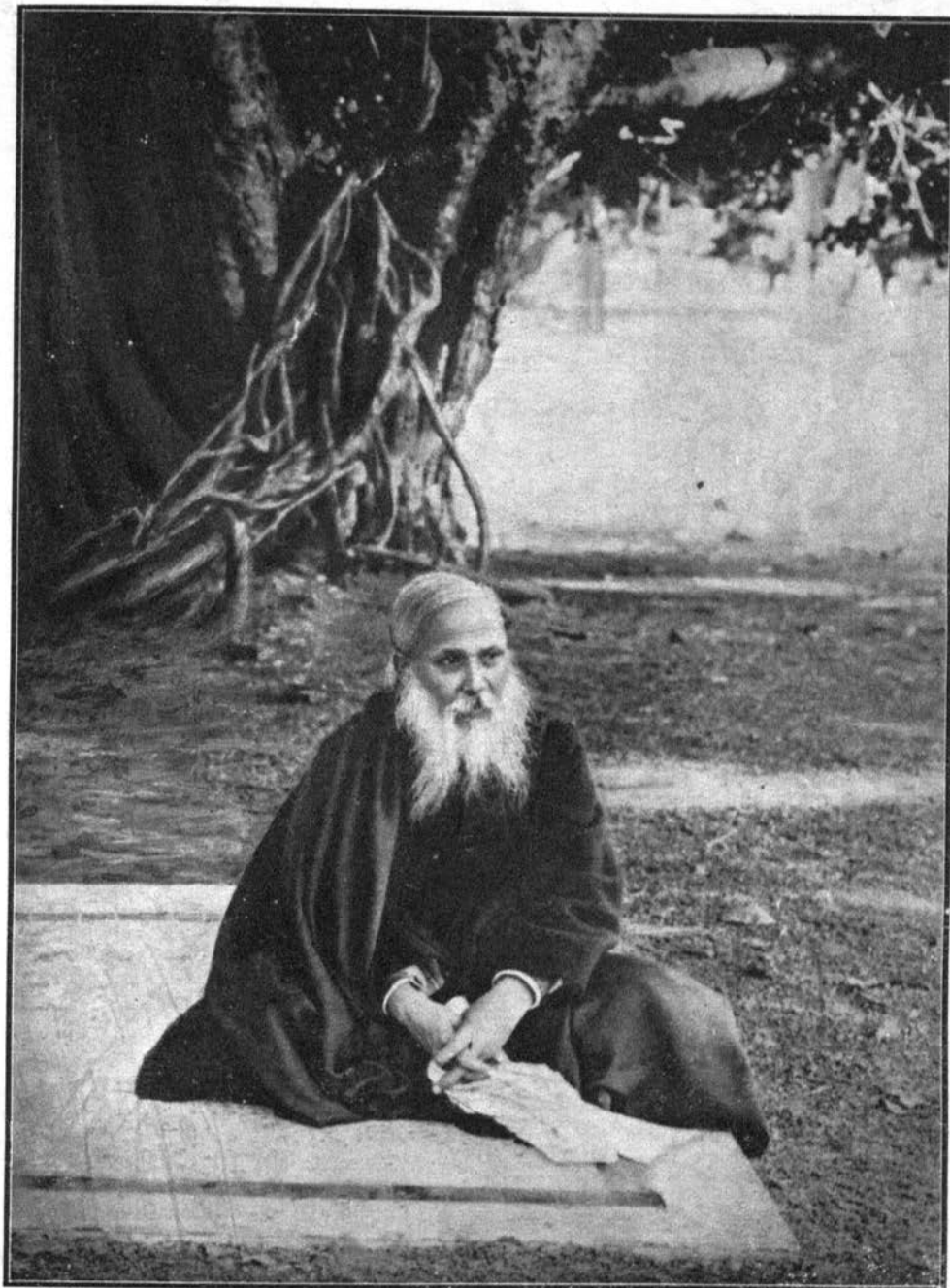
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ সাল

সম্পাদক
শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস,
১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

কল্লোল

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

দারিদ্র্য

নজরুল ইসলাম

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান !
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।—দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি ; বাণী ক্ষুরধার ;
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার !

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ !
শীর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি কর পান ! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ !

বেদনাহলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্ম্মম
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া সম !
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছলছল
ক'রে ওঠে সারা হিয়া. শিশির-সজল

টলটল ধরণীর মত করুণায় !
তুমি রবি তব তাপে শুকাইয়া যায়
করুণা-নীহার-বিন্দু ! ম্লান হয়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে ! স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের ! তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বল, 'অমৃতে কি ফল ?
জ্বালা নাই নেশা নাই নাই উন্মাদনা,—
রে দুর্ব্বল, অমরার অমৃত-সাধনা
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে !
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা !' . . .

গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,
দংশিল সর্ব্বাঙ্গে মোর নাগ নাগ-বালা ! . . .

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্ব্বাসা ! যাপিতেছে নিশি
সুখে বর-বধূ যথা—সেথানে কখন্
হে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাক,—'মূঢ়, শোন্,
ধরণা বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহ আছে আছে দুঃখ আরো
আছে কাঁটা শয্যাতলে বাহুতে প্রিয়ার,
তাই এবে কর্ ভোগ !'—পড়ে হাহাকার
নিমেষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি !

চল-পথে অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু,
কী দেখি বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভ্রূ-ধনু,
দু'নয়ন ভরি রুদ্র হান অগ্নি-বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান,

প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা,—
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা!

বিনয়ের ব্যভিচার নাহি তব পাশ,
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।
সঙ্কোচ শরম বলি জান না ক' কিছু,
উন্নত করিছ শির যার মাথা নীচু।
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে!
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে!

লক্ষ্মীর কিরীটী ধরি ফেলিতেছ টানি
ধূলিতলে। বীণা-তারে করাঘাত হানি
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ গুণী?
যত সুর আর্ত্তনাদ হয়ে ওঠে শুনি!

* *

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনিনু, সানাই
বাজিছে করুণ সুরে! যেন আসে নাই
আজো কা'রা ঘরে ফিরে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ডাকিছে তাদেরে যেন ঘরে 'সানাইয়া'!
বধূদের প্রাণ আজ সানা'য়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে! সখি বলে, বল্
মুছিলি কেন লা আঁখি মুছিলি কাজল? . . .

শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই!
ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম—স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি!

নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
তুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগলভায়
চুম্বনে বিবশ করি'! ভোমোরার পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা! . . .

উছলি' উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ!
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের! অকারণে আঁখি
পু'রে আসে অশ্রু-জলে! মিলনের রাখা
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে!
পুষ্পাঞ্জলি ভরি তুটি মাটী-মাখা হাতে
ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে তুলালী আমার!—
সহসা চমকি উঠি! হয়ে মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাও নি ক' কিছু
কালি হ'তে সারাদিন! তাপস নিষ্ঠুর,
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর!

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
তুই বিন্দু তুগ্ধ দিতে!—মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার তুয়ার ধরি! কে বাজাবে বাঁশী?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
কোথা পাব পুষ্পাসব?---ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্য্যাস! . . .

আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু---নাই কিছু নাই!

২৪ আশ্বিন, ৩৩
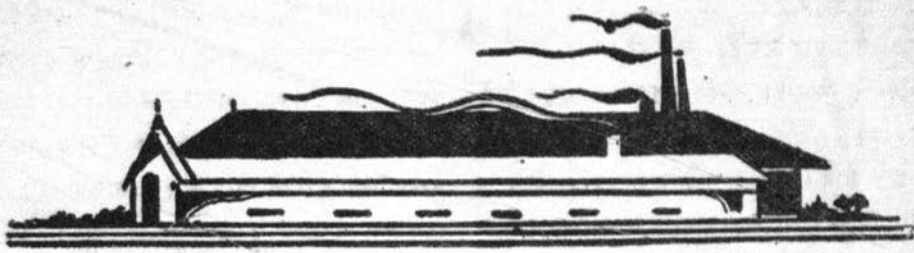
অবগুণ্ঠিতা

শ্রীভূপতি চৌধুরী

ভাল লাগে। অথচ কারণ খুঁজে পাই না।

এই যাযাবর জীবনের খাতার পাতায় কালির দাগ ত পড়েছে কম নয়, আজকের দিনে তার দিকে তাকিয়ে হাসি আসে, কোন মানে খুঁজে পাই না। তবু তার পাতা উল্টে যাই। একদিন দেখি হঠাৎ একটা গাঁয়ে আমার মন বসেছে।

কত জায়গাতেই ত' ঘুরলাম; কিন্তু তবুও এই জায়গাটার কথা মনে হ'লে আনন্দে আঘাতে আমার মন ভরে ওঠে; এই জীবনের গোধূলি লগনে আলো-আঁধারের খেলা লাগে। পুরাণো ছবিতে নতুন রঙের সোহাগ ফোটে।

নতুন 'রেল' বসেছে। গাঁয়ের লোকে অভ্যস্ত হ'য়ে যায় নি; তাই শব্দ শুনলেই সকলে সচকিত হ'য়ে ওঠে। পুরাঙ্গনাদের পূতদৃষ্টি বদ্ধ বাতায়নের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে ওঠে।

আর এই নতুন ষ্টেশনের এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার তার জাফরি-কাটা জানালার ধারে ব'সে টিকিট দেয় আর পয়সা গণে।

ষ্টেশন মাষ্টার হাঁকেন—ফকির, ট্রেণটা 'পাস্' করে দাও ত'।

তাড়াতাড়ি তখন কাপড়ের ওপর কালো কোট আর টুপী চড়িয়ে ছুটতে হয়। প্যাণ্টালুন পরবার অবসর বড় থাকে না।

চেঁচামেচি, হট্টগোল, যাত্রীর ওঠা-নামা, লাগেজ ক্লিয়ার শেষ করে' টিকিট 'কালেক্ট' করে আবার সেই খাপরার মধ্যে বসি।

টিনের চালওয়ালা ষ্টেশন; তিনটী ঘর। একটা ফাষ্ট' সেকেণ্ড ক্লাস প্যাসেন্‌জারের ওয়েটীংরুম। দুটী চেয়ার, একটা ঈজি চেয়ার, একটা টেবিল, একটা বেতের বেঞ্চি আর একটা আরশী; ব্যবহার বড় হয় না, তবু রাখতে হয়। কি জানি যদি সাহেব কোনো দিন এসে পড়ে। নয় ত নিজেরাই ব্যবহার করতুম। তিনপেয়ে ক্যাওড়া কাঠের তক্তপোষে আর কে বসতে চায়? আর আমাদের বিলাসই বা কি? আমাদের ঘরের চেয়ে ষ্টেশনের গুদাম-ঘরও ঢের ভাল। আর দিন কাটে যেখানে, সেই ঘরটী ষ্টেশন মাষ্টারের অফিস্, তারঘর, টিকিটঘর—সবকিছু।

সন্ধ্যের আগে প্যাসেঞ্জারের যাওয়া-আসা চুকে যায়। বাকী থাকে একটী মালগাড়ী। মাষ্টার মশায় ত সন্ধ্যা হ'লেই তাঁর 'কোয়াটারে' গিয়ে ওঠেন। আমি বসে থাকি তখন মালগাড়ী 'পাস্' করাবার জন্যে। মাঝে মাঝে হাঁকি—খুদুয়া!

খুদুয়া হচ্ছে 'হেড কুলী'।

টেলিগ্রাফের রিসিভার টরে-টক্কা বকে চলে।

আমার বিরক্তি আসে। সেই দুপুর-রাত পর্য্যন্ত ঠায় বসে থাকতে হবে।

কাজ গুছিয়ে রাখি। কেবিনে টেলিফোন করি—হ্যাঁ,—দু'শ-দশ আপ সিগনাল ডাউন্—হা-দু'শ দশ-লাইন ক্লিয়ার দেও। খুদুয়াকে ধমকাই। যাও কেবিন-কুলীকো বোলাও।

সব ঠিক ক'রে শুয়ে পড়ি। কিন্তু ঘুম আসে না। প্লাটফরমের আলোর তেল দিয়ে আলো জ্বালিয়ে বই পড়ি।

ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। শুয়ে থাকি, বিছানা ছেড়ে উঠতে চাই না।

সকালটা প্রায় ছুটী। কোনও গাড়ী যায় না। ষ্টেশন মাষ্টার অফিসে বসে কাজ কর্ম্ম করেন।

একদিন ভাবলুম—গাঁয়ে ঘুরে আসি।

গাঁয়ের দৈনিক জীবন-যাত্রা বেশীক্ষণ সুরু হয় নি। দরজার গোড়ায় জল-ছড়ার দাগ তখনও শুকিয়ে অস্পষ্ট হয়ে যায় নি। সদ্য-লেপা মাটীর গন্ধে ভারী বাতাস মন্থর হ'য়ে পড়েছে। একটা স্থির প্রশান্তি সারা গ্রাম ছেয়ে আছে।

আমার চমক ভেঙে কানে এল—মা, রেলের বাবু।

দেখলুম একটা বাড়ীর জানালায় একটী ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একটা তর্জ্জন শুনলুম—চুপ কর খোকা, ও কথা বলতে নেই।

চোখে পড়ল খালি একটী ঘোমটার চওড়া পাড়।

মনটা ভারী খুশী হ'য়ে উঠল। উষার আলো পেলে ভোরের পাখী ডাক দিয়ে ওঠে জানি; কিন্তু চাঁদের আলোতেও ভ্রম হতে পারে!

বেশ সোজা হ'য়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ফিরে এলুম। ঠোঁটের আগে আপনা থেকেই শিস্ বার হ'য়ে এল। অকারণে হিসাবের খাতা নিতে টেবিলটার ওপর দশটা আঙুল হারমনিয়মের চাবি টিপে গেল। মনের খুশীতে কাজ আরম্ভ করলুম। বহুদিনের বিস্মৃত দু'চরণ কবিতা মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগ্‌ল।

পরের দিন পথে যেতে দেখি খোকা সেই জানালাটীতে উদল গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু না ভেবেই জিজ্ঞেস করলুম—কি খোকা, তোমার নাম কি?

খোকা আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। হয় ত আমার কথা বুঝতেই পারে নি। ছেলেমানুষ। নামের কি দরকার। খোকাই ত খুব আদরের নাম। ওর মাও যেন ওই নামেই সেদিন ডেকেছিল। বললুম—তুমি খালি গায়ে কেন? একটা জামা পরে এস;—পরে কোথায় আসবে? আমার কাছে?—ওটা কথায় মাত্রা।

দু'খানি হাত দেখা গেল, খোকাকে আকর্ষণ করছে। হাতে দু'গাছি সরু রুলী, একটী নোয়া।

খোকা জানালা ছেড়ে যেতে চায় না।

আমি পথ-চলা সুরু করে দিলুম।

ফিরে এসে আমার ঘরের জানালা খুলে দিতেই প্রথমেই আমার চোখে পড়ল—সেই জানালাটীতে খোকা একটা জামা প'রে দাঁড়িয়ে আছে।

ভারি তৃপ্তি পেলুম।

এই জানালাটী আমায় আকর্ষণ করতে থাকে। আমার অনবসর সময়েও এই টিকিট-ঘরের কাউণ্টারের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখি। অবসর হলে আমি ঐ দিকটাতে ঘুরে আসি।

কেন? কারণ কখনও খুঁজে দেখি নি। খোকাকে সে দিন একটা ফুলের তোড়া দিয়েছিলাম। দেখি সেই তোড়াটী একটী ছোট তেপায়ার ওপর একটী কাঁচের গ্লাসের মধ্যে যত্নে রাখা।

সে দিন থেকে ষ্টেশনের কম্পাউণ্ডের ফুলগাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে নিজের হাতে তোড়া বেঁধে খোকাকে দিতাম।

বড় ভাল লাগত। আশা, যদি কোনো দিন এর একটী খ'সে পড়া ফুল তার চুলের গোছার পরশ পায়। চোখে কিন্তু কখনও পড়ে নি।

খোকা আমাকে দেখে বড় খুশী হয়। জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে সে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

আমার মনে হয়, এ হাতছানি যেন আনন্দ-লোকের বাণী বহন করে নিয়ে আসে। আমি তাড়াতাড়ি পা ফেলে তার কাছে গিয়ে বলি—খোকা, আমার কাছে এস না।

খোকা ঘাড় নাড়ে, আমার নাগালের বাইরে যাবার ছল করে জানালা থেকে সরে দাঁড়ায়; বলে—যাব না।

আমি হাসি। এ কী না-ধরা খেলা! এতে ত আর জোর চলে না।

বলি—পুতুল দেব।

খোকা বলে—কই পুতুল?

পকেট থেকে বাতিল হওয়া টিকিট বার করে দিয়ে ভুলোই। মনে লজ্জা পাই। প্রতিজ্ঞা করি, পুতুল দেখলেই কিনব। কিন্তু কি পোড়া দেশ, পুতুল মেলে না। কলকাতায় যে চেনা লোক যায়, তাকে বলি—কলকাতা থেকে ফিরে আসবার সময় কিছু কাঁচের পুতুল কিনে এনো ত।

তারা বোঝে না। হেসে ওঠে। বলে—তোমার আবার পুতুলের দরকার কি?

কথায় কান দেয় না।

দরকার যে কি, তা এদের কেমন করে বলি। আর ঠিক দরকার যে কী তাই যে অনেক সময় আমি নিজেই বুঝি না। তবু কেন এই প্রচেষ্টা?

তবু নিজেই পুতুল কিনে আমার ঘরে সাজিয়ে রাখি। তার থেকে পুতুল নিয়ে খোকাকে দিয়ে আসি।

বলি—এইবার এস।

খোকা বলে—কাপড় পরে' জামা পরে' মামার বাড়ী যাব।

আর আমার কাছে আসবে না?

খোকা আমার কাছে একবার ছুটে আসে। কিন্তু দাঁড়ায় না। তখনি মা'র কাছে পালিয়ে যায়।

আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকি। খোকা তার মা'র কাছে দাঁড়িয়ে হাসে। কিন্তু আসে না।

বেশ খেলা।

রোজই চলে। পরের দিন এসে ডাক দিই। খোকার মা তখন তাদের ঘর নিকোতে ব্যস্ত। খোকা তার ঘাড়ে পড়ে দুরন্তপনা করছে। ডাক দিলাম—খোকা, বেড়াতে যাবে?

পিঠটা নাড়া দিয়ে খোকার মা বললে—যা খোকা, বেড়িয়ে আয়।

তার গলার শব্দে আমি যেন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সুর খুঁজে পাচ্ছিলাম। কিন্তু শুধু কি তাই?

খোকা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল! তার মা হাতের কাজ ফেলে খোকাকে এগিয়ে দিয়ে গেল। বললে—যাঃ—

তাইতেই খুশী।

খোকাকে নিয়ে খানিকটা ঘুরে এলাম। খোকার টোবা টোবা দুই গাল চুমোয় ভরিয়ে দিলাম!

খোকা বললে—তুমি কি মা?

বুঝলুম তার মাও এমনি করে তার গালে চুমো খায়।

আমার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত যেন স্পন্দিত হ'য়ে উঠল।

মন বড় দোলে; এ দোলা যেন থামাতে পারি না। খোকাকে তাদের বাড়ী আবার পৌঁছে দিয়ে আসি। খোকা তাদের দরজার কাছে এসে ছুটতে ছুটতে তার মা'র কাছে চলে যায়।

দূর থেকে মনে হয় তার মা যেন খোকার জন্যে জানালার ধারে অপেক্ষা করছে। মনে একটু আত্মগ্লানি আসে—বেশী দেরী করে কি মায়ের মনে উদ্বেগ জাগিয়ে তুললাম? কাপড়ের সাদা জমি ঘরের অন্ধকারে আলেয়ার আলোর মতো চোখে পড়ে। কিন্তু কাছে এসে দেখি, জানালায় কেউ নেই। তৃষা মেটে না।

মা ও খোকার অস্পষ্ট গুঞ্জন কানে আসে।

আবার ফিরে আসি আমার নিজের কুঠুরীর মধ্যে। তারপর ষ্টেশনে গিয়ে দিনের লেনা-দেনা সুরু করে দি।

হেঁকে বলি—খুদুয়া, ঘণ্টি লাগাও।

প্যাসেঞ্জারের সময় হয়ে এল।

টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আগের ষ্টেশনের খবর নিই।

দূরে ট্রেণের কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে খুদুয়া প্লাটফরমের যাত্রীদের সাবধান করে দিতে থাকে।

টিকিট দেওয়া থামিয়ে, কোট টুপী চড়িয়ে ছুটি প্যাসেঞ্জার 'পাস' করাতে।

তখনকার মতো প্লাটফরমে লোক সমাগম হয়েছে। তাদের মধ্যে দেখি খোকা চলেছে এক বৃদ্ধের সঙ্গে, পিছনে খোকার মা, যেন একটী কাপড়ের সচল পুঁটুলি। শুধু পায়ের দুটী পাতা দেখা যাচ্ছে—লাল আলতার দাগে রাঙা। সেই পরিচিত নিরলঙ্কৃত হাত দু টীতে আজ দু'গাছি রুলির ওপর চিকণ চুড়ী চিক্ চিক্ করছে। সে হাত দিয়ে বৃদ্ধের কোটের পকেট ধরে আছে। মুখের ওপর একহাত ঘোমটা।

এই ঘোমটার আড়াল ভেদ করে হয় ত তার দৃষ্টি চলে; কিন্তু অপরের দৃষ্টি সে ঘোমটার আড়াল ভেদ করতে পারে না।

ভাবি এ আমার অন্যায়। কেন আমার মনে এমন ধারণা হয়? কিসে? কোন সঙ্কেতই ত আজও পর্য্যন্ত ধরতে পারি নি! মনকে বোঝাই—আকাশে ঈথারের স্পন্দন ত চিরকালই চলে, যে অভিজ্ঞ, সে-ই ধরতে পারে; আমি অনভিজ্ঞ। তাই বুঝি।

মনে মনে কল্পনায় খুশী হই। ভাবি—এই কল্যাণী, এই রহস্যময়ী কি চিরকালই আমার অজানা হ'য়ে থাকবে।

মন সান্ত্বনা পায় না।

যাবার সময় খোকাকে যে কটী প্রশ্ন করেছিলুম, তাই নিয়ে আমার অবসর সময়ে নাড়াচাড়া করি।—কোথায় যাচ্ছ?

মামার বাড়ী।

কবে আসবে?

কাল।

এই পর্য্যন্ত ভেবে খুশী হই। মনকে আশ্বস্ত করি। ভেবেছিলুম আরও দু' একটী কথা জিজ্ঞেস করব। কিন্তু করা হয় নি। কি কথা বলি ভাবছিলাম। কিন্তু সময় হয়ে গিয়েছিল। ট্রেণ সময়কে শ্রদ্ধা করে। চলে গেল। মানুষের চিন্তা পড়ে থাক, সে তার তোয়াক্কা রাখে না।

কিন্তু খোকা তার নির্দ্দিষ্ট কালে আসে না।

মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কিছু ভাল লাগে না।

টিকিট-ঘরের খাপরা অসহ্য বোধ হয়। জানালার দিকে চাইতে পারি না, আবার না চেয়েও পারি না। নিজের ওপর নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠি। 'ট্রাফিক'-বুকের ঠিকে ভুল হয়! কেটে আবার তার পাশে নিজের নাম দস্তখত করি।

কাল চলে যায়।

এই একলা জীবন আর যেন ভাল লাগে না। অথচ এতদিন ত বেশ কাটিয়ে এসেছি।

কাগজ কলম নিয়ে বসলুম। চিঠি লিখব! কাকেই বা লিখি। বন্ধুবান্ধব? নেই যে তা নয়, কিন্তু তাদের যেন চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে না। এমন জনকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয় যে আমার প্রিয়—

চিঠি লেখা হল না! কলম নিয়ে বসাই সার।

আজ যেন বুঝতে পারলুম, দেবতা কেন আদিম নর সৃষ্টি করে তার পরক্ষণেই নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন।

মনে নানা কুতর্কের সৃষ্টি হল। ধমকে বললুম—এ সব কি?

উত্তর এল—নয় ত দিন কাটে কি করে?

বললুম—এতদিন কি করে কেটেছিল?

তার জবাব নেই।

বন্ধুর চিঠি পেলুম। আমার এখানে বেড়াতে আসছেন। ভাবলুম—দেখি যদি সময় কাটে।

সকালের প্যাসেঞ্জারে বন্ধুরা এসে পড়লেন। কিন্তু যাদের আশা করি তারা ফিরল না।

বন্ধুদের বললুম, ডিউটী সারি, পরে কথা কইব।

আশা, যদি ভিড়ের মধ্যে না দেখে থাকি ত টিকিট নিতে নিতেও দেখা পেতে পারি।

টিকিট দিয়ে সবাই চলে গেল। কাজ শেষ।

আশায় নিরাশ হই। মনটা মুষড়ে পড়ে। কিন্তু সে ভাবকে রুদ্ধ করে মুখে হাসি টেনে এনে বন্ধুকে বলি—তারপর কি মনে করে?

বন্ধু ত অবাক। জিজ্ঞেস করলে—চিঠি পাও নি?

ঘাড় নাড়লুম। কিন্তু তবু—

বেড়াতে এলুম। জায়গা কেমন?

ভাল।

শীকার পাওয়া যায়?

বন্ধুদের হাতে বন্দুক। শীকার মানে পাখী।

বললুম—আছে।

বন্ধুরা সোৎসাহে বল্লেন—বেড়ে হবে। চল, বার হ'য়ে পড়ি।

আমাকেও বন্দুক নিয়ে এদের সঙ্গে বার হতে হল।

এ খেলা এখানে নতুন। গ্রামের লোকে বিস্ময়ে ও আশঙ্কায় চকিত হয়ে উঠল। গাছের পাখী তাদের অনভ্যস্ত শব্দে স্তম্ভিত। আকাশে উড়তে তারা ভয় পেয়ে গাছের শাখায় স্থির হয়ে বসে। অব্যর্থ মৃত্যুশরের সন্ধানে তারা মাটীতে লুটিয়ে পড়তে থাকে।

আমাদের ঝুলি ক্রমশ পূর্ণ হ'য়ে এল।

দিনের আলোর চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে প্রায় অদৃশ্য হয়ে এল। আমাদের উন্মাদনার শান্তি হল।

আনন্দের উত্তেজনায় কতটা ঘুরেছি তার স্থির ছিল না। তাই ফিরতে শ্রান্তি বোধ করলুম। একটা পুকুর পাড়ে এসে একটু বসে জিরোবো স্থির করলুম।

যে পুকুরের পাড়ে বসেছিলুম, তার ওপারে খোকাদের বাড়ী।

বন্দুক আর তার পাশে মরা পাখীর ঝাঁক। বস্তাটা বেশ বড় হয়েছে।

মনে হল—এখন যদি কেউ দেখে, এই বিজয়ীকে! বুকটা গর্ব্বে ফুলে উঠল।

খোকাদের জানালা খোলা। সেদিকে চোখ পড়ল। জানি তারা নেই তবু মনে হল যেন তারা ফিরে এসেছে, নইলে জানালা খোলা কেন? একটু ভাল করে দেখবার জন্যে পুকুরের ঘাটের দিকে অগ্রসর হলুম।

বন্ধু বল্ল—কি রে, জল খাবি নাকি?

না ভেবেই উত্তর দিলুম—হ্যাঁ।

খেপেছিস, এত রোদ্দুরে ঘুরে শেষে এইখানে জল খাবি? মরবি যে। তেষ্টা পেয়ে থাকে এই নে।

তারা মদের ফ্লাস্ক্ নিয়ে এগিয়ে এল। অগত্যা হাতে করে নিলাম।

জানালাটা যেন শব্দ করে বন্ধ হল। দিনশেষের আলো-আঁধারে ভাল বোঝা গেল না।

আমি অকারণে চমকে উঠলুম। মনে হল যেন ভাল করলুম না। কিন্তু কি?

ঘরে ফিরে পাখীর মাংস নিয়ে উৎসব লেগে গেল। ওস্তাদ বন্ধুরা রান্নার যোগাড় করলে। হল্লায় হল্লোড়ে রাত কেটে গেল।

বন্ধুরা তার পর দিন ফিরে গেল।

আবার দারুণ অবসাদ। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না।

হঠাৎ মনে হল, খোকারা কি ফিরে আসে নি?

মনে পড়ল—পরশু সন্ধ্যায় যেন তাদের জানালা খোলা দেখেছি। সেই যখন শীকার করে ফিরি।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম।

দূর থেকে দেখলুম, খোকা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি তাড়াতাড়ি পা ফেলে তাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গিয়ে হাঁকলুম—কি খোকা, কবে এলে?

খোকা আমাকে দেখে খুশীতে যেন নেচে উঠল। কিন্তু তার মা তাকে সবলে আকর্ষণ করে সেখান হতে নামিয়ে নিলে।

চোখে পড়ল—দৃঢ় দুখানি হাত, মুখের আধখানি আর সেই চোখের এক তীব্র দৃষ্টি ঘোমটার ফাঁকে বাইরে এসে পড়েছিল।

কানে এল একটা চাপা গর্জ্জন—না, ওর কাছে যায় না। ও মাতাল, ছেলেধরা, ভারী বদ লোক।

জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল।

আমার মনে হ'ল' শুধু মুহূর্ত্তের জন্য সূর্য্যটাকে কে যেন টপ্ করে গিলে ফেল্লে।

তার পর নিজেকে একটা ঝাঁকি দিয়ে পা চালিয়ে ফিরে এলুম।

আমার ঘরে ঢুকব, ষ্টেশন মাষ্টারের ডাক কানে এল। ওহে ফকির—

তাঁর কাছে যেতে তিনি একটা চিঠি দিলেন—দেখি আমার বদলির খবর।

মনে হল— যেন বেঁচে গেলুম।

এতক্ষণে যেন সহজ ভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে পারলুম।

তোমরা চলিয়া গেছ

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

তোমরা চলিয়া গেছ, রেখে গেছ স্মৃতি;
কত সুখ, কত না দুখের,
কত হাসি মধুর মুখের,
আধলেখা-লিপি, যাহে লেখ নাই, 'ইতি'।
ছড়ায়ে পড়িয়া চারি ধারে,
ব্যথা দেয় বুকে, আঁখি ভরে' বারি ধারে!
তোমরা ফেলিয়া গেছ, সে যে কত দিন!
একা আমি, চলিয়াছি পথে,
গতি আর নাই মনোরথে,
পথপাশে পড়ে থাকা, একেবারে দীন

দারুমূর্ত্তি রথের মতন,
চালক বাহক গেছে, সব আয়োজন,
নাই রশারশি, হায় নাই সেই হাত
আগে যে টানিয়া লয় ফেলিয়া পশ্চাৎ!
গেছ চলে, তবে আমি কেন থাকি আর?
একখানি ছিঁড়ে-ফেলা রাখী,
হিসাবের আছিল যা বাকী
শোধ হল, শুনি বাণী নিরালা হিয়ার!
চোখের দু'ফোঁটা শুধু জল
নিয়ে যাব, ফিরে দিয়ে হাসিটি উজল!

শিবানী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
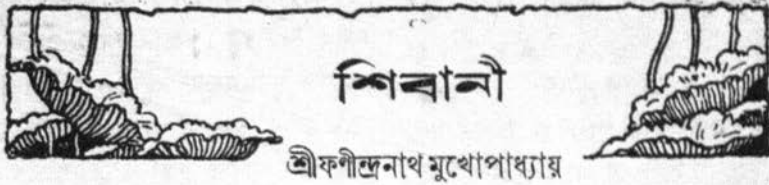
শিবানী যখন ভূমিষ্ঠ হল, তখন তার আগমন বার্ত্তা শঙ্খ উলু দিয়ে কেউ ঘোষণা করে নি! গরীব গৃহস্থের ঘরে মেয়ের পিঠে মেয়ে হলে কেউ আনন্দ করে না। কাজেই তার বেলাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। কেবল তার মা একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—মেয়ে হয়েছে। তার পরেই তিনি মেয়ের মুখে চুমু খেয়ে বুকভরা তৃপ্তি অনুভব করলেন, আর তাঁর স্বামী অপ্রসন্ন মুখে ছেলে না হওয়ায় আপশোষ করলেন।

মেয়ের নাম হল শিবানী। অন্নপ্রাশন তার হয় নি। সুখে দুঃখে যখন সে চার বছরের হল, তখনি শিবানীর সংসারের কাজে সাহায্য করা সুরু হল। তার পিঠোপিঠি একবছরের ছোট ভাইটিকে, দু' বছরের ছোট বোনটিকে কোলে কাঁখে করে বয়ে বেড়ান, তাদের কান্না সুরু হলে বকুনি খাওয়া, সময়ে সময়ে চড়টা চাপড়টা বখশিস্ পাওয়া এই ছিল তার বিলাসলীলা, সামান্য ত্রুটিতে ধেড়ে মেয়ে বলে তিরস্কার পাওয়া, আয়ত চোখ, তপ্ত-কাঞ্চন রং, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ না নিয়ে আসায় অপরাধী হওয়া, আর তার শ্রী ছাঁদের নিন্দা সহ্য করা, এই গুলোই ছিল তার নিত্যকার পাওনা।

তার পরে যখন সে আট বছরের হল, তখন তার ভাই বোনের সংখ্যা বেড়ে গেল, তার খাটুনিও বাড়ল বেশী; কাজে অকাজে কথায় কথায়, তিরস্কারের পাওনার হল ছড়াছড়ি। তার ভাইয়ের বর্ণ-পরিচয়ের ছবি দেখে ফেলে অনধিকারী বলে চড় খেল, ছবির প্রলোভনে 'পড়তে চাওয়ায় বাবুগিরির প্রশ্রয় পাবে না শুনল, অসাবধানে বাসন ফেলে দিয়ে খেল মার। পান তৈরি করতে গিয়ে জাঁতিতে হাত কাটায় অকর্ম্মণ্য হল, ভাতের ফেন গালতে গিয়ে পা পুড়িয়ে ফেলায় তার জলুনির উপর অসাবধানতার অপরাধে প্রহার লাভ করল, ভাতের সরা ভেঙে ফেলে থাকতে হল অনাহারে।

এগার বছর পার হলে রূপের খোঁটা খাওয়া হল তার প্রতিদিনের প্রাপ্য, মায়ের চোখের জল আর অদৃষ্টবাদ হল তার সান্ত্বনা, বাপ ও খুড়া জ্যেঠার তাড়না হল তার অঙ্গ-ভূষণ। ভোরে চারটায় উঠে ধান সিদ্ধ করে শুখাতে দেওয়া, শুখালে সে গুলোকে ভেনে চাল করা, আর বাঁশবাগান থেকে কাঠ কুড়িয়ে জ্বাল দিয়ে ভাত রান্না, পরে বকুনি খেয়ে বাসন কোসন মেজে শুয়ে পড়া, এই তার দিনলিপি।

এই রকমভাবে মা-বাপের গালি খেয়ে আর উদ্বেগ বাড়িয়ে সে যখন পনেরয় পড়ল, তখন তার বাবা তার জন্যে তাদের টনটনে কুল ভেঙ্গে বংশজে মেয়ের বিয়ে দিতে বাধ্য হবেন শুনে সে চোখের জলে বুকের আগুন নিভাতে চেষ্টা করল। অনির্ব্বান আগুন আপাতত জল পেয়ে ধোঁয়াতে সুরু করল। সে ভাবল—'ভগবান আমায় নাও, মা-বাপের জ্বালা, পাড়া-পড়শীর গ্লানি,—আমার কি মরণ নেই?'

এখন সংসারের কাজে সে সুপটু, পরিশ্রমে অদ্বিতীয়, দূর পুকুর থেকে কলসী করে জল আনায় সুদক্ষ। সে এখন বুঝতে শিখল—পড়াশুনা তাদের পক্ষে অনাবশ্যক পাপ, হাসি আনন্দ সুদুর্ল্লভ অতিথি, অভাবের সঙ্গে যুদ্ধই একমাত্র

লক্ষ্য ও সত্য। এখন অন্য ত্রুটি না থাকলেও, সে কোথা দিয়ে অসাবধানে চুল খুলে যাচ্ছিল, কোন লোক তাকে দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে, পুকুরের জলে সে অনাবশ্যক পাঁচ মিনিট দেরী করেছে, এ সবের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ তার ছিলই।

অতি সাবধান হতে গিয়ে সেমিজ চেয়ে সে জান্‌ল—ওটা বিলাস ব্যসন, ভাত খেতে গিয়ে জানল এ কর্জ্জের ধান, বুড়ো স্বামীর হাতে পড়তে পাওয়াও সে শুন্‌ল—সৌভাগ্য।

অবশেষে ষোড়শী হলে সে পঁয়ষট্টি বছরের স্বামীর তৃতীয় পক্ষ হয়ে মা বাপকে নির্ভাবনা করল, সতী সাবিত্রী হওয়ার জন্য তাগিদ ও আশীর্ব্বাদ পেল; টিনের পুরানবাক্সে দুখানা কাপড় নিয়ে সে চলল—শ্বশুরবাড়ী। যাত্রার সময়ে মা'র হাত ধরে ডুকরে কাঁদল, বাবার দিকে চাইতে পারল না, চোখের জলে ঝাপ্সা দৃষ্টি নিয়ে সে গোরুর গাড়ীতে উঠ্‌ল— পিতৃ-জ্যেষ্ঠ স্বামীর সঙ্গে।

শ্বশুরবাড়ী গিয়েও খাটুনী হল বাপের বাড়ীর মতই। বড় বড় সতীনপোদের থায় গালাগালি, ছোটদের নিয়ে খাইয়ে মুছিয়ে কোন রকমে কাটায় দিন। রাতে স্বামীর কাশী বৃদ্ধি হলে করে বাতাস আর না হয় দেয় সেঁক, তামাকের গুল আর কাশ-মিশ্রিত ছাই পরিষ্কার করে আর বুড়োর রোগের ফাঁকে ফাঁকে আদর লাভ করে হয়ে যায় ধন্য। মাতৃত্বের ক্ষুধা হলে সেটা চাপা দেয় অতগুলো জোয়ান ছেলে থাকার যন্ত্রণার মধ্যে, ছেলেমাত্রেই অভিশাপ হয় তার হল ধারণা, অকালে পেকে গিয়ে মনে মনে হল বুড়ী, আর দেহে হল শীর্ণ।

এর পরে স্বামীকে নিয়ে সে যমের সঙ্গে টানাটানি করল, রাতের পর রাত জাগল, তার সিঁথীর সিঁদুর বজায় রাখার জন্য ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করল, সওয়া পাঁচ আনার হরির লুট মানত করল, শেষে একদিন স্নান করে, হাতের নোয়া খুলে শাঁখা ভেঙে, সিঁথীর সিঁদুর মুছে, আঠার বছরে হল বিধবা।

ছেলেরা বল্‌ল—ডাইনী বুড়ী, রাক্ষসী, আমাদের বাবাকে খেয়ে ফেলেছে। সেও ভাবল—হবেও বা—তার কপালেই স্বামী টিঁকল না।

সে এখন আর চোখের জলও ফেলতে পারে না। ভিতরের জল তার লাঞ্ছনা গ্লানির তাপে শুকিয়ে তাকে করে ফেল্‌ল—মরুভূমি!

বাপের বাড়ী এসে সে কান্নাকাটি শুনল, নিজে কাঁদল না অর্থাৎ টপটপিয়ে অশ্রু ফেলতে পারল না দেখে পাড়ার লোকের সমালোচনা শুনল—সে অসতী, অলক্ষ্মী। কোন্ মেয়ে কোন্ আশীবছরের বুড়ো স্বামীর হাতে পড়ে, পনের বছর ধরে আয়তি রক্ষা ক'রে স্বামীর আগে ম'রে অক্ষয় কীর্ত্তি আর অনন্ত সুখ লাভ করেছে, তার ইতিহাস শুনল, আর একাদশীর বুকজ্বালান তৃষ্ণার দিনে, মা বা ভাই-বোন খুড়া খুড়ীকে রেঁধে পরিতোষ করে খাইয়ে অবেলায় স্নান করে জ্বর নিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

তার পরদিন সকালে উঠতে না পাওয়ায়, বিধবার রোগ থাকতে নেই, এই নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কাজে কর্ম্মে মন দিল।

এই রকমে শিবানী আঠার বছর বয়স থেকে ত্রিশ বছর পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিল। এই দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে কতবার সে কুচরিত্রা হওয়ার সম্ভাবনা বিষয়ে সতর্কতার বাণী শুনল, তারই বোনেদের তারই মত বিয়েতে সব খাটাখাটুনি ক'রে বিয়ের মাঙ্গলিক দ্রব্যে হাত দিতে বা তার কাছে থাকতে বাধা পেল ও শেষে অন্যের বিয়েতে নিজেই তার মত অনভিজ্ঞ নূতন বিধবাকে এ বিষয়ে নিষেধ ক'রে তার অভিজ্ঞতার আনন্দে পুলকিত হ'ল।

শেষে তার মা বাপ মারা গেলে সংসারের লাঞ্ছনার মধ্যেও তার যেটুকু কর্ত্তৃত্বের ভাব ছিল, সেটুকুও লোপ পেলে সে অতিষ্ঠ হয়ে একবার বল্‌ল—'ভগবান, আর ত সয় না'। শেষে আবার আশে পাশে তাকিয়ে তারই মত বিধবাদের অবস্থা দেখে ভাবল—এইটেই নিয়ম। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলে না, চলা উচিত নয়। তার পাপ মন, তাই বিদ্রোহের ভাব আসে। সে নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করে ভগবানের কাছে মাপ চাইল।

শেষে ধর্ম্মকর্ম্মের নেশায় পুণ্যসঞ্চয়ের দিকে তার ঝোঁক হল, ভাইয়ের কাছে দশহরার যোগে গঙ্গাস্নান করতে যাওয়ার জন্য টাকা চেয়ে বকুনি খেয়ে শান্ত হল ও শেষে

তাদের মত ক'জনে পায়ে হেঁটে তীর্থ করতে চলেছে শুনে ভায়ের অনুমতি ভাল করে না পেয়েই তাদের দলে মিশে পড়ল।

তীর্থ সেরে ফিরে এসে দেখল—ঘরের দোর তার কাছে রুদ্ধ। সে অসতী, সে কলঙ্কিণী, সে বংশের মানমর্য্যাদা হরণকারিণী। সে অকূল পাথারে কূল পেল না।

দুদিন উপবাসী থেকে বুঝিবা প্রায়শ্চিত্ত করে যখন সে ঘরে স্থান পেল, তখন ভাই-বউ এসে শুনিয়ে দিলেন—শুধু তাঁর অনুগ্রহেই সে ঘরে স্থান পেয়েছে, সেটা যেন তার মনে থাকে। আর এখন ছলা করে শুয়ে না থেকে এঁটো বাসনগুলো এখনই সে মেজে ফেলুক, নইলে কেউ খেতে পারছে না।'

অবশেষে একদিন সে দেহ-কারাগার থেকে মুক্তি পেল। মৃত্যুর সময়ে ভগবানের কাছে পাপ ক্ষয়ের প্রার্থনা করার চেষ্টা সত্বেও আকুল প্রার্থনাপূর্ণ আবেগে তার মুখ দিয়ে বেরুল—ভগবান, স্ত্রী-জন্ম আর দিও না। যদি দাও এ দেশে নয়।

তারপরে পাড়ার অকেজোর দল শ্মশানে শিবানীর চিতায় অগ্নিসংযোগ করলে, পল্লীবৃদ্ধ সুর করে ব'ললেন—

'পুড়বে নারী উড়বে ছাই,
তবেই নারীর গুণ গাই।'

অগ্নি

শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(ইংরাজী হইতে অনূদিত—শ্রীতারাকুমার চট্টোপাধ্যায়)

"কোন জন তুমি ?" অগ্নিরে জিজ্ঞাসে শিশু।
নৃত্যপর অগ্নি মেলি,' রক্তিম মত্ততা
গ্রাস করিয়াছে তার মৃতা জননী রে ;—
প্রকাশিয়া জীবনের নিঃসঙ্গ নগ্নতা।

তার পরে অকস্মাৎ অন্ধকার ভেদি,'
উত্তর করিল অগ্নি তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে,—
"আমি সেই ভয়ঙ্কর কাম ; যেইজন
গঠন করিল তোরে জননী জঠরে।"

পতি

শ্রীঅমলেন্দু বসু

কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুমুতে পারি নি। পাশের খোলার বাড়ীর ছোটো বৌ-টি গুম্‌রে কাঁদ্‌ছিল,—তার অশ্রু-ভেজা কান্নার রেশ আমার ঘরের বন্ধ দরজায় এসে আছাড় খেয়ে পড়্‌ছিল।

সেই কোন্ ভোর থেকে সে কাজ করতে শুরু করে। আঁধারের বুক-চেরা আলোর লোহিত রেখা তখনো ফুটে' ওঠে নি – মুসলমান পাড়ার ঝুঁটি-বাঁধা মোরগগুলো তখনো ডাক্‌তে শুরু করে নি।

আজ চারমাস ধরে' এসেছে ওরা এখানে। নিত্যই দেখ্‌ছি পরিবর্ত্তনহীন জীবন-যাত্রার একই নিষ্প্রভ রূপ। দেখ্‌ছি—নিরলস দীর্ঘ দিনমানের খাটুনি যতক্ষণ থাকে, ততটুকু সময় বোধ করি সে ভালো থাকে!– তারপর সন্ধ্যার পর থেকে মাঝে মাঝে চাপা কান্নার আওয়াজ বাতাসের পিছু ভেসে আসে! কিন্তু কাল সে কাঁদ্‌ছিল বড্ড জোরে।

মেয়েটির বয়স কত হবে? সেজ্‌দি বল্ল, এগারো বছর। তার অনুজ্জ্বল মুখটির অনবগুণ্ঠিত ক্লান্তিটুক আমার বেশ লাগে। ভাবি, যে বয়সে অন্য মেয়েরা পুতুল খেলা করে, সে বয়সেই তাকে সত্যিকারের পুতুলের অসহ চাপ সইতে হয়েছে; এগারো বছর বয়সেই সে চিনেছে, এই আলোহাসিময়ী অবনীর কোণে কত কলুষ নিরন্তর লুকিয়ে আছে। আলোর ঝরণা থেকে যে এই মেয়েটি বঞ্চিত, সে কার দোষ?

ওর স্বামী কাজ করে নদীর ওপারে একটা পাটের কলে। সারাদিন ঘরে থাকে না, কিন্তু সন্ধ্যার পর হ'তেই নিজের ঘরে একচ্ছত্র অধিপতি হ'য়ে অসহায়া বালিকা স্ত্রীর ওপরে দিনের উপার্জ্জিত গ্লানির শোধ নিতে থাকে।

সেদিন বুঝি তার ছুটি ছিল। সকাল বেলা বিছানায় শুয়ে হাঁক্‌ল, এই তামাক দিয়ে যা।

বৌ-টি ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি উনোন্ থেকে নাবিয়ে এসে স্বামী-দেবতার হুকুম তামিল করল। সেদিন ভাত শক্ত ছিল। ফলে, বেলা এগারোটা থেকে রাত ন'টা পর্য্যন্ত তাকে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাক্‌তে হয়েছিল।

প্রভাত আর আমি একসঙ্গে স্কুলে পড়েছিলুম। সে এখন এক মার্‌চেণ্ট্ অফিসের বড়বাবু হয়েছে জানতুম, সেদিন জন্ এণ্ড্ কিংলী কোং-এর ছাপ মারা এক চিঠি আমার কাছে এসে উপস্থিত। খুলে' দেখ্‌লুম, প্রভাত— এই পাটের কলের হেডবাবু—আমাকে নিমন্ত্রণ কোরে পাঠিয়েছে।

আজ সকাল থেকেই মনটা ভারী ছিল, তাই প্রভাতের ওখানে চল্‌লুম।

দুদিন ধ'রে আছি প্রভাতের এখানে। বেশ ক্ষূর্ত্তিতেই দিন দুটো কেটেছে। সকাল বেলায় প্রভাতের কামরায় ঢুকে' দেখি একটা বড় হাতে-লেখা চিঠি নিয়ে সে কি ভাব্‌ছে। আমি ঢুক্‌তেই চাপরাশীকে বল্‌ল, কালাচান্

কো বোলাও। তারপর আমার পানে ফিরে' এই চিঠির কাহিনী বল্ল।

সুখন্ কাহার তেইশ বছরের যুবক। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে নিটোল তার কালো দেহ—তার মত ফূর্ত্তিবাজ ছোক্রা কুলি বস্তিতে আর কেউ নেই। আজ প্রায় আটমাস ধরে' সে সখিয়াকে বিয়ে করেছে।

কালাচান্ এই আফিসেরই তিন নম্বর গুদামের চালানদার, দিন পঁচিশেক ধরে' সে সখিয়ার সঙ্গে রসিকতা করতে শুরু করেছে। সখিয়াও দু একবার মুচ্‌কি হাসি হেসেছে বা দুটো জবাব দিয়েছে। পরশু সন্ধ্যার সময় সখিয়া যখন পাঁচ নম্বর গুদামের উঠোন পেরিয়ে চল্‌ছে তখন সুবিধে বুঝে' কালাচান্ তার সুমুখে দাঁড়ায় আর কি একটা কথা বলে। সখিয়া সাময়িক ভাবে উদ্ধার পাবার আশায় তাতে রাজী হ'য়ে চলে' যায়; কিন্তু পরে সুখন্‌কে ব'লে দেয়। জাত-কুলীর ছেলে সুখন্, অমি এক বাঁশের লাঠি নিয়ে গুদামের দিকে ছুট্‌ল। কালচান্‌কে অন্তত খাওয়ার জন্যও রাত্তিরে নিজের ঘরে যেতে হয়। সুতরাং সুখন্ সে রাতে আর কালাচানের নাগাল পেল না। এদিকে সখিয়া সুখন্‌কে অমন করে' ছুট্‌তে দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে সুখনের বাপ বুড়ো ভুলু সর্দ্দারকে সব কথা বলে। তখন সেই রাত্তিরে সর্দ্দার ঘরের বার হ'য়ে সুখন্‌কে ধরে' আনে। এখন বস্তির আর পাঁচজন বুড়োর পরামর্শে সুখন্ সাহেবের কাছে এক পিটিশন্ দিয়েছে। সাহেব সেটা ফাইল ক'রে "অনুসন্ধান ও যথাযোগ্য বিচারের" ভার প্রভাতের ওপর দিয়েছেন।

চাপরাশী ফিরে' এসে বল্‌ল, আজ দুদিন ধরে কালাচান্ কাজে আসে নি।

ভালো লাগ্‌ছিল না। সেদিনই সহরে ফিরে' এলুম, বিকেলে কালাচান্‌কে ডেকে পাঠালুম। সে এল, খুব একটা বিস্ময়পূর্ণ ভাব নিয়ে। তাকে আমি এর আগে আর দেখি নি, তবে তার সম্বন্ধে যা শুনেছিলুম, চেহারাতে সেটা পূরোপূরি সত্য বলে'ই প্রমাণিত হ'ল। অমন গাঁজাখোরের মত চেহারা আমি পূর্ব্বে দেখি নি।

জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কি জন্ এণ্ড্ কিংলীর গুদামে কাজ কর?

আজ্ঞে হাঁ।

তোমাদের বড়বাবু প্রভাত চাটুয্যে আমার বন্ধু; তা'র কাছে দুদিন আগে আমি গিয়েছিলুম। সেখানে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি। সব শুনে কাজ নেই, তবে তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে, সুখন্ কাহার তোমাকে সহজে ছাড়্‌ছে না; প্রভাতও হয় তো বা তোমাকে বরখাস্ত কোরে দেবে।

কালাচান্ আমার পা জড়িয়ে ধরে' কাঁদতে লাগ্‌ল। তার কান্নার শব্দে ভেতর থেকে আমার ভাই-পো মণ্টু পর্য্যন্ত দৌড়ে এল। কালাচান্ বল্‌লে, বাবু, আপ্‌নি আমায় রক্ষা করুন্। এ যাত্রা যা করেছি, এই আপ্‌নার সুমুখে নাকে খৎ দিচ্ছি, কোন্ মরদের বাচ্চা আর তা করে। বাবু, আপ্‌নি বল্‌লেই প্রভাত বাবু আমায় ছেড়ে দেবেন।

বললুম, তা কি করে' হয়? আমিই বা ওরকম অন্যায় অনুরোধ করতে যাবো কেন? তুমি সত্যি সত্যি যা করেছ তার একটা শাস্তি হওয়া দরকার।

লোক্‌টার কান্না আর থাম্‌ল না। চাকর এসে বল্‌ল, মা ডাক্‌ছেন।

ভেতরে গিয়ে দেখি বিষম ব্যাপার। মা, বৌ-দি, সেজ-দি সব চুপ্ কোরে দাঁড়িয়ে। যেতেই মা বল্‌লেন, হ্যাঁরে নীরু, তোর কি একটু আক্কেল-জ্ঞানও নেই? অতবড় একটা মানুষ তোর পা জড়িয়ে কাঁদছে, আর তুই তার একটু উপকারও করতে চাস্ না! ছিঃ! লেখাপড়া শিখে' কি দয়ামায়া সব হারিয়েছিস?

বললুম, না মা, দয়া থাক্‌বে না কেন? তবে, ন্যায়-বোধটাও থাকা দরকার। ও সত্যি অন্যায় করেছে, তার জন্য শাস্তি পাওয়াই তো উচিত। তা ছাড়া উপকার তো একটু নয়—করতে হলে অনেক খানিই করতে হয়! কিন্তু তাতে শুধু ওর বদ্‌খেয়ালের প্রশ্রয়ই হবে।

মা রেগে বলে' গেলেন হাঁ, তোদের যত সব বড়-বড় কথা। কর্ত্তব্য, অন্যায়, প্রশ্রয়—না বাপু, আমাদের বুড়ো বুদ্ধিতে এ রকম অন্যকে কষ্ট দিতে বলে না।

সেজ-দি আড়ালে ডেকে বল্লেন, নীরু, ওর চাকুরী গেলে বৌ-টার কি উপায় হবে ?

সত্যি, আমি তো এদিক ভেবে দেখি নি ! আধ-ঘোমটার আড়ালে একখানা মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল—নত-আঁখি, শান্ত বিষাদ-শ্রী মাখা। জগতের সব দুঃখ মিশিয়ে দিয়েছে কে যেন তার মুখে !

ফিরে এসে কালাচাঁদকে বল্লুম, ছাথ যা কোরেছ, তার চেয়ে অন্যায় হ'তে পারে না। তোমাকে সুখনের কাছে মাপ চাইতে হবে, আর পাঁচ নম্বর গুদামের ত্রিসীমানায় তুমি যেতে পারবে না। ভবিষ্যতে এ রকম কাজ যেন আর না হয়। আমি প্রভাতকে বল্‌ব'খন। শুধু বাড়ীর মেয়েদের কথায় আর তোমার বৌর কথা মনে ক'রে তোমায় এবার ছেড়ে দিলুম। কাল, পর্‌শু, তুমি কাজে যেয়ো না।

কালাচান্ চলে' গেল, আমাকে রাজা হবার আশীর্ব্বাদ কোরে।

সেদিন রাত্তিরে আর বৌটির কান্না শুন্‌তে পাই নি।

পরদিন আল্‌সেমি ক'রে আর প্রভাতের কাছে চিঠি পাঠাই নি। সন্ধ্যার পর থেকেই সর্দ্দি বোধ হচ্ছিল। রাত্তিরে ঘুম আস্‌ছিল না। তখন রাত সাড়ে বারোটা হবে। আমি জানালা দিয়ে দেখ্‌ছিলুম, বৌ-টি ঘর-বার কর্‌ছে। ভাব্‌লুম, 'হতভাগা কালাচাঁদ কি এখনো আসে নি ? ঘণ্টা খানেক পরে চীৎকার করে বৌ-টি কেঁদে উঠ্‌ল। যা শুন্‌লুম, সুরা-বিজড়িত কণ্ঠে কালাচাঁদ বল্‌ছে, তোর ওপরে নীরেন্ মিত্তিরের এত দরদ্ কেন রে ? বলি, রোজ দুপুরে আমি যখন ঘরে থাকি নে, তখন করিস্ কি ?

কিছুক্ষণ পরে খোলার বাড়ীর গোলমাল থেমে গেল। সারারাত আমার ভালো ঘুম হ'ল না—একটা দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম, যেন একটা কালো দৈত্যের মত জীব দুহাত দিয়ে আমার কণ্ঠরোধ কর্‌ছে।

—সকাল বেলা প্রভাতকে সব লিখে' দিলুম—তুমি যদি কালাচাঁদের ব্যবস্থা এখনো না কর্‌রে' থাকো, তবে চিঠি পাওয়া মাত্র তাকে বরখাস্ত কোরো—এই অনুরোধ। ওর মত হতচ্ছাড়া এ সংসারে আর নেই, তা তুমি বুঝ্‌তেই পারছো।

কালাচাঁদ জান্‌তে পেরেছিল যে, আমি তার সুপারিশ করি নি। দুপুর বেলা দেখ্‌লুম, সে গোরুর গাড়ীতে ঘরের ভাঙা মালপত্র নিয়ে উঠে যাচ্ছে।

যাক্, হয় তো এখন থেকে বৌটাকে আরো মারবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে সত্যিই-মরে' যায়। করুক্, আমার চোখে আর তা না দেখ্‌লেই হ'ল, তার কান্নাও আর আমি শুন্‌বো না।

মাস কয়েক পরেই আমার নামে শমনজারী হোল। সাক্ষী দিতে যেতে হবে। ছুটে প্রভাতের কাছে গেলাম। শুনলাম, কালাচাঁদকে তার বৌটা নাকি মেরে ফেলেছে। ডিব্রুগড়ে মকদ্দমা হচ্ছে। কিন্তু প্রভাতের নামে নাকি সাক্ষী দেবার শমন আসে নি।

যেতে হোল। মকদ্দমা উঠ্‌ল। বৌ-টা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আমার দিকে একবার তাকিয়েছিল। আরও সব সাক্ষী ছিল। প্রমাণ হোল, কালাচাঁদটা বেদম মদ খেয়েছিল, সেদিন ঘরে এসে বৌ-টাকে মার লাগাতে শুরু করে। বৌ-টা বুঝি তখন রাঁধছিল। পিঁড়েটা তুলে মারে এক ঘা' মাথায়। সেই টাল্ সামলাতে না পেরে কালাচাঁদ যায় পড়ে'। বেমক্কা পড়ে' গিয়ে—জবানবন্দী দিতে দিতে বৌ-টা হু হু করে কেঁদে উঠ্‌ল।

ডাক্তারের সাক্ষীতে জানা গেল, মদের কল্‌জে—একটুতেই দম্ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

হাকিম হুকুম দিলেন, তিন বছর।

বৌটার মুখ যেন হঠাৎ জ্বল্-জ্বলে হয়ে উঠ্‌ল। ভাবে মনে হোল একটু যেন নিশ্চিন্ত।

বৌ-টাকে তারা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল আমারই পাশ দিয়ে। পুলিশকে সে কি বল্‌ল, তারা তাকে দাঁড়াতে দিলে। কচি বয়েস, সুন্দর মুখ !

আমি এগিয়ে জিজ্ঞেসা করলাম, আপিল করব ?

এই আমার প্রথম কথা বলা! কে যেন আমায় ঠেলে দিলে।

সে বল্‌লে, না বাবু, জেলে গিয়ে বাঁচবো। তা নইলে বাইরে থাক্‌লে কি ছাড়ান্ আছে?

পুলিশরা বল্‌লে, চল্ চল্।

পথে আস্‌তে আস্‌তে ভাবছিলাম, কিন্তু ক'দিনের জন্য বাঁচ্‌ল? কান্না কি ওর থাম্‌ল, না শুরু হোল?

মৃত্যু-দূত

শ্রীক্ষিতীন্দ্রমোহন সাহা

স্রষ্টার বিদ্রূপ আমি, বসন্তের বিফল সন্তান,
উত্তরের পথে আজি বারে-বারে করি যে সন্ধান
মোর জন্ম-সকালের অস্ফুট প্রভাতী,
দ্বার হতে দ্বারে-দ্বারে শুনি শুধু সন্ধ্যার আরতি,
সূর্য্যের বিদায়-শঙ্খ মন্দিরে মন্দিরে
ম্লানকান্তি জীবনের অস্তাচলশিরে।
তারায় তারায় মোর নৃত্য জাগে, তিমির-নির্ঝর যেন দোলে
বৃন্ত হতে ছিন্নপুষ্প আলোকের বনবীথিতলে।
আমার পূজার মন্ত্র ছেয়ে গেছে বন্ধহীন লোকে
কালের অঞ্চল থেকে ঝরে'-পড়া নিঃশব্দ কৌতুকে
অতীতের দিনে যত জীর্ণ পুষ্পসম;
মৃতের রাখাল আমি, সম্মুখে চলিছে শুধু মম
ব্যথাদগ্ধ জীবনের কামনা-সম্ভার,
আঁখির ইঙ্গিত যেন অন্তরের বাণী আগে করিছে প্রচার।
রুদ্র আমি, গৃহ ছাড়া মহেশের প্রায়
স্মৃতি-ভস্ম মাখি' সারা গায়
ভ্রমিতেছি জীবন-শ্মশানে; রবি অস্ত যায়,—

রক্তলাল মেঘে ঢাকা সূর্য্যের শ্মশানে
গৃধ্র উড়ে চলে কোন্ দূর হতে দূরান্তের পানে,
দিনান্ত আলোকে তরুসারি
ক্ষীণতনু দীর্ঘছায়ে উঠিছে মর্ম্মরি'।
বাঁধিয়াছি গৃহ আমি জীবনের হিমাদ্রি-শিখরে
মৃত্যুসতী যেথা মোর বসে' আছে শূন্য গৃহদ্বারে।
মোর সাথে ফিরে' চলে লালসার বিশীর্ণ কঙ্কাল,
মোরে ঘিরি' গাহে শুধু অকৃতার্থ যৌবনের সঙ্গীত উত্তাল।
বেদনা-তান্ত্রিক শূলপাণি মদনেরে করেছে নিঃশেষ,
জীর্ণ পুষ্পপাত্র ফেলি' যৌবন-পার্ব্বতী নিরুদ্দেশ।
কামনা হয়েছে ভস্ম, যৌবন গিয়েছে বৃথা চলে',
ভেবেছিনু যাব ফেলি' জীর্ণপুষ্পগুলি
অলক্ষ্যে আপন মনে বিস্মৃতির ঘাটে যাবে চলি।
আজ দেখি সেই শুষ্ক যৌবনের দান
আমার চোখের জলে হয় নি ভাসান।
দেখি তারি স্মৃতি-কণা মম
মলিন জীবন-পুষ্পে গন্ধসম জাগে ক্ষীণতম।

ক্ষিদের খোরাক

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

ছেলে আর্ত্তনাদ করিতেছিল,—She can fly but the fox cannot, সে উড়িতে পারে কিন্তু খেঁক্‌শিয়ালি পারে না।

—সে কে ?

—ঐ মুরগী।

—তাই বল্‌, মুরগী উড়িতে পারে, খেঁক্‌শিয়ালি পারে না। বলিয়াই হঠাৎ চোখ তুলে দেখিলাম, পাশের জানালার বাহির হইতে একজোড়া প্রচণ্ড চক্ষু আমাকে যেন কায়মনোবাক্যে গিলিতেছে। চোখাচোখি হইতেই চোখজোড়া চট্‌পট্‌ একধারে সরিয়া গেল, পরক্ষণেই শুনিলাম, নারীকণ্ঠের যাচ্ঞা,—চারটে ভিক্ষা দে দিদি।

ভিক্ষার্থিনীর ঐ দৃষ্টি দেখিয়া আমি শঙ্কিত হই নাই, কিন্তু বিস্মিত হইয়াছিলাম যথেষ্ট। ঐ দৃষ্টি যেন, যদি তার স্বাভাবিক দৃষ্টি হয় তবে তার কারণানুসন্ধানে যাওয়া পণ্ডশ্রম, কিন্তু তা যদি না হয় তবে মনকে ঠাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়—ব্যাপারটা কি ? তার দৃষ্টি যেন আগুনের রেখার মত আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। . . .

ছেলেকে বল্‌লাম, পড়, আমি আস্‌ছি !

বাহিরে আসিয়া আমি দেখিলাম, দিদি সেই স্ত্রীলোকটিকে কাছেই বসাইয়াছেন, সে ভিক্ষার ঝুলিটা পাশের দিকে নামাইয়া রাখিয়াছে, দুইজনে মৃদুস্বরে আলাপ চলিতেছে।

আমার পদশব্দ শুনিয়া সে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল; আমার লক্ষ্য ছিল তার চোখের উপর, কিন্তু পুনর্ব্বার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলাম, আমাদের চোখের সঙ্গে তাহার চোখের কোন প্রভেদ নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, দিদি, কে এ ?

দিদি বলিলেন, চিনিস্‌ নে ?

কিন্তু তাঁহার কথা সমাপ্ত না হইতেই অপরিচিতা নিজেই নিজের পরিচয় দিল; হাসিয়া বলিল, আমি এই গাঁয়েরই মানুষ দাদাবাবু; যখন এতটুকু ছিলে তখন চিন্‌তে—বলিয়া সে আমার মুখের দিকে যেমন করিয়া চাহিল তাহার অর্থ পরিষ্কার। . . তাহার যে দৃষ্টি আমাকে ঘরের বাহিরে আনিয়াছে, দিদির কাছে তার পরিচয় চাহিবার কৌতূহল যে সেইটাই ইহা সে বেশ বুঝিয়াছে। তাহার এ দৃষ্টিতে ভৎ‌র্সনা ছিল না, ছিল স্তিমিত কুণ্ঠা। আমি তাহারই দিকে চাহিয়া ছিলাম; দেখিতে দেখিতে তাহার দৃষ্টির উপর যেন জলভরা ব্যথার ছায়া ঘনাইয়া আসিল! এই দৃষ্টির রূপান্তর তিনটি স্তরে দ্রুতবেগে উদ্‌ঘাটিত হইতে দেখিয়া আমারও বিস্ময় বাড়িয়া চলিল। . . .

স্ত্রীলোকটি বলিল, বসো দাদাবাবু, কথা আছে।

দিদি পিঁড়ি আগাইয়া দিলেন, আমি বসিলাম।

—তোরা কথা ক', আমি কাজে যাই।—বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল,— তোমাকে আমি চিনি নে তা' নয়, কিন্তু চেহারা তোমার ঢের বদলে গেছে; ছোটকালে ছিলে গোলটির মত, এখন হয়েছ নরনারায়ণ অর্জ্জুনের মত।—

বলিয়া সে যেন একটা তৃপ্তি লাভ করিল। কিন্তু এই পবিত্র পৌরাণিক উপমায় আমার রূপের দর বাড়িল বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না; নীলকান্তি বৈষ্ণব-সাহিত্যে যথেচ্ছা পরিমাণে স্তুতি আহ্লাদের বস্তু হইলেও আটপৌরে মানুষের গায়ে সেটা তেমন আহ্লাদের বিষয় নহে। . . .

ভাবিলাম, আমার গায়ের রং দেখিয়াই বুঝি বৈষ্ণবী তখন বিস্ময়ে পুলকে বিভ্রান্ত আত্মহারা হইয়া অমন গিলিবার মত করিয়া আমাকে দেখিতেছিল; কিন্তু তা নয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার ভুল সে ভাঙ্গিয়া দিল।

বলিতে লাগিল, আমি তোমাকে তখন দেখছিলাম—আমার সে অপরাধ তুমি মাপ করো। আমার মনের খবর আমি ত জানি, আমার সে চাওয়াতে তুমি খুশী হও নি। আমি তোমাকে দেখছিলাম, তুমি দেখতে ঠিক তারই মত হয়ে উঠেছ।—

স্বতই মনে প্রশ্নের উদয় হইল, কার মত হ'য়ে উঠেছি, শ্রীকৃষ্ণের মত, সে নরনারায়ণ অর্জ্জুনের মত, না শ্রীগুরুর মত, না স্বয়ং সেই বাবাজীর মত?

কিন্তু আমার এ-প্রশ্নও যে ঠিক পথে যায় নাই তাহাও জানিতে বিলম্ব হইল না।

—তুমি ভাবছ, কার কথা বলছে? সেই কথাটাই তোমাকে বলব, কিন্তু সেইটা তোমার কানে গেলেই আমার সেই চাওয়ার অপরাধ বেড়েই যাবে। তখন কিন্তু ক্ষমা করো।—

বলিয়া বৈষ্ণবী থামিল কিন্তু আমার উস্‌পিস্‌ ধরিয়া গেল। যে লোকটার কথা মনে পড়িয়া, যে কারণেই হোক্‌, মানুষের চোখ দিয়া আগুন বাহির হয়, তাহার সঙ্গে আমার আকৃতি কি প্রকৃতিগত একটা সাদৃশ্য আছে, মুখের উপরই সে সংবাদটা শ্রবণ করা, বড় হাসির কথা নয়।

বলিলাম, করবো। তুমি বলো।

—বল্‌ছি। গাঁয়ের কাছারীর নায়েব দেবনাথ দত্তকে চেন ত?

ঘণ্টাখানেক আগেই দেবনাথ দত্তর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, কাজেই প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও 'চিনি না' এই জলন্ত মিথ্যাটা বলিতে পারিলাম না। তবে শান্তির কথা এই যে, দেবনাথ দত্ত গৌরবর্ণ সুপুরুষ—আমার ও তাহার মধ্যে রঙের ব্যবধান ছুটি মেরুর মত।

বলিলাম, চিনি।

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, ঐ দেবনাথ দত্ত যার চাকর তার তুমি নাম শুনেছ, কিন্তু চোখে তাকে দেখ নি। আমরা তাকে চিনি— সে এখনও বেঁচে আছে।

বুঝিতেই পারিলাম না, মানুষের বাঁচিয়া থাকার সুসংবাদটা এত জাঁকাল' করিয়া বলিবার কি প্রয়োজন পড়িয়াছিল, কিন্তু বৈষ্ণবী, দেবনাথ দত্ত মহাশয়ের মনিবের আজ পর্য্যন্ত জীবিত থাকাটা মনিবের পক্ষেই অমার্জ্জনীয় অপরাধ গণ্য করিয়া আক্রোশে উত্তাপে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য একেবারে হতবাক্‌ হইয়া গেল। সে চোখ ফিরাইয়া লইয়াছিল অন্যদিকে, চোখের ভাবান্তর দেখিতে পাইলাম না।

বলিলাম, সে বেঁচে আছে। তারপর?

বৈষ্ণবীর হুঁস্‌ ফিরিল; বলিল, তারপর গোড়া থেকেই বলি। . . . এই গাঁয়ের নদীর জল, ধর্‌তে গেলে বারমাসই থাকে না, বর্ষার আড়াই মাস নৌকা চলাচল করে, তারপরই চড়া জেগে তা' বন্ধ হয়ে যায়। এ গাঁয়ে আসার সুবিধে তাই বর্ষাকালেই।—

উনিশ সালের বর্ষাকালে একদিন এক সাজান' বজরা এসে লাগ্‌ল ঐ কাছারীর ঘাটে; শুন্‌লাম, চোখে দেখ্‌লাম না। আরও শুন্‌লাম, কাছারী-বাড়ী ফুল পাতা কলাগাছ মেটে কল্‌সী দিয়ে বিয়ে-বাড়ীর মত করে' সাজান হয়েছে। জমিদার ক'ল্‌কাতা থেকে তার জমিদারীতে এসেছেন। নহবৎ বাজ্‌তে লাগ্‌ল, ব্যস্ততা আর ধুমের আর শেষ রইল না। যার যা' সাধ্য ভেট্‌ প্রণামী দিয়ে জমিদার অশোক বাঁড়ুয্যের সম্মান রেখে পায়ের ধুলো নিয়ে এল। . . . এক-দিন জমিদার নিজের খরচে যাত্রা গানই দিলেন—'অভিমন্যু বধ' পালা গাওয়া হল; বিশ্‌ কোশ্‌ দূর থেকে লোক এসে শুনে গেল। বিশ্‌ কোশ্‌ জুড়ে' ধন্যিরব পড়ে' গেল, প্রার্থী এসে ফেরে না।

. . . দিন কৈ একটু কম্‌লে আমি একদিন দেখ্‌তে গেলাম—কি দেখ্‌লাম সে বিষয় আর বল্‌বো না, খালি

বল্‌বো তার চোখের কথা, অমন ধারালো চোখ আমি আর দুটি দেখি নাই; ইস্পাত মাজ্‌লে যেমন ঝক্ ঝক্ করে, আলো ঠিক্‌রে ধাঁধা লাগায়—তেম্‌নি তার চাউনি। আমার পানে একবার সে চোখ তুলে' চাইল, তাইতেই আমার মনে হ'ল, এই মানুষকে আবার কেউ দেখ্‌তে আসে! দাঁতে জিব্ কেটে চলে' এলাম। . . .

পেঁজ, রস্থন, মুরগী, খাসি, বিচার, দরবার দস্তরমত চলেছে, বাবু রোজ বিকেলে বজরার ছাতে বসে' মাছ ধরেন কি আয়েস করে' আল্‌বোলায় তামাক খান্; কিন্তু হঠাৎ একদিন মিনিট কয়েকের জন্যে তাঁর চোখের তারা ফাৎনার থেকে উঠে' অন্যদিকে একেবারে স্থির হ'য়ে রইল। একটি মেয়ে কাঁখে কলসী নিয়ে ঘাটে জল নিতে এসেছিল—তারি দিকে চেয়ে অশোক বাঁড়ুয্যের আর হুঁস্ রইল না।

দেবনাথ দত্ত সেখানে ছিল, সে ঐ চাউনির একটা অর্থ করে' নিয়ে বলে' দিলে,—অমুকের মেয়ে, আপনার খাসের প্রজা; আপনার আদেশ মান্‌তে' বাধ্য।

— কে আছে ওর?

—বিধবা মা কেবল।

শুনে বাবু মুখ টিপে একটু হাস্‌লেন।

অশোক বাঁড়ুয্যে খোঁজ নিয়ে জান্‌ল, ওরা তাদেরই পাল্টা ঘর। গাঁয়েরই শ্রীনাথ ভটচাজকে দিয়ে সে মেয়েটার মায়ের কাছে একেবারেই বিয়ের প্রস্তাব করে' পাঠাল। তার মা বলে' পাঠাল,—আপনারা জমিদার, ধনী লোক, আমাদের মাথার মাণিক, আমরা আপনার পায়ের ধুলো, এ-মেয়ে ঘরে নিয়ে কি সুখ হবে. বাবা?

তিনি পাল্টা বলে' পাঠালেন,—হবে। তখন মালিনী আমার স্ত্রী হবে, আমাদের ঘরের বউ হবে; তখনকার ঘরের মত মর্য্যাদা সে পাবেই। তবে আপত্তি কেন?

এ আশ্বাসেও মালিনীর মা'র মনের ঘোলা কাটল না; আপত্তিটা সে বজায় রাখ্‌ল। কিন্তু মালিনী নিজে বল্‌ল, —মা' আমায় যে নিতে চায় তারই হাতে দাও; তোমার দুঃখও ত ঘুচবে—

মা ভেবে দেখল, কথাটা মন্দ নয়। তার উপর মেয়ের যদি বড় ঘরের বউ হবার সাধ হয়ে থাকে তবে আমি তাতে বাদী হই কেন? সুখ ত' কপালের কথা—যেখানেই সে যাক্, সুখ দুঃখের অদৃষ্ট ত' তার সঙ্গেই থাকবে।—ইত্যাদি ভেবে মা সম্মতি দিল।

কথাটা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দিকদিগন্তে রটে গেল—মালিনীর সৌভাগ্যের আর সীমা নাই, সে জমিদারের স্ত্রী হবে; দলে দলে লোক এসে মালিনীকে দেখে' দেখে' যেতে লাগল; সবারই মুখে একই কথা, মালিনী, ভাই, মনে রাখিস দিদি, আমাদের যেন ভুলো না। সে আনন্দ যদি দেখ্‌তে, দাদাবাবু, তবে তোমারই মনে হত যে, মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এ-আনন্দ চিরজীবি হোক। বরাত এমনি খুলে গেল যে, যে দেবনাথ দত্ত গরীব বলে তাদের পানে চাইতেই বিমুখ ছাড়া আর কিছু আজন্মকাল করে নাই সেই যেন পেলে এখন মা-মেয়ের পায়ের ধুলোই নেয়।—

মালিনী ছিল সাদাসিদে হাবলা গোছের, কিন্তু লোভটা ছিল তার ষোল আনার উপরে আরও দু' আনা। একেবারে মনের ভেতর থেকে তাকে বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। ভগবান যাকে উদরান্নে বঞ্চিত রেখেছিলেন, মানুষের হাত দিয়ে তাকে তা হাতে তুলে দিতে এলে সে-হাত ফিরিয়ে নেওয়া বড় শক্ত-প্রাণের কথা। আমাদের কাছে যাচ্ঞার একটা মোহ আছে; ক্ষতি স্বীকার করি তবু প্রার্থীকে হঠাৎই বিমুখ কর্‌তে পারি নে। তার উপর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মানুষ যা-কিছু ভোগের আশা করে তারই আয়োজন করে নিয়ে যে ডাক্‌তে আসে তাকে ফিরায় এমন কঠিন মানুষ ত আমি দেখি নে।

মালিনীর মা মেয়ের স্বপ্নেই বিভোর হয়ে গেল।

মালিনী একদিন মায়ের অজানা অশোক বাঁড়ুয্যেকে বলে পাঠাল—মা আছে ভাঙ্গা কুঁড়েয়, তাকে আগে দেখা দরকার।

অশোক বাঁড়ুয্যে অতিশয় ব্যস্ত হ'য়ে উঠল; মালিনীর ইচ্ছা যেন প্রভুর আদেশ!

নায়েবের বাসায় স্ত্রীলোক ছিল না; মালিনীর মা আর মালিনী উঠে এল সেই বাসায়; অশোক বাঁড়ুয্যে তাদের যে কি করে সন্তুষ্ট ক'রবে তারি উপায় সে যেন এক মুহূর্ত্তও

পায় না এমনি তার কুণ্ঠিত অপরাধীর ভাব। এদিকে অসংখ্য লোক লেগে মালিনীর মা'র বাড়ী নতুন করে তুলতে লাগল।

বিয়ের দিন ঠিক হল ; তেইশে শ্রাবণ!

মালিনী সময় অসময় কাঁদে ; বলে, মা, সেখানে একবার গেলে ত' আমায় আর আস্‌তে দেবে না।

মা বলে,—তা' ত' দেবেই না।

মেয়ে বলে, তোমায় না দেখে' দেখে' যে আমি মরে যাব।

মা'র মনে আসে, তখন আর মর্‌বি নে ; কিন্তু মুখে বলে,—আমি ভালই থাকব, বাড়ী-ঘর দোর সব নতুন হ'য়ে গেল। বলেই মেয়েকে কোলের মধ্যে টেনে নেয়। . . .

মালিনী একদিন বল্‌লে,—উনি বল্‌ছিলেন, তুমি এখানে গরীবের মত পড়ে' থাক্‌লে তাঁরই লজ্জার কথা হবে। তুমিও চল না, মা, আমার সঙ্গে।

মা আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌ল—কথা কয়েছিস তার সঙ্গে?

মালিনী লাল হ'য়ে উঠ্‌ল ; বল্‌ল,—ক'য়েছি ত। তুমি সেদিন ছিলে না, এসে কথা কইয়ে তবে ছাড়লেন।

মালিনীর মা'র মুখ এক-পলকের জন্যে গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ল ; কিন্তু পরক্ষণেই সে হেসে বল্‌ল,—ক'য়েছিস, বেশ ক'রেছিস্। কিন্তু আমাকে এখানে থাক্‌তেই হবে। ভিঁটে ছাড়ি কেমন করে' তা' বল্?—

মালিনীর মায়ের বাড়ী তৈরী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বিয়ের দিনও আসন্ন ; রোজই সে দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে একবার করে' বাড়ী কতদূর এগুলো তা' দেখে আসে।

বিয়ে ঐ বাড়ীতেই হবে।

মালিনীর মাকে অশোক বাঁড়ুয্যে বল্‌ল,—সেই ভাল। আপনাদের ক্ষুণ্ণ ক'রতে আমি চাই নে—কোনোদিক্ দিয়েই নয়। আমি পরশু নাগাদ ক'ল্‌কাতায় যাব ; বিয়ের সময় আমার সঙ্গে যারা আস্‌বে তাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয় তার আয়োজন আমাকে সেখান থেকেই করে' পাঠাতে হবে—এখানে, জানেনই ত' কিছুই মেলে না। জিনিষপত্র দিয়ে আগেই লোক পাঠিয়ে দেব, আপ্‌নারা নায়েব মশাইকে দিয়ে জিনিষগুলো শুধু গুছিয়ে ঘরে তুলবেন। বিন্দুমাত্র ব্যস্ত আপ্‌নারা হবেন না ; যে জন্যে যে জিনিষ আর যে লোকের দরকার তা' আমিই আন্‌ব।

মালিনীর মা কেঁদে' বল্‌ল,—বাবা, পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার ছেলেই ছিলে।

নায়েব দেবনাথ দত্ত সেখানে ছিল ; সে বল্‌ল,—এবার জামাই হ'লেন। আপনার পুণ্যির জোর আছে।—কথাটা বল্‌তে পেয়ে দেবনাথ যেন ধন্য হয়ে গেল ; কিন্তু এই দেবনাথই মালিনীর মাকে আগে খুব সম্মান করেছে ত' তুই না বলে' তুমি বলেছে।—

অশোক বাঁড়ুয্যে লোকলস্কর মালপত্র পাঠা'তে চলে' গেল ; বলে' গেল,—আপ্‌নি কিছু ভাব্‌বেন না ; সকল দায় আমার, এই মনে করছি আমি। . . .

অশোক বাঁড়ুয্যে চলে গেলে মেয়ের লুকিয়ে লুকিয়ে সে কি বুকফাটা কান্না। রীতিমত ভালবেসেছিল, দাদাবাবু। আমাদের মেয়েরা স্বামী বল্‌তে আগেই মন বিকিয়ে বসে' থাকে, এ-কথা আমি হাজার মেয়ের মুখে শুনেছি। ভেতর থেকেই কিসের রসে ভালবাসাটা আগে থাক্‌তেই গজায় তা কেউ জানে না ; লজ্জার মতই ভালবাসাও বাইরে থেকে চাপান' যায় না, এ কথা কেবল আমিই নতুন বল্‌ছি নে, তুমিও তা' জান। স্বামী-জ্ঞানেই মালিনী অশোককে প্রাণ ঢেলে' ভালবেসেছিল ; তার উপর নতুন আবেগ। . . .

অশোক তার বজ্‌রায় পাল তুলে' দিয়ে রুমাল উড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ; মালিনী শয্যা নিল।

হঠাৎ মালিনী একদিন বলে' বসল,—সে যদি আর না আসে, মা?

মা মনের ভিতর চম্‌কে' উঠে' বল্‌লে,—ছি ছি! ও পাপকথা মুখেও আনিস নে।

আনন্দে দিন কাটে। . . .

কিন্তু হঠাৎ একদিন উৎকণ্ঠা দেখা দিল। যেদিন

লোকলস্কর প্রভৃতি এসে পৌঁছোবার কথা, সেদিনটা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু কিছুই এল না।

আসছে আসছে করে' মালিনী আর মালিনীর মা পথ চেয়ে থাকে, থাক্‌তে থাক্‌তে বাইশে শ্রাবণ এসে পড়ল।

একুশে তারিখে যে-কোনো সময়ে অশোক বাঁড়ুয্যের আসার কথা। আজ বাইশে—দুপুর গড়িয়ে গেছে। যেন আগুনের উপর পা ফেলে বেড়াচ্ছে—এম্‌নি ছট্‌ফট্‌ করে' বেড়াতে লাগ্‌ল মালিনীর মা। . . . কিন্তু না শোনা গেল বজ্‌রার উপর থেকে সেই শঙ্খধ্বনি, না দেখা গেল তার লাল নিশান। নদীর দিকে চোখ্‌ কান পেতে' থাক্‌তে থাক্‌তে মালিনী আর তার মা যেন ক্রমে আপাদ-মস্তকে আড়ষ্ট হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

সন্ধ্যার সময় মালিনীর মা নায়েবকে বল্‌ল,—নায়েব মশায়, তিনি আস্‌বেন, ঠিক ত?

নায়েব বল্‌ল,—ঠিকই ত' ছিল, এখন তাঁর মর্জ্জি।

মালিনীর মা বল্‌ল,—কই, লোকজন জিনিষপত্র কিছুই ত' এল না।

নায়েব বল্‌ল,—ভুলে গেছেন বোধ করি, বাবুদের মন!

মালিনীর মা রেগে বল্‌ল—ঠাট্টা ক'র্‌ছিল নাকি?

—না ঠাট্টার কথা মোটেই নয়। তবে কথা কি না, বাবুদের বিয়ে ঐ রকমই; কতটা পছন্দ করেন, কতটা অপছন্দ করেন, তারপর যার সঙ্গে প্রজাপতির নেহাৎ নির্ব্বন্ধ থাকে তারই সঙ্গে চূড়ান্ত হ'য়ে ঘটে' যায়।—বলেই দেবনাথ দত্ত খানিকটা হেসে যেন এক-ঝলক গরল উগ্‌রে দিল।

মালিনীর মা'র মন সন্দেহে ভরে উঠ্‌ল—বুঝি সে আস্‌বে না। নিদারুণ উদ্বেগে মালিনীর মা'র বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা পাষাণ হ'য়ে জমে উঠ্‌ল। তবু কিন্তু আশার একছিঁটে আশ মনে রইলই।—এখনো রাত্রিটা আছে, কাল্‌কার সমস্তটা দিন আছে; লগ্নের আগে সে একা এলেও হবে। . . .

কিন্তু রাত্রিটা গেল, সমস্তটা দিন গেল, লগ্ন বয়ে গেল,—না এল অশোক বাঁড়ুয্যে নিজে, না এল তার লোক, না এল চিঠিতে একটা খবর।

মা আর মেয়ে কাঠ হয়ে বসে' রইল, মা'র চোখে জল পর্য্যন্ত রইল না।

দাদাবাবু, তোমাকে দেখে' ঠিক অশোক বাঁড়ুয্যেকে মনে পড়ে; তাই তখন অমন করে' চেয়ে ছিলাম; অপরাধ নিও না। আমিও বড় বামুনের মেয়ে, জাত হারিয়ে ভেক্‌ নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছি; লেখাপড়া বেশ জানি—তাই আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, মনটা যেন তোমার অশোক বাঁড়ুয্যের মত না হয়।

আমি লজ্জিত হইয়া চোখ নামাইলাম।

বলিলাম,—তারপর কি হল?

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল,—তারপর কিছুদিন ধরে' অষ্টপ্রহর কেঁদে কেঁদে মালিনী কান্না একেবারে ত্যাগ কর্‌ল, কিন্তু দিন দিন শুকিয়ে উঠ্‌তে' লাগ্‌ল, ঘুমের ঘোরে সে ভয় পেয়ে চীৎকার করে' ওঠে। . . .

কিন্তু তা-ছাড়াও যন্ত্রণা আরও বাড়্‌ল কত! যারা দু'টি দিনের জন্যে কেবল মালিনী আর তার মা'র সঙ্গে সমানের মত কথা কইতে সাহস পায় নি, তারা দলে দলে কোমর বেঁধে আস্‌তে লাগ্‌ল ঘটনাচক্রে দুদিনের সেই বাধা দেওয়ার শোধ নিতে—কত ঠাট্টা কত বিদ্রূপ কত টিট্‌কারী; মানুষকে যন্ত্রণা দিতে মানুষের রসনায় যত বিষ আছে সবাই মিলে তার সবখানি যেন তারা ঢেলে দিয়ে যেতে' লাগ্‌ল।

চারটি মাস এম্‌নি করে কাট্‌ল; পাঁচমাসের মুখে মালিনী হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

খোঁজাখুঁজি সুরু হ'ল, কিন্তু মালিনীর মা নিজে তার ঘর ছেড়ে এক-পা বেরুলো না।

একজন দৌড়ে এসে খবর দিল,—মালিনীর মা, মালিনীকে পাওয়া গেছে, চক্কোবর্ত্তিদের পুকুরের পাড়ে আছে, শীগ্‌গির এস। কিন্তু মালিনীর মা খালি তার লালবর্ণ চোখ দুটো শূন্যের দিকে মেলে একদৃষ্টে চেয়ে যেখানে বসে' ছিল সেইখানেই বসে' থাক্‌ল; মেয়েকে পাওয়া গেছে শুনেও তার সাড় এল না; কথাটিও কইল না, নড়েও বস্‌ল না।

যে খবর এনেছিল সে খানিক্ অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকে চলে গেল।

মালিনীর মা তখন, তার মুঠোর মধ্যে যে ছোট্ট কাগজখানা ছিল তাই খুলে' আবার পড়ল; তাতে লেখা ছিল,—মা, পেটে সন্তান নিয়েই আমি চল্‌লাম; আমাকে সে ভুল বুঝিয়েছিল; তবু তুমি তাকে ক্ষমা করো।...

বৈষ্ণবী থামিয়া গভীর একটা নিঃশ্বাস গ্রহণ করিল।

আমি যেন সংজ্ঞা পাইয়া বলিয়া উঠিলাম—কি সর্ব্বনাশ!

বৈষ্ণবী তার ঝুলিটা টানিয়া লইয়া উঠিতে উঠিতে বলিল,—আমিই সেই মালিনীর মা।

শুভদিন

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

আনীল গুণ্ঠনখানি টানিয়া যতনে,
ধরিত্রী নিশীথ যাপে কৃষ্ণবাস পরি';—
কা'র প্রতীক্ষার লাগি' আনতবদনে
বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারে যাপিছে শর্ব্বরী!
নাহি জানি;—কতদিন, কিসের লাগিয়া
এ কৃষ্ণা নিশীথে ধরা আশাপথ চাহি'—?
আলোর কামনা জাগে!
সহসা হাসিয়া
পূর্ব্বাকাশা-তিমিরসিন্ধু ধীরে অবগাহি'
উঠিল ভাসিয়া ধীরে সুধাংশু, সুন্দর।
প্রকাশিল কিরণের ইন্দ্রজালমালা;
মনে হ'ল,—
আছে বসি' আমার অন্তর
শুভের বাসনা বহি'। নাহি দীপ জ্বালা,
নাহি আয়োজন;
সে বাসনা পূর্ণ হ'বে—
এ মোর তিমির-তন্দ্রা দূর হ'বে কবে?

আমিনা

শ্রীপঞ্চানন মজুমদার

(১)

সে বৎসর চৈত্রের শেষে রহমতপুরে যে কলেরার প্রকোপ হইল, তাহাতে কেদার চাটুয্যের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। সাত দিনের মধ্যে কেদারের স্ত্রী, ভগ্নী, কনিষ্ঠ ভাই ও দুইটী ছেলে মারা গেল। অবশেষে যখন কেদার নিজে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন যে সকল আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসী তাহার সেবা বা লৌকিক আত্মীয়তা পালনের জন্য তাহার গৃহে উপস্থিত হইল তাহাদের প্রত্যেকের নিকট একান্ত মিনতি করিয়া কেদার বার বার বলিল—আমি চল্লাম, অণিমার তোমরাই মা-বাপ। ওকে দেখো।

কিন্তু কেদারের মৃত্যুর পর তাহার কোন আত্মীয় স্বজনই তাহার অনাথা কন্যা অণিমাকে কোলে তুলিয়া লইল না। প্রথম কয়েক দিন পাড়ার লোকে পালা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। পরে তাহারা যখন দেখিল, কেদারের ঘরে কয়েকখানি পুরাতন কাঁসার বাসন ছাড়া আর কোন মূল্যবান জিনিষ নাই তখন তাহারা একে একে সকলেই সরিয়া পড়িল। দশ বছরের বালিকা অণিমা পৃথিবী শূন্য দেখিল।

সবাই সরিয়া পড়িল, সরিল না শুধু একজন। সে কেদারের কেহই নয়,—আত্মীয় নয়, কুটুম্ব নয়, এমন কি স্বজাতিও নয়। সে মুসলমান। তাহার নাম হামিদ। এক গ্রামে বাস এই মাত্র সম্বন্ধ। তবে কেদারের সঙ্গে হামিদের খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। সে ঘনিষ্ঠতার কিছু কারণও না ছিল এমন নয়। হামিদ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ—বহু জোত জমী, বাগান পুকুর। জমীদারের নায়েব যখন জোর করিয়া তাহার পুকুরের মাছ ধরিত, বাগানের গাছ কাটিত কিম্বা ছুতানাতা ধরিয়া নানা অত্যাচার করিত, তখন হামিদ পরামর্শের জন্য কেদারের কাছে ছুটিয়া আসিত। কেদারও হামিদকে সৎপরামর্শ দিয়া তাহার যথাসাধ্য উপকার করিত। কৃতজ্ঞ হামিদ কেদারকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সম্মান করিত, তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, তাহার বাগানের ফল, পুকুরের মাছ উপহার দিয়া মাঝে মাঝে কেদারের পুত্রকন্যার প্রীতি উৎপাদন করিত। এইরূপে উভয়ের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কেদারের পুত্রকন্যাগণ হামিদের পরমস্নেহের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। অণিমাকে হামিদ আদর করিয়া আণিমা-মা বলিয়া ডাকিত।

তাই কেদারের মৃত্যুর পর অণিমার জন্য হামিদ বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

অণিমা একদিন কাঁদিয়া বলিল, একা আর থাকতে পারি নে—বড় ভয় করে, চাচা, পিসী আসে না?

হামিদ বুঝিল, যদিও রাত্রে পাহারার জন্য সে লোক

বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তথাপি দশ বছরের মেয়ের পক্ষে রাঁধিয়া খাওয়া ও প্রায় সমস্ত দিনরাত একা সেই বিভীষিকাময় নির্জ্জন গৃহে বাস করা বাস্তবিকই দুষ্কহ। হামিদ সেই দিনই আহারান্তে অণিমার পিসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

রহমতপুরের পাশেই গঙ্গার ধারে রাধানগরে কেদারের দূর সম্পর্কীয়া এক বিধবা ভগ্নীর বাস। হামিদ উপস্থিত হইতেই বিধবা কাত্যায়ণী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে রে বাবা। আমার কি করে' গেলে গো দাদা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

হামিদ কাত্যায়ণীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—চুপ কর, দিদি, কেঁদে আর কি ক'রবে? ভগবান যে দুঃখ দেন তা' ত সইতেই হ'বে। এখন মেয়েটাকে কোলে তুলে নাও। তাঁর মুখ পানে চায় এমন আর কেউ ত নেই!

কাত্যায়ণীর কান্না থামিল। সে তখন হামিদকে জেরার উপর জেরা করিয়া জানিল, কেদার কোন সম্পত্তি বা নগদ টাকা কিছুই রাখিয়া যায় নাই, বরং তাহার স্ত্রী পুত্রের অসুখের সময় হামিদের নিকট একশত টাকা দেনা করিয়াছিল তাহা পরিশোধের পূর্ব্বেই নিজে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। কেদারের চিকিৎসার জন্য হামিদ যে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিয়াছিল, সে তাহার কোন উল্লেখ করিল না। হামিদের মুখে কাত্যায়ণী আরও শুনিল রহমতপুরে কেদারের যে দুইজন খুড়তত ভাই আছে গ্রামে কলেরা দেখা দিতেই তাহাদের একজন সপরিবারে কলিকাতা পলায়ন করিয়াছে, আর একজন কেদার যেদিন মারা যায় সেইদিন সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিয়াছে এবং দূর সম্পর্কীয় অন্য যে সকল আত্মীয় গ্রামে আছে তাহারা চাঁদা করিয়া কেদারের সৎকার করিয়া অণিমার যে মহৎ উপকার করিয়াছে এখন অসহায় বালিকাকে তাহাই দুইবেলা শুনাইতেছে। শেষে হামিদ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, রহমতপুরে এমন একটা প্রাণী নেই যে সেই কচি মেয়েটাকে দু'বেলা দু'মুটো ভাত দেয়। আমরা মুসলমান, দিদিঠান্, আমাদের ছোঁয়া খেলে ত তোমাদের জাত যাবে নইলে আমি বুকে করে' অণিমা-মাকে আমার ঘরে নিয়ে যেতাম। কিন্তু সে উপায় ত নেই। এখন তুমি গিয়ে যদি রহমতপুরে থাক তবেই মেয়েটা বাঁচে, আর দাদার ভিটেটাতেও সন্ধ্যে পড়ে।

কাত্যায়ণী কোন উত্তর করিল না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। মনে মনে বলিল—'ভাল আপদ। আমার দশটাকা লুকোন আছে, ব্যাটা নেড়ে সে খবরও পেয়েছে। মৎলব মেয়েটাকে আমার ঘাড়ে চাপায়।' একটু পরে মাথা চুলকাইয়া বলিল—'কোথাও গিয়ে থাকা আমার পক্ষে শক্ত। এই ঘরটীতে পড়ে থাকি, খাই না খাই, গঙ্গায় একটা ডুব দিই আর শ্বশুর শাশুড়ীর ভিটেটায় সন্ধ্যে দিই। তা ছাড়া সেখানে গিয়ে খাব কি? দাদা ত ধন দৌলত কিছু রেখে যায় নি।'

হামিদ অনেক বুঝাইল, অনাথা বালিকার মুখ চাহিয়া দয়া করিতে বলিল। কিন্তু তাহার সমস্ত যুক্তি, সমস্ত কাতর প্রার্থনা ভাসিয়া গেল। যে বুঝিবে না তাহাকে কে বুঝাইবে? হামিদ দেখিল, আত্মীয়স্বজনবিরহিত এই বিধবার সংকীর্ণ জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থ ইহার প্রাণকে কঠিন করিয়া তুলিয়াছে, ইহার কাছে মমতার দাবী, মনুষ্যত্বের দাবী অর্থশূন্য। নিরুপায় হইয়া হামিদ শেষে বলিল—দিদিঠা'ণ,খরচপত্রের ভাবনা ভেব না, সে বন্দোবস্ত আমিই সব ক'রব। তুমি যদি গঙ্গা ছেড়ে রহমতপুরে গিয়ে নাই থা'কতে পার ত বল অণিমাকে তোমার কাছে এখানেই এনে রাখি।"

তখন কাত্যায়ণী ইতস্তত করিয়া সম্মত হইল।

পরদিন হামিদ অণিমাকে কাত্যায়ণীর কাছে রাখিয়া গেল; বিদায়ের সময় কাত্যায়ণীর হাতে দশটী টাকা দিয়া সজল নয়নে হামিদ বলিল, 'আমিনা মার যখন যা' দরকার হ'বে, আমায় ব'লতে লজ্জা করো না, দিদিঠা'ন।"

কাত্যায়ণী সন্তুষ্ট হইল; ভাবিল, 'মন্দ নয়, মেয়েটাকে কাছে রেখে লাভই হ'বে—নেড়ে ব্যাটার পয়সা আছে, বুদ্ধি নেই।'

(২)

লাভের প্রত্যাশায় কাত্যায়ণী অণিমাকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই যখন সে বুঝিল,

হামিদ হিসাবী লোক, তখন 'নেড়ে ব্যাটাকে' দোহন করার জন্য তাহার মাথায় নিত্য নূতন ফিকির খেলিতে লাগিল। আজ অণিমার কল্যাণে ষষ্ঠীর পালন, কাল ওলাইচণ্ডীর পূজা, পরশু ন্যাংড়া পিরের সিন্নি, তার পরদিন ঢাকেশ্বরীর মানত ইত্যাদি অছিলায় কাত্যায়ণী হামিদকে ক্রমাগত দোহন করিতে লাগিল। নিতান্ত জালাতন হইয়া কিছুদিন পরে হামিদ অণিমাকে প্রত্যহ দেখিতে আসা বন্ধ করিল। কিন্তু মানুষের স্বার্থবুদ্ধি সহজে দেউলে হইবার জিনিষ নয়। কাত্যায়ণী ল্যাজে খেলিতে সুরু করিল। দু'চারদিন অন্তর হামিদ অণিমাকে দেখিতে আসিলে, কাত্যায়ণী কখন অণিমাকে ধমকাইয়া কাজের অছিলায় ঘরে বন্ধ করিয়া রাখে এবং 'অণির আজ বড় মাথা ধরেছে, কত করে' এইমাত্র একটু ঘুম পাড়ালাম' বলিয়া হামিদকে অবিলম্বে বিদায় করিয়া দেয়, কখনও মিথ্যা অছিলায় অণিমাকে হামিদের নিকট টাকা চাহিতে শিখাইয়া দেয়, কখনও বা অণিমার নাম করিয়া গহনা কাপড় ইত্যাদি আদায় করে।

ক্রমে হামিদ ও অণিমা উভয়েই যখন দেখিল, অণিমার নাম করিয়া হামিদ যাহা দেয় তাহার প্রায় কিছুই অণিমার ভোগে লাগে না, কাত্যায়ণী আত্মসাৎ করে, তখন হামিদ হাত গুটাইল এবং কাত্যায়ণী হাজার শিখাইলেও, হাজার তাড়না করিলেও অণিমা আর হামিদের নিকট কোন জিনিসের জন্য কোন আব্দার করে না।

ফলে কাত্যায়ণীর লাভের গণ্ডা যেমন কমিল, তাহার আহত লোভ তাহার মনকে তেমনই তিক্ত করিয়া তুলিল। ক্রমে কথায় কথায় ছল ধরিয়া সে বালিকা অণিমার উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করিল।

একদিন শীতের অপরাহ্নে আহারান্তে দিবা নিদ্রার পর পাড়া-বেড়াইতে যাইবার সময় কাত্যায়ণী অণিমাকে ডাকিয়া বলিল,—'আজ যদি তোর হামিদ চাচা আসে ত তোর লেপ তোষকের জন্যে দশটা টাকা চেয়ে নিস্। নইলে আজ থেকে তোকে মাটীতে শুতে হ'বে তা' বলে রাখছি। অত বড় ধাড়ি মেয়ে নিয়ে কেউ এক লেপে শুতে পারে না। শিখিয়ে দিলেও মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না; ন্যাকা মেয়ে।'

ক্রমাগত অকারণ তিরস্কারে অণিমার বালিকা হৃদয়ে বিদ্রোহের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল, আজ একেবারে জলিয়া উঠিল। সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে হামিদ আসিলে অণিমা বলিল,—'চাচা, আমায় তোমার বাড়ীতে নিয়ে চল, আমি আর পিসীর কাছে থা'কব না।'

হামিদ অণিমার পিঠে, মাথায় হাত বুলাইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, মা, তোমার এখানে কি কষ্ট হচ্ছে?"

অণিমা চুপ করিয়া রহিল।

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া হামিদ অণিমাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা প্রশ্ন করিল। কিন্তু অণিমা কোন কথার উত্তর করিল না, মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল।

অবশেষে হামিদ যখন নিতান্ত করুণ সুরে আদর করিয়া বলিল—'ছি মা, পিসীর ওপর কি রাগ ক'রতে আছে?—তোমায় কত ভালবাসে!' তখন বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—'ছাই ভালবাসে—মিথ্যে করে' কেবলই তোমার কাছে টাকা চাইতে শিখিয়ে দেয়, চাই নে বলে' বকে। আমায় নিয়ে চল, চাচা, আমি আর এখানে থা'কব না।'

হামিদ হাসিয়া বলিল—'এই কথা! এর জন্যে তোমার ভাবনা কি মা? যা' চাইতে বলে, তুমি আমায় বল না কেন?'

অণিমা কোন উত্তর করিল না, ফোঁস ফোঁস করিয়া চাপা গলায় কাঁদিতে লাগিল।

হামিদ অনেক বুঝাইল। বালিকা মানিল না, সেই এক জেদ—'আমায় নিয়ে চল, এখানে আমি থা'কব না।'

হামিদ বড় মুস্কিলে পড়িল। একটু ভাবিয়া বলিল, 'কোথায় নিয়ে যা'ব, মা, তোমায়? আর ত কেউ নেই যা'র বাড়ীতে তোমায় রাখতে পারি।'

'কেন, তোমার বাড়ীতে?'

হামিদ প্রমাদ গণিল। বালিকার এ কথার কি জবাব দিবে! শেষে নিরুপায় হইয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, 'আমি

যে মুসলমান, মা; আমার বাড়ীতে থা'কলে তোমার পিসিমা কোন দিন আর তোমার হাতে খা'বে না।'

'তা না খাক।'

'তোমার বিয়ে হ'বে না।'

'আমি বিয়ে ক'রতে চাই নে। আমায় তুমি নিয়ে চল। তোমার পায়ে পড়ি, চাচা, আমায় নিয়ে চল।' বলিয়া অণিমা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বালিকার চোখের জলে যে স্নেহের বন্যা নামিয়া আসিল তাহাতে সমাজের সমস্ত নিয়মের কঠিন বাঁধ, হামিদের সমস্ত জীর্ণ সংস্কার ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। হামিদ ভাবিল, তখনই অণিমাকে বুকে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইবে। তাহাকে আপন কন্যার ন্যায় পালন করিবে, কিন্তু হামিদ তাহার মানসনেত্রে দেখিল, যেন সমস্ত হিন্দু-সমাজ রোষ-কষায়িত লোচনে তাহাকে শাসাইতেছে, যেন হিন্দুসমাজের নিদারুণ ঘৃণার চাপে বালিকা অণিমার জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিতেছে।

হামিদ আজীবন হিন্দুর সহিত একত্র বাস করিয়াছে, হিন্দুর সুখে হাসিয়াছে, দুঃখে কাঁদিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে এরূপ বিরাট ভেদ লুক্কায়িত আছে তাহা সে কখনও কল্পনা করে নাই। এ সমস্যা জীবনে আজ প্রথম হামিদকে বড় বিচলিত করিল। সে ভাবিল, হিন্দুসমাজ এ অনাথা বালিকার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না, না খাইয়া মরিলেও এক মুষ্টি অন্ন দিবে না, অথচ কোন মুসলমান ইহাকে আশ্রয় দিলে মার মার করিয়া উঠিবে। এ কি নির্ম্মম ব্যবস্থা, এ কি প্রাণহীন ধর্ম্ম! হিন্দুর উপর, হিন্দুধর্ম্মের উপর হামিদের বড় রাগ হইল। সে মনে মনে স্থির করিল, আমিনাকে আপন কন্যার ন্যায় সস্নেহে পালন করিবে এবং ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ঘরে বিবাহ দিবে।

হামিদকে চিন্তিত দেখিয়া অণিমা ব্যস্ত হইয়া পড়িল, তাহার জানু ধরিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, 'কি ভাবছ, চাচা, এই বেলা নিয়ে চল, দেরী করো না; পিসী এলে যেতে দেবে না।'

হামিদের চিন্তাস্রোত যেন হঠাৎ একটা পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া অন্যদিকে ছুটিল। সে ভাবিল, কাত্যায়ণীর অমতে গোপনে আমিনাকে লইয়া যাইবার তাহার কি অধিকার! হিন্দুসমাজের ন্যায় অন্যায় বিচার করার তাহার কি অধিকার! কাত্যায়ণীর আশ্রয়ে রাখিয়া আমিনার বিবাহ দিলেই ত সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়। অণিমাকে একান্ত স্নেহভরে কোলে টানিয়া লইয়া হামিদ কহিল, 'ছি! মা, পিসীমাকে লুকিয়ে কি পালাতে আছে! পিসীমা বুড়ো মানুষ, তুমি ছাড়া তা'র আর কে আছে! তুমিই ত তার সব। তুমি চলে গেলে' তাকে কে দে'খবে। তুমি বড় হ'য়ে রাজরাণী হ'বে, বুড়ো পিসীমাকে কত ভাল জিনিষ দেবে, টাকা দেবে। এখন যা' চায় আমাকে বলো, আমি দেবো। তা' হ'লে আর ব'কবে না।'

সেদিনের মত কাত্যায়ণীকে দিবার জন্য অণিমার হাতে পাঁচটা টাকা দিয়া ও নানা রকম গল্প করিয়া হামিদ অণিমাকে শান্ত করিল।

এই ব্যাপারের পর হামিদের প্রদত্ত অযাচিত অর্থ নির্ঝরিণীর ধারার ন্যায় এখন কাত্যায়ণীর উষর হৃদয় সরস করিয়া তুলিল। ক্রমে তাহার স্নেহে ও যত্নে অণিমার কচি বুকে বিদ্রোহের চাঞ্চল্য থামিয়া গেল। ক্রমে পিসী-ভাইঝির মিলনে হামিদের দুশ্চিন্তা দূর হইল।

(৩)

রাধানগর গ্রামে কাত্যায়ণীর ভগ্ন অট্টালিকার অনতি-দূরে গঙ্গার ধারে মহেশপুরের প্রবল পরাক্রান্ত জমীদার মুখুয্যে বাবুদের এক কাছারী। গঙ্গার ধারে বলিয়া ছোট হইলেও এই কাছারীর উপর বাবুদের বড় যত্ন। চড়ক গঙ্গা পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে বাবুরা স্বয়ং এখানে আসিয়া দশ পনর দিন করিয়া গঙ্গাবাস করিয়া যান। সাধারণত সেই সময় কাছারীতে বড় ধুম পড়িয়া যায়। যাত্রা, গান, ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি নানা উৎসব সে সময় সম্পাদিত হয়। অন্য সময় কাছারীতে দু'একজন কর্ম্মচারী ও চা'র পাঁচজন পাইক বরকন্দাজ জোঁকের মত নির্ব্বিবাদে আট দশখানা গণ্ডগ্রামের নিরীহ অধিবাসীদের রক্ত শোষণ করে; কেহ তাহার খবর রাখে না।

বছর তিনেক পরে রাধানগর অঞ্চলের প্রজারা আশ্বিন মাসের পূজার পর হঠাৎ অসময়ে কাছারীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে এক প্রকাণ্ড আটচালা উঠিল ও নানারূপ বিস্ময়কর সাজসজ্জায় উহা ভূষিত হইতে লাগিল দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের লোক দলে দলে আসিতে আরম্ভ হইল। নানা গুজব ও রকম রকম গল্প ও উপন্যাসে শান্ত নির্জীব পল্লীসমাজ মুখরিত হইয়া উঠিল। কাছারীর যে প্রবীণ গোমস্তা ভারপ্রাপ্ত হইয়া এই আয়োজনে ব্যস্ত ছিল, সেও বুঝিতে পারিল না, এ অনুষ্ঠান কি জন্য হইতেছে। অথচ মনিব পক্ষের তাগিদের জোরে কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই প্রায় সমুদয় আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া আসিল।

কলিকাতা হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পী আসিয়া সেই প্রকাণ্ড আটচালা সাজাইল। নীল চাঁদোয়ার নীচে সবুজ তরুলতা, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পুষ্পিত কুঞ্জবন, সবুজ লতাপাতার অন্তরালে কোথাও ঘোর লাল, কোথাও নীল কাঁচের আবরণে বিজলী আলো, কুঞ্জের ধারে ধারে গদি-আঁটা আরাম চেয়ার, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র কৃত্রিম পাহাড় ও ঝর্ণা, মধ্যস্থলে ঘন পুষ্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিত এক মর্ম্মর বেদী! আটচালার সিংহদ্বারের উত্তর পার্শ্বে গোলাপ জলের ফোয়ারা, প্রত্যেক আগন্তুককে সুরভিশীকর স্নাত করিতেছে। আটচালার উভয় দিকে বহু তাম্বু পড়িয়াছে।

অগ্রহায়ণের প্রথমেই যখন তাম্বুতে তাম্বুতে বহুবিধ গাড়ী গাড়ী আহার্য্য আসিয়া পড়িল, গাড়ী ঘোড়া, লোকজন ও উড়ে পাচকের দলে কাছারী গিস্ গিস্ করিতে লাগিল এবং পূর্ণিমার রাত্রে সমস্ত গ্রামের প্রজাদের কাছারীতে নিমন্ত্রণ হইল তখন আর কাহারও সন্দেহ রহিল না যে, আগামী পূর্ণিমার দিন রাধানগরের কাছারীতে রাসউৎসব হইবে।

এ অঞ্চলের পল্লীবাসীরা এত বড় উৎসব, এমন সমারোহের এরূপ আশ্চর্য্য নয়নরঞ্জন আয়োজন কখন দেখে নাই। বহুদূর হইতে উৎসুক দর্শকের দল কাতারে কাতারে রাধানগর কাছারীতে আসিতে লাগিল। চারিদিক পরিদর্শন করিয়া কৌতূহলী দর্শকগণ আটচালার সিংহদ্বারে আসিয়া শূন্য বেদী লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত সুরে বলিতে লাগিল,—'এ আবার কি রকম রাস গো! ঠাকুরই নেই যে।'

চাপরাস-আঁটা, বিশাল গালপাট্টাধারী ভোজপুরে জমাদার আটচালার সিংহদ্বারে উঁচু এক টুলের উপর বসিয়া বিস্মিত দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহল নিবারণের জন্য মাঝে মাঝে বাজখাঁই গলায় বলিতেছিল—'কল্‌কাত্তামে সোনেকা ঠাকুর তৈয়ার হচ্চে, কাল আস্‌বে।'

পরদিন পূর্ণিমা। সোনার রাধাকৃষ্ণ দেখিবার আশায় রাধানগর ও সন্নিকটস্থ গ্রামসমূহের প্রজাবৃন্দ উৎকণ্ঠায় রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই দলে দলে কাছারীর দিকে ভিড় করিয়া চলিতে লাগিল। উদ্‌গ্রীব জনতার উৎকণ্ঠা ঘণ্টায় ঘণ্টায় শতগুণ সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ক্রমে দিগন্তব্যাপী রক্তাম্বরপরিহিত তপন পশ্চিম গগনের অন্ধকার অন্তঃপুরে অন্তর্ধান করিলেন।

নীল আকাশ, ঘন বনানী ও গঙ্গার কাল জল উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ব্ব গগনে চন্দ্র উদিত হইল। রাধানগরের নূতন রাসমঞ্চ বৈদ্যুতিকআলোকমালায় যেন শত চন্দ্র কিরণে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সু-উচ্চ তোরণোপরি সাহানা রাগিণীতে রসনচৌকি বাজিতে লাগিল। মুগ্ধ পল্লীবাসিগণ সেই সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া অধিকতর সংখ্যায় রাসমঞ্চের সম্মুখে পাশে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া ঠেলাঠেলি ঘেঁসা ঘেঁসি গুঁতাগুঁতি করিতে লাগিল।

জনতা ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বেই হামিদ অণিমাকে সঙ্গে করিয়া রাস দেখিতে আসিয়াছিল। আটচালার দ্বারদেশে যে ভোজপুরী জমাদার কটীদেশে তলোয়ার ঝুলাইয়া পাহারা দিতেছিল সে হামিদের বাগানের ফল, ক্ষেতের গম ও ঘি দুধ ইতিপূর্ব্বে বহু উদরসাৎ করিয়াছিল। সে হামিদের সঙ্গে নীল শাড়ীপরা, কনকবরণা কিশোরী অণিমার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে করিল মুসলমানের ঘরে এমন মেয়ে, যেন সাক্ষাৎ রাধারাণী! সম্ভ্রমে, প্রীতিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। জমাদার আদর করিয়া অণিমাকে আপন টুলের উপর বসাইয়া

নিজে পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। হামিদ জমাদারের পাশে নিজের জন্য একটু স্থান করিয়া লইল।

সন্ধ্যার একটু পরেই মহা জাঁকজমক সহকারে মহেশপুর হইতে এক প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা রাধানগর কাছারীতে আসিয়া পৌঁছিল। হাতী, ঘোড়া, গাড়ী, মোটর গাড়ীতে রাধানগরের সঙ্কীর্ণ রাস্তা সকল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহেশপুরের বাবুদের বহু আত্মীয়, বন্ধু, কর্ম্মচারী যান ছাড়িয়া একে একে রাসমঞ্চে প্রবেশ করিল। সর্ব্বশেষে জমীদার শচীন্দ্রকুমার ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দিলীপকুমার মোটর গাড়ী হইতে নামিলেন।

সমাগত জনতা সোনার রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। শোভাযাত্রার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ না দেখিয়া তাহারা অধিকতর চঞ্চল হইয়া পড়িল। সকলে বিস্মিতভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল।

শচীন্দ্রবাবু মোটর হইতে নামিয়াই কাছারীর গোমস্তাকে হুকুম করিলেন—'রহমৎপুরের হামিদ মণ্ডলকে আ'নবার জন্যে এখনই একজন সোয়ার পাঠাও—বহুৎ জরুরী।'

গোমস্তা কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না—'যে আজ্ঞা' বলিয়া কাছারীর দিকে ছুটিল।

তিন চার হাত দূরে ফটকের পাশে দাঁড়াইয়া হামিদ জমীদার বাবুর হুকুম শুনিল। হুকুমের কড়া স্বরে তাহার অন্তরাত্মা শুখাইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে আত্মস্থ হইল। সে এক পয়সা খাজনা বাকী রাখে না, কাহারও কোন অন্যায় করে না—তাহার কিসের ভয়! হামিদ ত্বরিতপদে শচীন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া আভূমি নত হইয়া সেলাম করিয়া কহিল—'হুজুর আমি এখানেই হাজির আছি, হুকুম করুন।'

শচীন্দ্র পিছন ফিরিয়া একজন হিন্দুস্থানী বরকন্দাজকে বলিলেন—'গোমস্তাবাবুকা পাস্ যাকে কহ সওয়ার নেহি ভেজ্‌না।'—বলিয়াই হামিদের মুখ পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—হামিদ, তোমাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম কেন জান!'

হামিদ একটু থতমত খাইয়া উত্তর করিল—'না,হুজুর।'

শচীন্দ্র বলিলেন—'ছোটবাবুর বিয়েয় তোমাকে বর-যাত্রী যা'বার জন্যে।'

হামিদ বিস্মিতভাবে জমীদারবাবুর মুখের দিকে কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিল।

শচীন্দ্র আবার হাসিয়া বলিলেন, 'বরযাত্রী বল্লে ঠিক হ'বে না, কারণ তুমিই কন্যাকর্ত্তা।'

হামিদ একান্ত সঙ্কুচিতস্বরে বাধা দিয়া বলিল—'হুজুর আমি সামান্য প্রজা, হুজুরের সন্তান, আমার সঙ্গে—'

'উপহাস নয়, হামিদ। দিলীপের বিয়ে—আজই—তোমার ভাইঝি অণিমার সঙ্গে।'

হামিদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; সে নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিল না; ভাবিল, বুঝি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে।

কিন্তু শচীন্দ্র অচিরেই তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। দিলীপের বন্ধু রাধানগরের শ্যামলালবাবুর পুত্র হরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন—'হরেন, হামিদকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে ম্যানেজার বাবুর কাছে যাও। আমিনার কাপড় ও গহনার বাক্স হামিদকে দিয়ে তুমি চটপট ক'রে সাজাবার জোগাড় করগে। লগ্ন সাড়ে নটায়, সাড়ে সাতটা বেজেছে। একটু তাড়াতাড়ি করো।'

বিস্ময়ে আনন্দে হামিদের চক্ষু সিক্ত হইল। কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া বাক্‌নিষ্পত্তি হইল না। ক্ষণেক পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া হামিদ পার্শ্ববর্ত্তী টুলে উপবিষ্টা অণিমাকে ডাকিয়া বলিল, 'আমিনা-মা এ দিকে আয়, প্রণাম কর।'

অণিমা আস্তে আস্তে আসিয়া শচীন্দ্রের পদধূলি লইল।

শচীন্দ্র ফুটোন্মুখকুন্দের ন্যায় অপরূপ লাবণ্যের খনি অণিমাকে দেখিয়া ভাবিলেন—'দিলীপের উপযুক্ত ক'নেই বটে! এ বৌ পেয়ে মা'র আর ক্ষোভ থাকবে না যে, দিলীপ জেদ্ ক'রে কোন অজ্ঞাতকুলশীল ঘরে বিয়ে করলে, কাউকে কিছু জানালে না।'

অণিমার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া শচীন্দ্র তাহাকে হামিদ ও হরেন্দ্রের সঙ্গে, সাজাইবার জন্য কাত্যায়ণী ঠাক্‌রুণের বাড়ীতে পাঠাইলেন।

দিলীপ ইত্যবসরে আটচালার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মর বেদীর উপর আসন গ্রহণ করিয়াছিল। যাহারা ঐ বেদীর উপর সোনার রাধাকৃষ্ণ দেখিবার জন্য দুই দিন হইতে উন্মুখ হইয়াছিল, তাহারা সে স্থলে বরবেশে জমীদার-পুত্র ও অল্পক্ষণ পরে তাঁহার পার্শ্বে বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিতা কাত্যায়ণী ঠাকুরুণের ভাইঝীকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল।

কাত্যায়ণী এই আকস্মিক সৌভাগ্যে এত বিহ্বল হইল যে, সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিল না, কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিল না, কেবল বসিয়া বসিয়া বরক'নের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল!

বিবাহের পরদিন প্রভাতে অণিমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার সময় হামিদের চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। চক্ষু মুছিয়া হামিদ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল—'গরীব চাচাকে ভুলিস্ নে, আমিনা মা।'

হামিদের স্নেহকরুণ মুখের দিকে একবারমাত্র চাহিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিতে করিতে অণিমা শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেল।

(৪)

অণিমার রূপে গুণে অল্পদিনের মধ্যেই দিলীপের মা মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার অমতে ভেদ্ করিয়া লুকাইয়া অহিন্দুর মত বিবাহ করার জন্য ছেলের উপর তাঁহার যে রাগ হইয়াছিল রূপে গুণে লক্ষ্মীর মত বৌ পাইয়া তাহা তিনি অবিলম্বে ভুলিয়া গেলেন। অণিমাকে সকলে আদর করিয়া ঠাট্টা করিয়া আমিনা বেগম বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। মাতৃপিতৃহীনা শ্বশুরবাড়ীর আদরে বাল্যের দুঃখ ভুলিল।

কিন্তু একটা দুঃখ অণিমার পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে সময় সময় তাহাকে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। সে এখন বড় লোকের ঘরের বধূ, ইচ্ছা করিলেই আর তাহার হামিদ চাচার সঙ্গে দেখা করিবার উপায় নাই। হামিদের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ কত মিষ্ট, এমন কি হামিদ যে তাহার পিতৃস্থানীয় এ কথা তাহার শ্বশুরবাড়ীতে কাহারও অবিদিত ছিল না। তথাপি হামিদ মুসলমান ও একজন সাধারণ প্রজা, সেজন্য অনেকেই, বিশেষত দিলীপের মাতা, যখন তখন তাহার সঙ্গে অণিমার দেখা শুনা হওয়ার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলে দুই তিনমাস অন্তর একদিন অনেক উমেদারী করিয়া তবে হামিদ অণিমার সহিত পাঁচ সাত মিনিটের জন্য দেখা করিবার অনুমতি পাইত। তাহাতে অণিমা বা হামিদ কাহারও তৃপ্তি হইত না। কিন্তু উভয়েই জানিত, তাহাদের হাতে ইহার কোন প্রতিকার নাই। অণিমা সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেই হামিদ তাহার উত্তরে বলিত—'মা, তুমি রাজরাণী হয়েছ এই আমার পরম সুখ। আমার মত সামান্য প্রজার সঙ্গে যখন তখন দেখা করা কি তোমার সাজে?' অণিমা সে কথায় আরও দুঃখ পাইত। হামিদ, তাহার প্রাণদাতা, তাহার একান্ত স্নেহশীল চাচা, সে সামান্য প্রজা—এ সান্ত্বনা সে কেমন করিয়া লইবে?—কেমন করিয়া একান্ত সত্য প্রাণের সম্বন্ধ ভুলিয়া সে কল্পিত সমাজের সম্বন্ধকে বড় করিয়া তুলিবে? কিছুতেই তাহার প্রাণ মানিল না। অণিমা একদিন তাহার শাশুড়ীর পাকা চুল তুলিতে তুলিতে আব্দার করিয়া বলিল—'চাচা আমায় কোলে পীঠে করে' মানুষ করেছে, মুসলমান বলে' তা'র সঙ্গে আমি দেখা ক'রতে পা'ব না, এ কেমন কথা, মা?'

শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার বাপ খুড়ো যে মুসলমান তা' ত আগে জা'নতাম না, জা'নলে মুসলমানের বেটীর সঙ্গে কি আর ছেলের বিয়ে দিই?—'

অণিমাও হাসিয়া উত্তর করিল—'এখন ত জেনেছ—আর ত ফেলতে পা'রবে না।'

কথাটা বৃদ্ধার কানে বাজিল। তিনি মনে করিলেন, দিলীপ যে তাঁহার মতের অবমাননা করিয়া অণিমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে এই স্পর্দ্ধার ইঙ্গিতটা বধূর উত্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাই তিনি একটু ক্ষুণ্ণ ম্লান হাসি হাসিয়া সংক্ষেপে উত্তর করিলেন—'হুঁ'।

অণিমা বুঝিল, তাহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে; সেদিন আর কিছু বলিল না।

কিছুদিন পরে অণিমার এক পুত্র জন্মিল। অনেক দিনের পর পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে, বিশেষ ছোট বাবুর প্রথম সন্তান, আনন্দ উৎসবে প্রায় মাসখানেক কাটিল। ধুম ধাম থামিলে হামিদ 'অণিমার বেটা' দেখিতে আসিল। অনেক সইসুপারিসের পর একজন চাকর আসিয়া হামিদকে অণিমার অন্দরের প্রবেশ পথে একটা বিস্তীর্ণ চত্বরে লইয়া গেল। এই চত্বরের এক দিকে এক প্রশস্ত দরদালানে অণিমা হামিদের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। তাহার পাশে এক দাসীর কোলে তাহার ছেলে কান্নার সুর ভাঁজিতেছিল। হামিদ আসিয়াই একান্ত আগ্রহসহকারে হাত বাড়াইয়া বলিল—'কৈ দেখি মা, নানা আমার কেমন হয়েছে, একবার কোলে করি।'

দাসী ইতস্তত করিতেছিল। অণিমা তাড়াতাড়ি দাসীর কোল হইতে ছেলেকে লইয়া হামিদের কোলে দিয়া প্রগাঢ় তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিল—'চাচা, তোমার নানা বড় দুষ্টু হয়েছে।'

হামিদ অণিমার শিশু পুত্রের গলায় একগাছা গিনির মালা পরাইয়া দিয়া তাহাকে আদর করিতে করিতে বলিল —তুমি নাকি ভারি দুষ্টু হয়েছ, নানা। জমীদারের বেটা তুমি দুষ্টু হ'বে না?—ভালমানুষ হ'লে চ'লবে কেন?—চ'লবে কেন?

গিনির মালা দেখিয়া অণিমা বলিল—'আমি ভারি রাগ ক'রব, চাচা। ও সব কেন?

কেন? গরীব বলে কি আমার কোন সাধ থা'কতে নেই? তোর বেটাকে আমার কিছু দিতে নেই? স্নেহাকুল স্বরে এই কথা বলিয়া হামিদ শিশুকে কোলের উপর নাচাইয়া আদর করিতে লাগিল।

এ প্রতিবাদের তাৎপর্য্য অণিমার হৃদয়ের তলদেশে গিয়া পৌঁছিল, সে আর আপত্তি করিল না।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে অণিমা হামিদকে কাত্যায়নীর কথা, রাধানগরের কামারদের মেয়ে মেনকার কথা, গয়লা দিদির কথা, চাটুয্যে বাড়ীর কথা, ঘোষেদের ফুল বাগানের কথা, ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে এমন সময় দিলীপের এক দ্বাদশ বর্ষীয়া মামাত ভগ্নী আসিয়া বলিল—আমিনা বেগমের তলপ পড়েছে।

আমিনা হাসিয়া বলিল—আমিনা বেগম বাঁদির কথায় কান দেয় না, ফারমান্ চাই।

'ফারমান্ টারমান্ বুঝি নে বাবা, পিসীমা ডাকৃচেন, আমি বলে খালাস, বলিয়া বালিকা ত্বরিৎপদে চলিয়া গেল।

শাশুড়ীর তলপ শুনিয়া অণিমা আর বেশী দেরী করিতে সাহস করিল না, অল্পক্ষণ মধ্যে হামিদের নিকট বিদায় লইয়া শাশুড়ীর কাছে গিয়া হাজির হইল।

বধূকে দেখিয়াই শাশুড়ী একটু বাঁকা সুরে বলিলেন, 'হিঁদুর ঘরে অত অনাচার ভাল নয়, বৌ-মা। সন্ধ্যার সময় এখন ত নাওয়া হ'বে না—যাও শীগ্‌গীর যা'হোক করে' শুদ্ধ হওগে।—বিন্দি, খোকার জামাটামাগুলো ছাড়িয়ে একছিটে গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে দিগে।

অণিমা একটিও কথা কহিল না, আপন মহলের দিকে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ছোট মা, গরম জল ক'রে আ'নব—চান ক'রবে?'

অণিমা কোন উত্তর করিল না, ভাবিতে লাগিল—চাচাকে ছোঁয়া অনাচার! সে জন্যে চান করে' শুদ্ধ হ'তে হ'বে? এত বড় মিথ্যে আমি কি করে' স্বীকার করে' নেব? চাচার এত বড় অপমান আমি কি করে' ক'রব?

কিন্তু ভাবিয়া অণিমা কোন উপায় দেখিল না। সে স্পষ্ট বুঝিল, জীবনের সমস্ত স্বাধীনতার মূল্যে, প্রাণের অন্তরতম সত্যের বিনিময়ে, সে এই অগাধ সুখ ঐশ্বর্য্য ক্রয় করিয়াছে। ভাবিল, বুঝি সব হিন্দুরমণীই এইরূপ করে। কিন্তু নিজের অস্তিত্ব এমন করিয়া লোপ করিয়া বা গোপন করিয়া হিন্দুরমণীর যে যশ, অণিমার নিকট তাহা মৃত্যুর নামান্তর বা তদপেক্ষাও হীন মিথ্যাচার বলিয়া বোধ হইল।

সে রাত্রে অণিমা স্নান করিল না, কাপড় ছাড়িল না, কিছু খাইল না, মেজের উপর একখানা মাদুর পাতিয়া শুইয়া রাত্রি কাটাইল।

অণিমা ভাবিয়াছিল, মিথ্যাচারই যদি জীবনের সম্বল করিতে হয়, শাশুড়ীর সঙ্গে বা সংসারের আর সকলের

সঙ্গে মিথ্যাচার করিতে পারে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে কি করিয়া করিবে? তাই ভূমিশয্যায় আশ্রয় লইয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেই রাত্রেই স্বামীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিবে। কিন্তু দিলীপ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া যখন নিতান্ত বিস্ময় সহকারে প্রশ্ন করিল, 'এ কি এ! মাটীতে? এবং অণিমাকে কোন উত্তর দিবার ফুরসৎ না দিয়াই তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইয়া বলিল, আধঘণ্টা দেরী হয়েছে বলে কি বেগম-সাহেবার এত রাগ?' তখন অণিমা তাড়াতাড়ি একটু সরিয়া গিয়া উত্তর করিল—না, না, রাগ নয়—আমায় ছুঁয়ো না, চাচা এসেছিলেন কি না, তাই খোকাকে 'তাঁর কোলে দিতে হয়েছিল—তাই।

দিলীপ আর পীড়াপীড়ি করিল না, খাটের উপর গিয়া বসিল এবং অণেকক্ষণ নানা কথা ও গল্পের পর ঘুমাইয়া পড়িল।

অণিমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। সে ইচ্ছা করিয়াই কিছু বলিল না। তাহার সাহসে কুলাইল না। তাহার ভয় হইল, স্বামীরও যদি মুসলমান বিদ্বেষ থাকে? তিনিও যদি তাহার অন্তরের বেদনা না বোঝেন?—তাহার চাচার স্নেহের প্রতি সমুচিত সমাদর না দেখান? সে ভাবিল—এই ত আমি চাচাকে ছুঁইচি শুনেই ত সরে' গেলেন। আমি জেদ্ করলে হয় ত আমার মতে মত দিতে পারেন। কিন্তু আমার জন্যে সংসার অশান্তিময় ক'রে তু'লব?—মায়ে ছেলেয় বিচ্ছেদ ঘটাব?'

অণিমা সঙ্কল্প করিল, সে আপন হৃদয় উপাড়িয়া ফেলিবে, হামিদের সঙ্গে আর দেখা করিবে না।

ক্রমে খোকার অন্নপ্রাশনের দিন নিকট হইয়া আসিল। মাসখানেক আগে থেকেই জমীদার বাড়ীতে আয়োজনের ধূম পড়িয়া গেল। পনর দিন পূর্ব্বে শচীন্দ্র থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি বায়না করা, গহনা গড়ান ও বাজার করার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় গেলেন।

ইত্যবসরে জমিদারীর মধ্যে এক অভিনব বিভ্রাট ঘটিল। কোথা হইতে এক মৌলভী আসিয়া রহমতপুরের মুসলমান প্রজাদের নাচাইয়া ঈদের দিন এক গোহত্যা করিল। হামিদ রহমতপুরের মুসলমানগণের প্রধান মুখপাত্র। হামিদ এই গোহত্যার প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি করিয়া মুসলমান প্রজাদের অপ্রিয় ভাজন হইল। স্থানীয় হিন্দুগণ গোহত্যা নিবারণের চেষ্টা করায় হিন্দু-মুসমানের মধ্যে ছোট রকমের একটা দাঙ্গা ও তাহার ফলে কয়েকজন হিন্দু প্রজা অল্প বিস্তর জখম হইল।

মহেশপুরে এ সংবাদ পৌছিলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। শচীন্দ্র কলিকাতায়, ম্যানেজার বিব্রত হইয়া পড়িল। পাছে সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে পড়ে এই ভয়ে ম্যানেজার দিলীপকে সব কথা জানাইল। গোহত্যার কথা শুনিয়া দিলীপ আগুন হইয়া গেল। সে গোহত্যাকারী মুসলমান প্রজাদের উপযুক্ত শাস্তি দিবার হুকুম দিল। ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ দশজন লাঠিয়াল বরকন্দাজ রহমতপুরে পাঠাইয়া গোহত্যাকারীগণকে তলব করিল।

হামিদের সৌভাগ্য ও জমীদার বাড়ীতে প্রতিপত্তির জন্য রহমতপুরের হিন্দু প্রজাদের তাহার উপর বড় ঈর্ষা ছিল। জমীদারের বরকন্দাজগণ গোহত্যার আসামী গ্রেপ্তার করিতে আসিলে হিন্দুগণ সমস্বরে হামিদকে দলপতি বলিয়া ধরাইয়া দিল। মুসলমানগণ হামিদের উপর বিরক্ত হইয়াছিল, তাহারা কোন আপত্তি করিল না।

সেইদিন বৈকালে বার চৌদ্দ জন মুসলমান প্রজার সঙ্গে হামিদ বন্ধন অবস্থায় মহেশপুর জমীদার বাড়ীতে আনীত হইল। তাহাদের সঙ্গে বহু হিন্দু সাক্ষী দিবার জন্য আসিল। দিলীপের সম্মুখে ম্যানেজার সাক্ষী সাবুদ লইয়া হামিদকে প্রধান অপরাধী সাব্যস্ত করিল। কিন্তু হামিদ দৃঢ়স্বরে অপরাধ অস্বীকার করিল। দিলীপ হামিদের নাম বিলক্ষণ জানিত। স্ত্রীর মুখে শুনিয়া তাহার চরিত্র সম্বন্ধেও দিলীপের ধারণা ভালই ছিল কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে অপরাধ সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা সাফাই গাহিতেছে ও অবাধ্যতা দেখাইতেছে মনে করিয়া দিলীপের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। দিলীপ রাগিয়া হুকুম দিল—'বেটা আসল শয়তান—ওকে থামে বেঁধে জুতা লাগাও।'

অমনই চারিজন যমদূতের মত বরকন্দাজ আসিয়া

হামিদকে পীঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া পায়ের নাগরা জুতা খুলিয়া তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিল। অসহ্য যাতনায় হামিদ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। তাহার আর্ত্তস্বরে সমস্ত বাড়ী ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ পাগলিনীর ন্যায় একজন যুবতী রমণী বহুজনাকীর্ণ সেই চত্বরের ভিড় ঠেলিয়া তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া—তোমায় মেরে ফেল্লে চাচা, বলিয়া কোমল বাহু দ্বারা হামিদকে জড়াইয়া ধরিল। নিষ্ঠুর বরকন্দাজগণ—'হট্ যা' মাগী,—বলিয়া উন্মত্তভাবে লাঠির গুঁতা দিয়া তাহাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিল।

'কি করলি, আমিনা-মা, আমার জন্যে প্রাণ হারালি? বলিয়া হামিদ উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া গিয়া ভূতলশায়িনী আমিনার মস্তক কোলের উপর তুলিয়া লইল। অন্দর মহল হইতে কয়েকজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া সর্ব্বনাশ হয়েছে—ছোটমাকে মেরে ফেলেছে—ইত্যাদি বলিয়া উচ্চ কোলাহল করিয়া উঠিল। ভীত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বরকন্দাজগণ আসামী ছাড়িয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্থির সংজ্ঞাহীন ভাবে যে যেখানে ছিল, দাঁড়াইয়া রহিল। এক নিমিষে জনতার উত্তেজনা থামিয়া গেল; আসামী, সাক্ষী, দর্শক সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তব্ধ, পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কোলাহলের শব্দে দিলীপ, ম্যানেজার ও অন্যান্য বহু কর্ম্মচারী কাছারী হইতে বাহির হইয়া আসিল।

স্ত্রীকে সেই অবস্থায় দেখিয়া দিলীপ বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া মোটরে করিয়া ডাক্তার লইয়া আসিল! কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছিল, ডাক্তারের চেষ্টা বিফল হইল। অনেকক্ষণ পরে একটীবারমাত্র চক্ষু উন্মিলিত করিয়া অমিনা হামিদের মুখপানে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এবং কষ্টে—'তোমার কোল থেকে আর নামিও না চাচা' —বলিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূতা হইল।

পুরাতনী

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

বাংলা সৎসাহিত্যের সৃষ্টিকাল অবধিই রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দুই দলের দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে—একদল ভাষার আভিজাত্য সম্মান (অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী পথে চালাইতে) রক্ষা করিতে চান, অপর দল ইহাকে সম্যক ভাবপ্রকাশের উপযোগী সরল ও সাধারণের বোধ-গম্য করিয়া ভাষার প্রসারতা বৃদ্ধি করিতে চান।

আজকাল আমরা যে বিদ্যাসাগরীয় বাংলাকে অনুস্বার বিসর্গহীন সংস্কৃত পর্য্যায়ে ফেলিয়া থাকি, তিনি যখন প্রথম তাঁহার গ্রন্থ বেতালপঞ্চবিংশতির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিলেন তখন তাহাতে "উত্তালতরঙ্গমালা-সঙ্কুল উৎফুল্লফেননিচয়চুম্বিতভয়ঙ্করতিমি-মকরনক্রচক্র-ভীষণ স্রোতস্বতীপতিপ্রবাহ" ইত্যাদি বহু সমাসবহুল পদ ব্যবহার করিয়াও পণ্ডিতদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। তাঁহারা সমস্বরে বলিতে লাগিলেন, বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে নষ্ট করিলেন, তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা হইল না।

আবার বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার অমর লেখনী ধারণ করিয়া দুর্গেশনন্দিনী ও পর পর উপন্যাসগুলি বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহার ভাষার নবীনতা ও বর্ণনার রীতি দেখিয়া নব্যদল যেমন তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িল তেমনি রক্ষণশীলদল এমন কি "সোমপ্রকাশ" পর্য্যন্ত —ব্যঙ্গ করিয়া বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারীগণের নাম রাখিলেন 'শবপোড়া ও মড়াদাহের দল'। আমরা আজ কাল 'আমিত্ব' শব্দ কেমন সাধু বাংলা মনে করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যখন এই 'আমিত্ব' শব্দ প্রথমে ব্যবহার করিয়াছিলেন—১২৬৫ সনের নববর্ষের "প্রভাকরে"—তখন তাঁহাকে কত জবাবদিহিই না করিতে হইয়াছিল! 'আমি' শব্দ চলতি কথা তাহার সহিত সংস্কৃত ব্যকরণের 'ত্ব' প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে আক্রমণ করেন। গুপ্ত কবি এ সম্বন্ধে যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন তাহা তুলিয়া দিলাম। ইহা পুরাতনে অম্ল-মধুর মত—কিঞ্চিৎ ঝাঁঝাল হইলেও যথেষ্ট উপভোগ্য।

"আপামর সাধারণজনগণের যাদৃশ শব্দ প্রয়োগ আশু বোধ হইয়া সুখ-জনক হয়, আমরা প্রায় তাদৃশ শব্দই প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ দোষরূপে দৃষ্ট হইলেও তাহা দোষের মধ্যে কদাচ গণিত হইতে পারে না। "অহন্ত্বা" শব্দ প্রয়োগ করিলেই উত্তম হইত, ইহা আঁমাদের বিলক্ষণ বোধ আছে, কিন্তু ঐ শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রায় বিষয়ী ব্যক্তি মাত্রেরি কদাচ বোধ হইতে পারে না; তাহা হইলে লেখার সুরস কখনই হইল না, অতএব "অহন্ত্বা" শব্দ পরিত্যাগ করিয়া আমরা 'অহং' শব্দের অনুযায়ী এতদ্দেশে প্রচলিত যে "আমি" শব্দ তাহার সহিত 'ত্ব' প্রত্যয়ের যোগ করিয়া লিখিয়াছি। ইহাতে অনায়াসে সকলেরি বোধ হইবে। যদি বল "ব্যাকরণে এমত কোন্ সূত্র আছে যে ভাষা শব্দের উত্তর প্রত্যয় হয় উত্তর, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু যেমন অনুকরণ শব্দ ঝম-ঝম, ঘুর-ঘুর মক-মক, ইহারা সংস্কৃত শব্দ কদাচ নহে তথাপি ইহাতে দেখুন—

প্রশ্চাৎ ঝম্ ঝমায়তে, কণ্ঠো ঘুর ঘুরায়তে, ভেকো

মক্ মকায়তে ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যাইতেছে সেইরূপ অস্মদ্বোধক অনুকরণ একটি 'আমি' শব্দ আছে তাহার উত্তর 'ত্ব' প্রত্যয় করিয়া "আমিত্ব" পদ অবশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, অতএব সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ সূত্রং—

সর্ব্বমনুকরণে বা অনুকরণে সর্ব্বং বা স্যাৎ—অর্থাৎ অনুকরণে সকল প্রত্যয় বিকল্পে হয়।

বস্তুতস্তু পূর্ব্ব প্রাচীন ইদানীন্তন কিঞ্চিৎ-পূর্ব্ব-পণ্ডিতেরা এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে আমরাও সেইরূপ লিখিয়াছি। পূর্ব্ব পণ্ডিতেরাও এই অভিপ্রায়ে ভাষা শব্দের সহিত ব্যাকরণ প্রত্যয়ের যোগ করিয়াছেন, যথা—কালিদাস কৃত গৌড়ীয় ভাষা মিশ্র সংস্কৃত শব্দ দ্বারা বিরচিত কোকিলাষ্টক—

গতে গোপীনাথে মধুপুরে মগো বুক বিদরে
কদম্বানাং বৃন্দং মরি মরমভেদং জনয়তি।
পুরস্তাৎ বাসন্তী যমবুহিন বাদী দহতি
মাং কুহুকণ্ঠিনাদঃ কি হল্যো পরমাদঃ প্রিয় সখি॥

এই স্থলে "মরমভেদ" শব্দ সংস্কৃত নহে, তাহাতে "অম্" প্রত্যয় কি প্রকারে হইল—এবং যৎকিঞ্চিৎ প্রাচীন কবি চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ দৃষ্টান্তে কলিকাতা বর্ণনে লেখেন যথা—আয়নাল্ঠনভূরিভূষিবালাখানাভিরাভূষিতে।

এই স্থলে বালাখানা শব্দের উত্তর 'ভিস্' প্রত্যয় কি প্রকারে হইল? অতএব সর্ব্ব সাধারণগণের সুখবোধের কারণ এরূপ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বাচর্য্যেরা করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে—আমরাও করিয়াছি, তাহাদের দোষের উদ্ভাবন কদাচ হইতে পারে না।"

* * *

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সদ্ভাবশতকের কবিরূপে জনসমাজে পরিচিত হওয়ার পূর্ব্বে 'সংবাদ প্রভাকরের' ঢাকাস্থ সংবাদ দাতা হইবার আবেদন করিয়া যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাঁহার গদ্য রচনার নমুনাস্বরূপ ১২৬৫ সনের ৩০শে বৈশাখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে সেই পত্রখানি আমূল প্রকাশিত করিলাম। ঈশ্বর গুপ্ত এই পত্রখানি "অতি সমাদরপূর্ব্বক অবিকল প্রকটন" করিয়াছিলেন।

"প্রিয় সম্পাদক মহাশয়! আপনকার জগদ্ধান্তহর প্রভাকর পত্রে এই বিস্তীর্ণ ধরাতলের প্রায় সর্ব্বস্থানেরই অভিনব সম্বাদপুঞ্জ প্রকটিত হইয়া থাকে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই ঢাকানগরের সাময়িক ঘটনাবলী প্রায় কখন কিছুই প্রকাশ হয় না। ভরসা ছিল, অধুনা এস্থলে যে সকল কৃতবিদ্য মহাশয়েরা সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই সময়ে সময়ে স্থানীয় সমাচারাদি প্রভাকর অথবা তাদৃশ কোনো সম্রান্ত সম্বাদপত্রে প্রকাশ করিয়া আমাদিগের চিত্তক্ষোভ দূরীভূত করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ (তুচ্ছ করিয়াই হউক, অথবা আলস্য ক্রমেই হউক) ভ্রমেও তাঁহারা অস্মদাদির মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগি হইলেন না। বোধ-করি এবম্বিধ সদনুষ্ঠানে তাঁহারদিগের তাদৃশ অনুরাগ না থাকিতে পারে। যাহাহউক, আমি আর চিত্তাতাপ সহ্য করিতে পারি না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, এই অবধি এখানে মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইবে যথাসাধ্য আপনকার নিকট লিখিয়া পাঠাইব। আপনি অনুকম্পা পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাহা শুদ্ধ করত স্বীয় পত্রিকপার্শ্বে উদিত করিলে চিরবাধিত হইব। যদিচ মদ্বিধ রচনাশক্তিপরিশূন্য জনের এবম্বিধ গুরুতর কার্য্য-নিষ্পাদন করা, পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনবৎ নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু কেবল ভবদীয় অসাধারণ করুণার প্রতিই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া ঈদৃশ অসমসাহসিকাবলম্বন করিয়াছি।

মহাশয়! অদ্য যে কয়েকটী সম্বাদ নিম্নভাগে লেখা গেল প্রকাশযোগ্য হইলে প্রকাশ করিবেন।—

তণ্ডুলের বাজার পূর্ব্বে যেরূপ গরম ছিল তদপেক্ষা এক্ষণে অনেক নরম হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে টাকায় ১৫।১৬ সেরের অধিক তণ্ডুল পাওয়া যাইত না, এক্ষণে কিঞ্চিৎ মোটা রকমের ২০ সের পাওয়া যায়।

কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত এস্থানে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হইতেছে। আর কিছুদিন এই প্রকার থাকিলে শস্যাদির বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

অত্রস্থ আদালতের কতিপয় কর্ম্মচারী একত্রিত হইয়া "ব্যবস্থার্ণব" নামক একটি স্কুল স্থাপনা করিয়াছেন। চিরস্থায়ী হইলে এতদ্বারা এ প্রদেশের ভূরি উপকারের সম্ভাবনা।

নবাবপুর পুলের ধারে চিত্তোৎকর্ষবিধায়িনী নাম্নী একটি অভিনব সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে।

কতিপয় হিতৈষী ব্যক্তি এখানে একটি দাতব্যালয় স্থাপনের অনুষ্ঠান করিতেছেন। প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর তাঁহাদিগের করুণাময়ী আশা শীঘ্রই সফলা করুন।

সম্প্রতি এখানে রোগের, অথবা অন্যবিধ উৎপাতের প্রাদুর্ভাব নাই।

একান্ত ভবদীয়—
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান মহিলা

মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী

জগতের সর্ব্বত্রই এখন নারীশিক্ষা ও নারী-জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। কোন দেশ বা জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে ইহা যে অতীব শুভলক্ষণ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বিশ্বের সভ্যদেশমাত্রই এখন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, নারী ও পুরুষের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত কোন মানব সমাজেরই উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ মাতৃজাতিকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিলে তাহাদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতির চেষ্টা না করিলে আমরা কখনো উন্নতি ও সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিব না। নারীজাতির উন্নতির সঙ্গে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক সুখশান্তি, উন্নতি ও কল্যাণ অতি ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে মোস্‌লেম নারীদের শিক্ষা ও সর্ব্ববিধ মঙ্গলের জন্য আজ পর্য্যন্ত তেমন কোন চেষ্টা হয় নাই।

ইস্‌লাম নারীজাতিকে যে উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছে, * * সেই মহান, উদার শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া এককালে আরব, মিসর, পারস্য, মরক্কো, স্পেন, তুরস্ক ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি মোস্‌লেম অধ্যুষিত দেশসমূহে, কি শিক্ষায়, কি কবিপ্রতিভায়, কি রণনৈপুণ্যে, কি শৌর্য্যবীর্য্যে, কি, শাসন-দণ্ড পরিচালনায়, কি ধর্ম্মসাধনায় মোস্‌লেম নারীগণ যে অত্যুচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন, মোস্‌লেম-জগতের ইতিহাস আজো তাহা সগৌরবে বিঘোষিত করিতেছে। বীরাঙ্গনা খাওলা, লায়লা ও চাঁদসোলতানা; তাপসী রাবেয়া, ধর্ম্মশীলা বিবি আয়েশা সিদ্দিকা, ফাতেমা জোহরা; সৎকর্ম্মশীলা জোবেদা, কবি জয়নব, হাম্‌দা, জেবুন্নেসা ও গুলবদন; অতুলনীয়া বুদ্ধিমতী ও রাজনীতিকা রিজিয়া, নূরজাহান প্রভৃতি অসংখ্য কীর্ত্তিমালাবিভূষিতা মোস্‌লেম মহিলাকুলের নাম কে না জানেন? বর্ত্তমান যুগেও জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষামন্ত্রী তুরস্কের খালেদা এদিব খানম্ প্রভৃতি, মিসরের বেগম সুফিয়া জগলুল, কুমারী জাকিয়া, আবদুল হামেদ সোলেমান, আফগান আমীর-জননী, বোম্বাইর আতিয়া বেগম, বেগম হাসরত মোহানী, আলী-জননী বিআম্মা, ভূপালের বেগম সাহেবা প্রভৃতি বিদুষী মহিলাদের নাম সগৌরবে উল্লেখ করা যায়। বস্তুতঃ কোর্‌আন্ শরিফ ও হাদিসের মহান শিক্ষার দিক্ হইতে চিন্তা করিলে মোস্‌লেম সমাজে নারী-সমস্যা বলিয়া কিছু বিদ্যমান নাই ও থাকিতে পারে না। বর্ত্তমানে মোস্‌লেম নারীদের অনুন্নত অবস্থার জন্য ইস্‌লাম ঘুণাক্ষরেও দায়ী নয়; বরং ইস্‌লামের অনুশাসন না মানার ফলেই মোস্‌লেম জাতির এমন অধঃপতন ঘটিয়াছে। যাঁহারা নারী জাতি সম্পর্কিত ইস্‌লামিক অনুশাসন ও উপদেশাবলী অবগত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, ইস্‌লাম কদাপি রমণীদের জন্য অমন হীন সংকীর্ণ বিধান করে নাই। পক্ষান্তরে আমাদিগকে সেই প্রাথমিক যুগের মুসলমানদেরই ন্যায় এখনো ইস্‌লামের অনুশাসন মানিয়াই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে!

নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, মুসলমানগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হইয়াও বিজাতীয় কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার দরুণ বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই করে নাই। ইহা যে খুবই

দুর্লক্ষণ এবং ইহাতে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগমন যে অনেকটা ব্যহত ও অভিশপ্ত হইয়া রহিবে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই। বাঙ্গালী মুসলমান যদি শিক্ষা ও সভ্যতার সব দিক দিয়া উন্নতি করিতে চান—একটা সুসভ্য জাতিরূপে বাঁচিয়া থাকিতে চান, তবে নারীজাতির উন্নতি ও শিক্ষার প্রতি তাহাদের বিশেষ নজর প্রদান করিতে হইবে।

এখন আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া যাউক। যে যে কারণে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিকের সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয় তাহা সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই অবগত আছেন। তবুও ইহার কারণ প্রদর্শন করিতে গেলে সকলেই একবাক্যে বলিবেন শিক্ষার অভাব, উর্দ্দু বনাম বাঙ্গালা সমস্যা, দারিদ্র্য ও মাতৃভাষার সেবায় শোচনীয় ঔদাসীন্যই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যের অমন দুরবস্থা। সুতরাং এরূপ সমাজের নারীদের মধ্যে লেখিকার সংখ্যা যে আরও কত অল্প হইতে পারে তাহা আর না বলিলেও চলে। ঐ সকল কারণ পরম্পরায় এবং বাল্যবিবাহ ও পর্দ্দার এস্‌লাম-বিরুদ্ধ কড়াকড়ির দরুণ বাঙ্গালায় মুস্‌লিম মহিলাদের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রগতি অতি ধীরমন্থর ও অনুল্লেখ্য হইয়া রহিয়াছে। যে জাতির পুরুষদের মধ্যেই অতটা রক্ষণশীলতা এবং শিক্ষা ও সাহিত্যসেবায় ঔদাসীন্য বিদ্যমান, সে জাতির নারীসমাজের অবস্থা যে কত শোচনীয় ও অনুন্নত হইতে পারে তাহা সুধীমাত্রেই বুঝিতে পারেন। ইহা সত্বেও যে সকল দূরদর্শী সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ পরিবারের মেয়েরা পুরুষদের সাহায্যে ও উৎসাহে এবং নিজেদের চেষ্টা যত্নে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই সকল শ্রদ্ধেয়া বিদুষী মহিলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বাঙ্গালার মুস্‌লিম লেখিকাদের বিবরণ লিখিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা মিসেস্‌ আর, এস্‌ হোসেন সাহেবার কথা স্মরণ হয়। প্রাচীন কালে পুঁথি-সাহিত্য রচনা করিয়া কোনও মুস্‌লিম মহিলা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন কিনা আমরা তাহা অবগত নহি। তবে আধুনিক বঙ্গসাহিত্য সেবায় যে কয়জন মুসলিম মহিলা সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বস্তুতঃ পরম-শ্রদ্ধেয়া মিসেস্‌ আর, এস্‌ হোসেন সাহেবাই প্রথম। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন মুস্‌লিম মহিলা বঙ্গসাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দেন নাই। ইনিই মুসলমান লেখিকাদের গুর্ব্বী ও পথপ্রদর্শিকা। বিবিধ সামাজিক ও পারিবারিক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইনি বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চার যে প্রশস্ত, সুগম পথ রচনা করিয়া দিয়াছেন, সেই পথ ধরিয়াই বাঙ্গালার প্রতিভাশালিনী মুসলমান মহিলাবৃন্দ বঙ্গভাষার সেবায় অগ্রসর হইয়াছেন; এ হিসাবে বাঙ্গালার মুসলমান সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহার নাম যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইঁহার রচিত প্রথম গ্রন্থ 'মতিচুর'। ইহা দুই খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড বহুবৎসর পূর্ব্বে বাহির হইয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ড কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইয়াছে। 'মতিচুর' গ্রন্থখানা পাঠে ইঁহার সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া প্রবীন সাহিত্যিক, 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রভৃতি মনীষিগণ এক সময়ে ইঁহার প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইনি "পদ্মরাগ" নামে একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থখানাও সাহিত্যিক ও পাঠকবর্গের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। ইঁহার অন্যতম গ্রন্থ Sultana's Dream; ইহা ইংরেজী ভাষায় লিখিত। এই সব গ্রন্থে লেখিকার রচনাশক্তি ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার লেখাগুলির মধ্যে ইস্‌লামানুমোদিত নারীস্বাধীনতার ভাব এতটা তেজস্বীতার সহিত প্রকাশ পাইয়াছে যে, অনেক হিন্দু লেখিকার লেখার মধ্যেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। নূতন পুরাতন বহু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় মিসেস আর, এস, হোসেন সাহেবার লেখা প্রকাশিত হইয়াছে।

এ ছাড়া তাঁহার আর এক অক্ষয়কীর্ত্তি তাঁহার স্বামী পর-লোকগত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সাখাওয়াত হোসেন সাহেবের নামে স্থাপিত কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত "সাখাওয়াত মেমোরিয়েল গার্ল স্কুল"। ইহাতে কলিকাতা

ও মফঃস্বলের বহু শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা বিদ্যার্জ্জন করিয়া ধন্যা হইতেছেন। সম্প্রতি উক্ত মহীয়সী মহিলা আরও কতিপয় উদ্যোক্তৃগণের সমবায়ে উহাকে একটি উচ্চইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছেন।

পরলোকগতা আফজালুন্নেসা সাহেবা "রত্নাধার" নামে একখানা স্কুলপাঠ্য বই লিখিয়াছিলেন। উহা বহুকাল বাঙ্গালাদেশের স্কুলসমূহে পাঠ্য ছিল। উহাতে আফজালুন্নেসা সাহেবার বঙ্গভাষানুরাগ পরিস্ফুট।

মরহুমা খায়রুন্নেসা খাতুন সাহেবা "সতীর পতিভক্তি" নামে একখানা উপাদেয় নারী-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইনি সিরাজগঞ্জ হোসেনপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁহার "সতীর পতিভক্তি" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার রচনাশক্তি ও বঙ্গভাষানুরাগের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি তদীয় পূজনীয় স্বামী মৌঃ আসিরুদ্দিন সাহেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ ও উৎসাহিত হইয়া এই গ্রন্থখানা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থখানা যে মুসলমান সমাজে কতটা আদৃত হইয়াছে, তাহা উহার চতুর্থ সংস্করণেই বুঝিতে পারা যায়। গ্রন্থকর্ত্রী সাহেবা অকালে পরলোক গমন করায়, আমরা তাঁহার নিকট হইতে আর কোন গ্রন্থ পাইতে পারি নাই।

মিসেস্ সারা তৈফুর সাহেবা মুসলমান মহিলাদের মধ্যে অন্যতম লেখিকা। ইনি 'স্বর্গের জ্যোতিঃ' নাম দিয়া মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সুন্দর জীবনী লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া অনেকেই লেখিকার ভাষাজ্ঞান ও রচনা-পরিপাট্যের সুখ্যাতি করিয়াছেন। এ ছাড়া তিনি অধুনালুপ্ত "বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়" কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয়া সাজেদা খাতুন সাহেবার কবিতার সহিত * * পাঠক পাঠিকা মাত্রেই সুপরিচিত আছেন, আশা করি। বোধ হয় বাঙ্গালার মুস্‌লিম লেখিকাদের মধ্যে ইনিই একমাত্র মহিলাকবি। ইঁহার লেখনী জয়যুক্ত হউক।

মিসেস এম, রহমান, সৌদামিনী বেগম, কাসেমা খাতুন সাহেবা প্রভৃতি মহিলাগণও 'মোহাম্মদী,' 'আল্-এস্‌লাম' ও 'সওগাতে' সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গভাষানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা ইঁহাদের নিকট হইতে আরও অধিক কিছু আশা করি।

এখন এমন একজন মহিলার নাম করিব, যিনি লেখার চেয়ে শিল্পপ্রতিভার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি খুলনা জিলার অন্তর্গত দৌলতপুরের মোসাম্মাত রিজিয়া খাতুন সাহেবা। এই বিদুষী মহিলা ও তাঁহার ভগিনী রহিমা খাতুন সাহেবার বহুমুখিনী প্রতিভায় সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন। ইংরেজী-বাঙ্গালা বহু সংবাদপত্রই মুক্তকণ্ঠে ইঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। অঙ্কন, শ্রমশিল্প, প্রাথমিক চিকিৎসা (first aid) ও গৃহধাত্রী বিদ্যায় (home nursing) ইঁহারা প্রথমশ্রেণীর পদক ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের এই অসাধারণ পারদর্শিতা দর্শনে আমাদের প্রাণে বঙ্গীয় মুস্‌লিম নারীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আশার সঞ্চার হইয়াছে।

রিজিয়া খাতুন সাহেবার বঙ্গভাষার প্রতিও যে যথেষ্ট অনুরাগ আছে, তাহার পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইনি 'ইস্‌লামদর্শন,' 'শরিৎ, মোসলেম দর্পণ,' 'বঙ্গলক্ষ্মী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং এখনো লিখিতেছেন। আশা করি এ ভাবে বঙ্গভাষায় সাধনা করিয়া অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সাহিত্যেও ইনি শক্তিমত্তার পরিচয় দিবেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কঠিন নিগড় ও ভয়ভীতি উপেক্ষা করিয়া যে দূরদর্শী ও মহাপ্রাণ-পুরুষ মুরুব্বীগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও উৎসাহে এই মহিলাদ্বয় বিবিধ শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, আমরা আজ এই সুযোগে প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের সৎসাহস ও সমাজহিতৈষণার গুণকীর্ত্তন করিতেছি।

চট্টগ্রামের সুলেখিকা শামসুন নাহার সাহেবার নাম অধুনা বাঙ্গালার সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত "পুণ্যময়ী" গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া তাঁহার ভাষাজ্ঞান্ ও রচনাশক্তি দর্শনে অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিক ও পত্রিকা সম্পাদক, তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। 'পুণ্যময়ীতে' বিবি ফাতেমা আয়েশা, খোদায়জা, রহিমা,

রাবিয়া, আসিয়া, হাজেরা ও সারা এই আটজন পরম ধার্ম্মিক, আদর্শ সতীসাধ্বী মহীয়সী মহিলার জীবনাখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সব জগন্মান্যা আদর্শ রমণীর জীবনালেখ্য রচনায় একদিকে যেমন তাঁহার রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি অন্যদিকে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ-তারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃত ভক্তের ন্যায়ই তিনি প্রাণ ঢালিয়া ঐ সকল পুণ্যকাহিনী লিখিয়াছেন। "প্রতিভার চঞ্চল দুলাল" কবি নজরুল ইস্‌লামের প্রশস্তি ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, বহুভাষাবিদ্ মনীষী মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লা এম, এ, বি, এল সাহেবের ভূমিকা বক্ষে ধারণ করিয়া 'পুণ্যময়ী' আরও গৌরবান্বিতা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু পত্র-পত্রিকায়ও শামসুন নাহার সাহেবার সারগর্ভ সন্দর্ভাদি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

সর্ব্বশেষ যে বিদুষী মহিলার নাম করিব, তিনি সাহিত্য প্রতিভায় শুধু মুসলমান মহিলাদের মধ্যে কেন, মুসলমান পুরুষ সাহি্যকদের মধ্যেও একজন শ্রেষ্ঠ লেখিকা। ইনি শ্রীরামপুরের নূরন্নেসা খাতুন সাহেবা। যে কয়জন মুষ্টিমেয় মুসলমান লেখিকা উপন্যাস রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, নূরন্নেসা সাহেবা তাঁহাদের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। তাঁহার রচিত উপন্যাসসমূহের নাম "স্বপ্নাদৃষ্টা," "জানকীবাঈ" ও "আত্মদান"। ঐ উপন্যাসগুলি পাঠ করিলে, তাঁহার লিপিচাতুর্য্য ও কল্পনা-শক্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার লেখা বেশ সরল, প্রাঞ্জল ও উপন্যাসোচিত। আশা ও আনন্দের বিষয় এই যে, শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নূরন্নেসা সাহেবার লেখনী এখানেই বিশ্রাম লাভ করে নাই, তিনি আরও গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার "মোস্‌লেম বিক্রম ও বঙ্গে মোস্‌লেম রাজত্ব" নামক একখানা ঐতি-হাসিক গ্রন্থ মোহাম্মদী প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে।

এই মুস্‌লিম মহিলার সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া "নিখিল-ভারত-সাহিত্য সঙ্ঘ" তাঁহাকে 'বিদ্যাবিনোদিনী" ও "সাহিত্য সরস্বতী" উপাধি প্রদান করিয়া গুণের উপযুক্ত সমাদর করিয়াছেন।

বিগত ১৩৩১ সনে মুনশীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশন হয়; সেই অধিবেশনে নূরন্নেসা সাহেবার "বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে প্রথম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। সম্মিলনের সভাপতি পরলোকগত নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয় লেখিকার ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তদীয় অভিভাষণে অতীব আশান্বিতচিত্তে ও পরম প্রীতিভরে যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, * * এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "কিছুদিন হইতে বঙ্গভারতীয় মন্দির দ্বারে কতিপয় মুসলমান সাহিত্যিককে পূজোপকরণ লইয়া উপস্থিত হইতে দেখা যাইতেছে, ইহা আমাদের সাহিত্যের পুষ্টিপক্ষে অতীব শুভলক্ষণ, আরও আনন্দের কথা যে, সেই সকল সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে আমরা দুই চারিজন মহিলারও সন্দর্শন লাভ করিতেছি। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা শ্রীরামপুর নিবাসিনী নূরন্নেসা খাতুন এই সম্মেলনে তাঁহার রচিত একটি নিবন্ধ পাঠাইয়াছেন, সমবেত সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে অবশ্যই তাহা পঠিত হইবে। কৃপাপূর্ব্বক তিনি তাঁহার মুদ্রিত প্রবন্ধের একখণ্ড আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য কথাটি পাঠ করিয়া আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তিনি কহিয়াছেন, 'যদিও আমাদের বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের আদিপুরুষগণ আরব, বাগ্‌দাদ বা পারস্য দেশ হইতে পূর্ব্বে এ দেশে আসিয়া-ছিলেন, কিন্তু এই বঙ্গের ফল, জল, আকাশ-বাতাস, ওষধি-বনস্পতি প্রভৃতির সহিত যুগযুগান্তের ধরিয়া আমরা পরিচিত। এই বঙ্গের বাণীই আমাদের জন্মদিন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষের দিন পর্য্যন্ত নিয়ত কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকারে আমরা বঙ্গমাতারই পুত্র কন্যা; কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ের এমন জন অনেক আছেন, যাঁহারা পরম সত্যকে অস্বীকার করেন। পঞ্চনদ তীরবাসী হিন্দু-মুসলমান সকলেই পাঞ্জাবী; বিহারের সকলেই বিহারী, কিন্তু বঙ্গজননীর সন্তান যাঁহারা তাঁহারা কেবলমাত্র ধর্ম্মান্তরের জন্যই বাঙ্গালী নহেন, ইহার ন্যায় আশ্চর্য্যজনক অযৌক্তিক কথা আর আছে কি না তাহা জানি না। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের জননী জায়া দুহিতাগণের

মনে বঙ্গজননী ও বঙ্গবাণীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তি যদি এমনই ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে থাকে, তবে তাহা অচিরে কি মঙ্গল ও কল্যাণকে যে আমাদের করায়ত্ত করিয়া দিবে,তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গবাণীর অভ্রভেদী মণিমন্দির তাহার তুঙ্গশির উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবে এবং মন্দির চূড়াস্থ কেতনের চীনাংশুক শোভা দেশদেশান্তরবাসী বিস্মিত নেত্রে দেখিতে থাকিবে।" যে মহীয়সী মোস্‌লেম মহিলার মনে এই মহান্ সত্য স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি বঙ্গদেশ-বাসী সমাজ ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নমস্যা এবং হৃদয়ের বলে তিনি এই পরম ও চরম সত্য ও সত্যবাণী উচ্চারণ করিবার সৎসাহস লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সকলেরই মস্তক গভীর শ্রদ্ধাভারে অবনত হইয়া পড়ে; আর যে সকল মোস্‌লেম মহিলা পূজার অর্ঘ্য লইয়া বঙ্গবাণীর মন্দিরে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই এই সমবেত সাহিত্যিক সজ্জন-বৃন্দের নিকট হইতে সাদর অভিনন্দন পাইবার যোগ্য পাত্রী।"

বঙ্গদেশে মুসলমান শিক্ষিত লোকের সংখ্যাল্পতার কথা কাহারো অবিদিত নাই; কিন্তু শিক্ষিতা মুসলমান মহিলার সংখ্যা আরও অধিক নগণ্য। ইহা সত্ত্বেও যে কয়জন মুস্‌লিম মহিলা বঙ্গসাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা জানাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা ঐ সকল বিদুষী, মাতৃভাষানু-রাগিণী মহিলাদিগকে সাহিত্যক্ষেত্রে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ইহাদের কাহারো কাহারো দান ক্ষুদ্র হইলেও আধুনিক মুসলমান সাহিত্যের এই শৈশব অবস্থায়—আমাদের এই সাহিত্যিক দুর্ভিক্ষের দিনে, তাঁহাদের ঐ ক্ষুদ্র উপহারকে আমরা শ্রদ্ধাবনত মস্তকে সাদরে গ্রহণ করিতেছি। দিন দিন তাঁহাদের সাহিত্যিক-রত্নসম্ভার লইয়া বঙ্গভাষা গৌরবান্বিতা ও সম্পদশালিনী হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

—সওগাত
ভাদ্র, ১৩৩৩

পরী-স্থান

শ্রীগোপাললাল দে

রাত্তি সুগভীর স্বপন অধীর সহসা হেরিনু মেলিয়া আঁখি,
জাগর-লোকের কল কল্লোল শান্তি সায়রে গিয়াছে ঢাকি;
অশথ শাখার পাতাটি নড়ে নি আকুলতা থেমে গিয়াছে জলে,
বাসক বনের শিথিল শয়নে স্বপন দেখিছে ঝিঁঝিঁর দলে;
পাখীগুলি ঘন ঘুমে অচেতন শাখা প্রশাখার অন্তঃপুরে,
হাওয়াটিও যেন সুদূরে কোথায় পথহারা হ'য়ে ফিরিছে ঘুরে;
সহসা স্বপন দেখিয়া কোকিল ডাকিয়া ওঠে নি বধূরে ভুলি;
বেণু বনে নব পল্লবগুলি গায়ে গায়ে হুলে পড়ে নি ঢুলি,
শুক্লা চাঁদের ঘন হাসিটুকু নীরবে ঝরিছে সবার' পর,
নিশিগন্ধার পাঁপড়ি যেন বা থরে থরে ঝরে নিরন্তর।

জীবন্তে আহা এ কোথা আসিনু এ যে ঘুমন্ত পরীর পুর,
কাব্যে পড়েছি কাহিনী যাহার নদী সমুদ্রে অনেক দূর,
নির্জ্জন পুরী দ্বারে নাই দ্বারী সাত মহলের সাতশ' ঘর,
গোধূলি আলোয় আলোকিত শুধু, শোনা যায় না ক' কাহারো স্বর,
থরে থরে সবই রয়েছে সাজানো ফুলে ফলে আছে বাগান ভরে,
মায়াজালখানি করিয়া রচনা যেন যাদুকর গিয়াছে সরে',
মূক হয়ে আছে মুখ সবাকার তবু যেন কত কহিছে কথা,
আলো ছায়া আর তরু পল্লবে ইসারাতে বাজে কি ব্যাকুলতা,
আলোয় ছায়ায় মরি এ কি মায়া ছড়ায়ে পড়েছে দিগন্তর,
অজানা যেন কে রাজার ঝিয়ারী ঘুমায়ে রয়েছে হাওয়ার পর।

বেদে

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আস্‌মানী

মুন্সি ডাকে—এ মক্‌বুল !

বল্লে—কিচ্ছু ভাবিস্ নে তু। পথে পথে তো ঘুত্তিস্, এবারে একটা হিল্লে হয়ে গেল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বল্লে—আমার ভাজির সাতে তুর্ সাদি দোব।

একটি ভদ্রলোক এসে ঢুক্‌ল।

—মক্‌বুল !

চেয়ার এগিয়ে দিই, কাঁচি ক্ষুর ক্লিপ্ পাউডারের বাটি গুছোই, ভদ্রলোকের গায়ে একটা শাদা কাপড় জড়াই, হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করি।

ভদ্রলোক তার মোটা চশমাটা তাকের ওপর ফেলে রাখে, মুখের আধা সিগ্‌রেট্‌টা রাস্তায় ছুঁড়ে মারে, গ্যাট্ হয়ে পা মেলে মুন্সিকে বল্লে—ধারগুলি সব প্লেন্।

পাখা করুতে করুতে এক ফাঁকে আজিজ মিঞার পাশে বসে' তার বিড়িটায় একটা টান দিয়ে শুধোলাম—মুন্সির ভাজির নাম জানিস্ ?

আজিজ ফট্ করে' বলে' বস্‌ল—আমিনা। খাসা···

নামটা যেন ওর জিভের ডগায়।

বল্লাম—বয়েস ?

আজিজ কালো দাঁতগুলি বের করে' ফেল্লে। বল্লে—তেত্রিশ।

মুন্সি আবার ডাকে—মক্‌বুল !

ভদ্রলোকের ঘাড়ের ওপর বুরুশ ঘষি, কাপড়টা চট্ করে' সরিয়ে নিই, পেছোনের দিকে কাৎ করে' আয়না ধরি।

ভদ্রলোক বল্লে—বেশ।

মাথায় জল ঢেলে মাথা টিপে দিই।

ভদ্রলোক বল্লে—আর একটু।

আমার হাত দুটো টেনে এনে চোখের ওপর রাখে, আঙুলগুলি বাবুর চোখের পাতার ওপর বুলিয়ে দিই।

মুন্সিকে দাম চুকিয়ে চশ্‌মাটা এঁটে পকেট থেকে সিগ্‌রেট্ বা'র করে' ধরিয়ে পথে নাম্‌বার আগে আমার হাতটা টেনে মুঠোর মধ্যে কি একটা গুঁজে দিল।

আজিজ হাঁ হয়ে গেছে। বল্লে—মুন্সি আধঘণ্টা ক্লিপ্ ঘষে' যা পেল না, দু'মিনিট বুরুশ ঘষে' তুই তার দু'নো কামালি ?, লে, বিড়ি আনি গে।

—ঈস্ ?

কর্‌করে আধ্‌লিটা ট্যাঁকে গুঁজে রাখি।

আমি কিন্তু আমিনার বয়স এগারোর বেশি বলে' কিছুতেই ভাব্‌তে পারি না। ওর পরনে নিশ্চয়ই ঘাঘ্‌রা নেই, কল্‌মীফুলী শাড়ী,—দুটি হাতের তালু মেহেদির পাতায় রাঙা; ওদের বাড়ীর উঠোনের ধারে নিশ্চয়ই পানায় ভরা পুকুর, নীল্‌চে জল, দুটো হাঁস পাঁক খোঁড়ে। পুকুরের পাড়ে পেয়ারা গাছ, কচি পাতার তলায় তলায় কড়া পেয়ারা।

ভদ্রলোক দুদিন অন্তর আসে—পকেটে ক্ষুর সাবান ষ্ট্রপ্‌ নিয়ে। বলে—দাড়িটা কামিয়ে দাও মক্‌বুল মিঞা।

দাড়ি কামিয়ে ড্রেস্‌ করি, তেম্‌নি করে' চোখের পাতায় আঙুল বুলাই। অনেকক্ষণ। মুন্সির দোকানের প্যাট্‌রার ফাঁকে দুআনি পড়ে, আমার গ্যাঁটে ঢোকে দু'নো।

সেদিন আজিজ মিঞা এগিয়ে গেল। ভদ্রলোক বল্লে—তুইই আয় মক্‌বুল!

আজিজ বল্লে—ওর গা-টা ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ কর্‌ছে।

—দাড়ি কামানো যায় না তাতে? কি রে?

আমি অল্প একটু হাস্‌লাম। আজিজ ক্ষুর-টুর ছড়িয়ে রেখে মুখ ভার ক'রে বেঞ্চিটার ওপর বস্‌ল।

আজিজকে গিয়ে বল্লাম—আজ্‌কের আধ্‌লিটা তুইই নে।

আমার হাতটা ও ছুঁড়ে দিল, বল্লে—তোর রোজগার আমি নিতে যাব কেন? পরে কি একটা কথা বিড়বিড় ক'রে বল্‌লে—স্পষ্ট বোঝা গেল না।

সেদিন ভদ্রলোকের আস্‌বার সময়-সময় বেরিয়ে পড়্‌লাম। আজ্‌কে আজিজই দাড়ি ছাঁটুক! ঘণ্টা খানেক টহলদারি ক'রে ফিরে এসে শুধোই—বাবু এসেছিল রে আজিজ?

আজিজের গাল দুটো গুম্‌ হয়ে আছে। বল্লে—তোকে খোঁজ কর্‌লে···

—কামাল না? কত দিলে তোকে?

—প্রায় দশ মিনিট ধ'রে ড্রেস্‌ কর্‌লাম—শালা একটা পয়সাও দিয়ে গেল না।

—মুখ খারাপ করিস্‌ নে আজিজ, খবরদার।

—মারবি নাকি? একহাতে ওর লুঙ্গির খানিকটা তুলে ধরে' ও তেড়ে এল।

মুন্সি মাঝখানে এসে পড়্‌ল। ওকে ঠেসে ধম্‌কালে, আমাকে টুঁও বল্লে না।

ও বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে বল্লে—কোন্‌ শালা এম্‌নি করে'···

দোকান ছেড়ে চলে' গেল। মুন্সি বল্লে—হোটেলে খেতে গেল।

বল্লাম—আমার সাত পয়সা?

মুন্সি হাস্‌ল, বল্লে—তুই তো কত কামাচ্ছিস্‌···

—বা, ও তো আমার উপরি পাওনা। আমার বরাদ্দ খাবার পয়সা আমি ছাড়্‌ব কেন?

—আচ্ছা এই নে। উপরি পাওনা দিয়ে কি করবি?

চট্‌ করে' মুখে আসে না। কিন্তু মনে মনে দেখি আমার সব সিকি আধুলিগুলি সোনার ফুল হয়ে গেছে; পুঁতির মালা নয়,—আমিনার গলায় পুষ্পহার।

আজিজ গাম্‌ছা ফেলে গেছ্‌ল। বল্লাম—খাওয়া হয়ে গেল?

আমার কথায় রা কর্‌লে না।

—আর জন্মে ঠোঁটের কাছের আঁচিলগুলি সব চেঁছে রংটা আর একটু মেজে যদি আস্‌তে পারিস্‌, এ-দিক ও-দিক দু'চার পয়সা ট্যাঁকে গুজ্‌তেও পাবি আর আমিনাও কপালে লাগ্‌ লাগ্‌ লেগে যেতে পারে। এ জন্মে...

আজিজ নিজে কথা কয়না বটে, কিন্তু ওর পাঁচটা আঙুল একসঙ্গে কথা কয় আমার পাঁজ্‌রার ওপর।

খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠি। তার কারণ আছে—আজিজ মিঞার ঘুষির ওজন বিরিশি সিক্কে।

মাথায় গাম্‌ছা বেঁধে বেরুতে যাচ্ছি, মুন্সি বল্লে—আগামী হপ্তায় দর্‌গায় যেতে হবে রে মক্‌বুল। মোল্লা বলে' পাঠিয়েছে। সেদিনই কল্মা পড়তে হবে রে।

গা-টা ছম্‌ছমায়।

দর্‌গায় যেতে হোল না কিন্তু। সেদিন ভদ্রলোক ক্ষুর সাবান নিয়ে এসে নিশ্চয়ই ঘুরে চলে গেছে।

দোকানের ঝাঁপ পড়েছে।

টালিগঞ্জে মুন্সির বাড়ী। রোদে টো টো,—লুঙ্গি

ফটফট্ করতে করতে এক হাঁটু ধুলো নিয়ে মাটির ঘরের ভাঙা কবাটের কড়া নাড়ি।

মুচি-পটির এঁদো রোগা গলিটা চামড়ার গন্ধে সম্ সম্ করছে।

দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে কে খুললে। ভাবলাম এই বুঝি তার মেহেদি-পাতায়-রাঙা হাতের তালু—ছোট ছোট নখের ধারে আব ছা হয়ে এসেছে। সমস্ত হাত পা ঝিঁ ঝিঁ ক'রে উঠল।

মুন্সি বেরিয়ে এসে বল্লে—কে, মক্‌বুল ?

বল্লাম—আমার প্যাট্রারটা মুন্সি...

—হ্যাঁ, কি হবে প্যাট্রা দিয়ে ?

--নিয়ে যাব।

—তু' ক্ষেপেছিস্ মক্‌বুল মিঞা! প্যাট্রাটা মাথায় করে' সারা শহর ঢুঁড়্‌বি নাকি ? যদি কোথাও জিরোবার জায়গা পাস্, নিয়ে যাবি। এখন থাক্ না হেতা!

—কোথা আছে ওটা ?

—আমিনার ঘরে। খোল্‌বার কিছু দরকার আছে ?

একটা প্যাচ্‌পেচে ঘরে মুন্সি আমাকে নিয়ে এল। চট্ করে' চারদিক একবার চেয়ে নিলাম। একটা তক্তপোষের চিট্‌চিটে বিছানায় গুটি কয়েক বেরালের বাচ্চা চোখ্ মিট্‌মিট্ করছে। এটাকে আমিনার ঘর ভাব্‌বার কোনো জো নেই কিন্তু। তক্তপোষের নীচে ছিপ্‌ছিপে একজোড়া মেয়েলি চটি; কিন্তু আমিনার বয়স কি এগারো নয় ?

মুন্সি বল্লে—তোর ওপর ভাজির কিন্তু ভারি টান পড়েছে রে মক্‌বুল। একদিন আমাকে না বলে' কয়ে' প্যাট্‌রা থেকে তোর বইগুলি খুলে সে কী মনোযোগে পড়া। যেন বুকে আঁক্‌ড়াতে চায়।

আমার বুকটা চিতোয়। বল্লাম—পড়্‌তে জানে নাকি ও ?

—জানে না আবার! রাতদিন তো বইর মধ্যেই ডুবে থাকে...

ভারি খুসি লাগ্‌ল।—ওর ভালো লাগ্‌লে আমার বই-গুলো যেন ও রেখে দেয়।

মুন্সি আহ্লাদে ডেকে উঠ্‌ল—আমিনা! আমিনা!

ভাব্‌লাম, এই বুঝি তার ছুটে আসার পায়ের ছোঁয়ায় সমস্ত ঘরটার অদলবদল হয়ে যাবে। কিন্তু আমিনার সাড়া নেই। মুন্সি বল্লে—বেটির ভারি সরম।

প্যাট্রাটা খুলে দেখি কে যেন সব ঘেঁটেছে। আমিনার হাতের ছোঁয়া কি ঘাঁটা পুঁথি-খাতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে ?

গেঞ্জির ও-পিঠে একটা ছিটের তালি লাগিয়ে পকেট ক'রেছিলাম তার থেকে পাঁচটা টাকা বের ক'রে বল্লাম—এই টাকা ক'টা প্যাট্রায় এই টিনের কৌটোটার ভেতরে রাখি মুন্সি। আজিজ মিঞার আস্তানার ছোঁড়াগুলি সুবিধের নয়।

মুন্সি ঘাড় কাৎ ক'রে তাড়াতাড়ি বল্লে—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ভাল। আজিজেরা তো গাঁট্‌কাট্। এখানেই থাক্। তোর ভাবনা নেই মক্‌বুল।

—তালা নেই কিনা, আমিনা যেন একটু চোখ্ রাখে। ওর ঘরেই যখন রইল।

—তোর জিনিষের ওপর বেটির ভারি চোখা চোখ্।

—আর যদি ওর খুব দরকার হয় এক আধ আনা খরচও যেন করে।

আমিনা জেনে নিশ্চয়ই গর্ব্ব বোধ করবে যে তার দুলহা ফকির নয়।

মুন্সি ফের আহ্লাদে ডেকে উঠ্‌ল—আমিনা! আমিনা।

আমিনার সরমের মাত্রাটা একটু বেশি বল্‌তে হবে!

যাবার আগে মুন্সি বল্লে—দর্‌গায় কবে যাবি রে মক্‌বুল ? ভাজি তো দিনের পর দিন ডাগর হতে চল্‌ল।

—কামাতে পারি না এক পয়সা, সাদি কি মানায় মুন্সি ?

—কি যে বলিস্! মোছলমান্‌টা হয়ে নে, তোকে আমি ডিপ্‌টি করে' ছাড়ব। অঙ্কে তোর এমন মাথা! মোল্লা কালও লোক পাঠিয়েছিল রে!

—আচ্ছা, এ হপ্তাটাও যাক্। একটা হিল্লে করে' নি।

মুন্সি কিছু বল্‌বার আগেই পথে নেমে পড়্‌লাম। নিজেকে আর একটুও ঢিলা লাগে না। সাঁ সাঁ করে' চলি। গেঞ্জির পকেটে এখনো ন' সিকে—একটা দোকানে গিয়ে বালির কাগজ আর পেন্সিল কিনি।

আস্তানায় খালি খালি বিড়ি পাকাতে ভালো লাগে না। ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে পচা ইয়ার্কি দিই, ছপ্পুর সাত বারের বার নিকে করা ছুঁড়ি বৌটাকে নিয়ে ওরা গান বানায়, আমিও সুর ভাঁজি। তারপর রাত অনেক হয়ে গেলে বাড়ী ঘর দোর আঁধিয়ার আকাশ—সব যেন কেমন করে' ওঠে। ঘুম আসে না। কুপিটা জ্বালিয়ে পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি আঁচড় কাটি, কি যেন বলে' বোঝাতে চাই, পারি না।

কুপির ছিপিটা খুলে খানিকটা কেরোসিন আজিজ-মিঞার নাকের মধ্যে ঢেলে দিতে ইচ্ছা করে। ওর নাকের কল বিগ্ড়েছে।

ভাদ্রের গঙ্গা – শান্-দেওয়া ছুরির মতো ধার!

শান্ বাঁধানো পিছল ঘাটের সব শেষের সিঁড়িটায় বসে' জলে পা ডুবিয়ে চেয়ে থাকি। ইচ্ছে করে ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে সাঁ করে' ছুটে যাই ফেরি বোটের চাকার মতো! ঐ বাঁধা জাহাজটার চোঙার আওয়াজের মতো জলের হুস্‌হুস্ করি!

বেটার গলায় পৈতে, পরনে গাম্‌ছা—উঠে এসে মুখ খিঁচিয়ে বল্লে—এই শালা নেড়ের বাচ্চা, গঙ্গা জলে পা দিয়ে আছিস্ যে—বেরো বেটা...

বল্লাম—ঐ যে জেলে-নৌকার মাঝিরা জলে পা মেলে জাল ফেল্‌ছে ওরা কোন্ জাত? আর ঐ নীল কুর্ত্তা-পরা খালাসীরা?

দু পা' দিয়ে জল ছিটোই।

বামুন খাপ্পা হয়েই বল্লে—ওরা তো হিদুঁর ঘাটে . . .

তারপর একটা মুখ খারাপ কর্‌লে।

বামুনের গাম্‌ছাটা টেনে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লাম। বামুন আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—শূয়োর নেড়ের বাচ্ছাকো পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো।

আমাকে কে ধরে? সবাই একবার পেছন ফিরে চায় মাত্র।

তের্‌পল-ঢাকা গাধাবোট। ভাগ্যিস্ ন' ফুট খোলটার গায়ে দুটো লোহার কড়া লাগানো ছিল! নেংটি-পরা মাঝিরা বসে' কেউ তামাক টান্‌ছে, কেউ ভাতের ফেন গাল্‌ছে—পচা চিংড়ির ভোঁদ্‌কা গন্ধে নদীর বাতাস বইতে পার্‌ছে না।

—এক ছিলিম্ আমাকে দেবে মিয়া-ভাই?

আমার হাঁটু দুটো ঠক্‌ঠকায়—বেটারা চেয়ে থাকে।

বুঝিয়ে বল্লাম—ডিঙি নৌকাটা মাঝ দরিয়ায় ডুবল, আমিনা যে কোন্ দিকে তলাল ঠাহরই হোল না।

চোখের কোণে জল আন্‌তে চেষ্টা করি। জল আসে না।

বেটারা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। এক-জন সহানুভূতি করে' গেঁয়ো ভাষায় বল্লে—কোথেকে? কে আমিনা?

—শ্বশুরবাড়ী থেকে ফির্‌ছিলাম, পুলের কাছে ধাক্কা লেগে নৌকার তলায় ফুটো হয়ে গেল . . .

মাঝিরা এটা অনায়াসে আবিষ্কার করে' ফেল্‌ল, স্ত্রী-ডোবার মতো করে' আমি ব্যস্ত হচ্ছি না। একজন হাতে কল্‌কেটা দিয়ে বল্লে—খোঁজ-খবর কিছু কর্‌লি?

গাল দুটো গর্ত্তে ডুবিয়ে এক টান দিয়ে বল্লাম—কি খোঁজ খবর আর আছে এই ভরা গাঙের ঢেউয়ে? তলিয়ে গেছে যাক্। বেটি ভারি জ্বালাত।

একজন ঠাট্টা করে' বল্লে—পারে উঠেই ফের নিকা নাকি!

—পারে আর উঠ্‌ব না। এখানে একটা চাক্‌রী দেবে ভাই?

পারে উঠ্‌তেই হলো। চাক্‌রী চাওয়ার নাম শুনে ওরা হঠাৎ কি করে' জানি আবিষ্কার কর্‌লে, আমার মত্‌লব ভালো নয়। সমস্বরে 'না' করে' উঠ্‌ল। চিংড়ির চচ্চড়ির গন্ধে পেট্‌টা আঁকুপাঁকু করে কিন্তু লুঙ্গিটা গুটিয়ে জলে ফের ঝাঁপ দিলাম।

বাঁধানো ঘাটে উড়ে বামুনের দল কেরোসিনের বাক্স সাজিয়ে চন্দনের বাটি নিয়ে বসেছে। সমুখে দলে দলে মেয়ের ভিড়,—কারু মাথায় ঘোম্‌টা, কারু বা পিঠের ওপর চুল মেলা।

উড়ে আমার লুঙ্গি দেখে কিড়মিড় ক'রে উঠল। মেয়েরা একটু সরে' বস্‌ল, কেউবা একটু তাকাল, বা তাকাল না।

বল্লুম—ঘণ্টাখানেক বাদে লুঙ্গিটা ছেড়ে গলায় একগাছা ধোল ই পৈতে ঝুলিয়ে এলে এগোতে দেবে ত' বামুন ঠাকুর ?

একটি মেয়ে খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠল।

পরের দিন গলায় শুধু পৈতে নয়—একেবারে বাক্স জল-চৌকী কোশাকুশি ধূপ চন্দনের বাটি নিয়ে বাঁধানো ঘাটের ধারে অশ্বত্থ গাছের তলায় এসে বস্‌লাম। আজিজ মিঞাকে রোজগারের থেকে কিছু বক্‌শিস্ দিতে হবে। বেচারা মাথায় করে' জিনিষগুলি পৌছে দিয়েছে কিন্তু।

উড়ের ঘুম তা হ'লে খুব ভোরে ভাঙে না। বামুন যখন ঢিকোতে ঢিকোতে আসে নদীর জলে রোদ তখন চট্‌চট্ করছে। আমাকে দেখে তেড়ে এল,—বলে কি না মোছলমান!

হেসে বল্লাম—আড়াই হাত গামছা যেমন তোদের তেম্‌নি ডোরাকাটা লুঙ্গি হাল-বাবুদের ফ্যাসান।

মেয়েদের বল্লে—ও আস্ত মোছ্‌লমানের বাচ্চা, ওর থেকে ফোঁটা নেবেন না।

—না মা, আমি খাঁটি বামুনের ছেলে, কোন্নগরের চাটুজ্জে আমরা — অবস্থার দোষে . . .

আরো বল্লাম—ও ব্যাটা ভারী পাজি—মিথ্যেমিথ্যি যা তা বলে। পরনে লুঙ্গি থাক্‌লেই যদি মোছলমান, তবে সমস্ত বর্ম্মা দেশটাই পীরের মুলুক।

বর্ম্মার কথা ভূগোলে পড়েছিলাম।

বুড়ী মেয়েমানুষটি বল্লে—না বাবা, কাত্তিকের মতো মুখ,—একেবারে আমার ছেনাথের মতো! ওলাবিবি ছেনাথকে গেরাস্ কর্‌লে বাবা, বাছা আমার কাটা পাঁঠার মতো . . .।

বুড়ী হাপুস কাঁদছে। শ্রীনাথ কবে বড় শীতে বেলে-মাছ ধরেছিল, কবে চিনি চুরি করে' খেতে গিয়ে নুন খেয়ে ফেলেছিল, বুড়ী সে কথা উল্লেখ কর্‌তেও ভুল্‌লে না।

চোখের জল মুছে ফেল্‌তেও দেরী হ'ল না কিন্তু। বল্লে—ভালো করে' ললাটে চন্দন চর্চ্চিত করে' দাও তো কাত্তিক। রোদ চড়া হতেই মাথার রগ্ ছটো দপ্‌দপ্ করতে সুরু করে। বেশ ক'রে লেপে দাও তো ছেলে!

থুৎনিটা ধ'রে আদর করতে চায়। কিন্তু পয়সা দেবার বেলায় সেই একটাই।

রোজগেরে সাড়ে চার আনা পয়সা উড়ে বামুনের হাতে দিয়ে বল্লাম—একটুখানি ঠাঁই ক'রে নিতে দাও বামুনঠাকুর। তোমার ব্যবসার ক্ষেতি হবে না।

পয়সা পেয়ে উড়েটা হাসে।

ভারিক্কি কছমের মেয়েরা বল্লে—এ চুনোপুঁটি বামুন-ঠাকুরটি আবার কোত্থেকে জুটল? ছেলেবয়েস থেকেই মন্দ ব্যবসা ফাঁদে নি।

উড়ে বল্‌লে—সাক্ষাৎ গণেশঠাকুর মা। গোটা মহাভারতটা কণ্ঠস্থ। ওর হাতের ফোঁটা বিষ্টুর চন্নামৃতেরই তুল্য।

এক ফাঁকে বল্‌লে—সংস্কৃত শ্লোকটা মুখস্ত করে' ফ্যাল্। ছটো লাইন আওড়ায়—অনুস্বার বিসর্গে ভর্ত্তি। বার কতক শুনে কোন রকমে নকল ক'রে কড়মড় করি। ও বল্‌লে—এতেই হবে।

ওর কাছে মা, আমার কাছে মেয়ে।

বাঁ হাত দিয়ে চিবুকটা লেপ্‌টে ধরি, ডান হাত দিয়ে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা কাটি। অশ্বত্থের কচি পাতার মতো মুখ বাতাসে তুল্‌তুল্ করছে। ছটি ফুর্‌ফুরে ঠোঁট ফুঁয়েই যেন উড়ে যাবে।

বল্‌লাম—তোমার নাম কি ?

লজ্জায় চোখের পাতা ছটি নামায়,—কথা কয় না।

—কোথায় থাক ?

এবারো না।

—গঙ্গায় নাইতে তোমার খুব ভাল লাগে ?

ঘাড় কাৎ ক'রে চুল্‌বুল্ ক'রে একটু হাসে। রা করে না, সরম খালি একলা আমিনাবিবিরই নয়।

বল্‌লাম—পড়্‌তে জান ?

আর মেয়েটির ঘাড় অনেকখানি হেলে। আওয়াজও একটু বেরোয়—হ্যাঁ।

—বাড়ী গিয়ে আয়না দিয়ে মুখ দেখো, কেমন?

আবার ঘাড় বাঁকায়।

ওর কপালে চন্দন দিয়ে লিখে দিয়েছি কাল্‌কে আবার এসো। কিন্তু কালকে আর মেয়েটি আসে না।

ছপ্পুর বউ হাতছানি দিয়ে ডাকে।

আজিজ বল্‌লে—আমাকেই। ব'লে বিঁড়ির কুলোটা ফেলে হনহন্ ক'রে ছুটে গেল। মাঝের ডাষ্টবিনটা এক লাফেই ডিঙিয়ে ফেল্‌লে। কিন্তু জান্‌লা বন্ধ হয়ে গেল যে। আজিজ শিস্ দিতে দিতে ফিরে এসে জিভটা ভারী করে' বল্‌লে—বেটী ভারি লাজুক তো!

খানিকবাদে আবার জান্‌লা খোলে,—আবার হাতছানি।

হামিদ উঠে পড়ল এবারে। ছপ্পুর বউ দুই হাত দিয়ে না করে' উঠ্‌ল। তবু হামিদ তেড়ে গেল দেখে জান্‌লা দুটো বন্ধ করে' দিলে। হামিদ মাঝ পথ থেকে ফিরে এল।

তেম্‌নি আবার একটি আঙুল নেড়ে নেড়ে ডাকা।

আবার আমি উঠ্‌লাম—শেষবার। জান্‌লা বন্ধ হ'ল না। বন্ধ তো হ'লই না, জান্‌লার ফাঁকে ডিবেটা জালিয়ে ধর্‌ল। আমাকে পথ দেখায়।

সরাসর দরজায় উঠে এলাম। ভেতর থেকে ডাক এল—ঘরে আয় মক্‌বুল।

ছপ্পুর বউ নাম জানে তা হলে!

মাথাটা চন্‌চন্ করে' উঠ্‌ল। বল্‌লে চ—ছপ্পু গেছে কামারপোলে কোন্ বিয়ে বাড়ীর ছাপ্পর তুল্‌তে, রাত করে' ফির্‌তে পায় নি। তোর আজ এখানে শুতে হবে।

ও আরো পরিষ্কার করে' বল্‌লে—রহমৎ দারোগার চাউনি ভারি তেরছা, মক্‌বুল। তা ছাড়া ঐ আজিজ হারামজাদা, আমাকে একলা পেয়ে যদি ব্যাটারা আজ দরজা ধাক্কায়?

বল্লুম—আর আমিই কি ওদের লাঠি ঠেকাতে পারব?

—তবু তুই একটা ভর, মক্‌বুল।

—আমার প্যাকাটির মতন হাত তাদের কটা ঘুষির সঙ্গে লড়্‌বে? একটা জোয়ান লোককে পাহারা দিতে ডাক্‌লেই ভালো হত।

—তা হলে রহমৎকেই ডাক্‌ব নাকি রে? বলে' কি রকম করে' জানি হাসে। হাসিটাও নিশ্চয়ই সিধে নয়, তেরছা।

রাত তখন পেকে এসেছে। বিবি বল্‌লে—খাবি? গোস্ত ছিল টাট্‌কা।

বল্‌লাম—না। ঘুম পাচ্ছে বেজায়।

উঁচু তক্তপোষটায় বিবি বিছ্‌না করে' দিলে। বল্‌লে—শো'।

—আর তুই?

মাটির ওপর মাদুর বিছিয়ে বল্‌লে—হেতা,—মাটিতে।

—দোরটা ভালো করে' এঁটেছিস্ তো' বিবি? দেখিস্।

বিবি ডিবেটা নিভিয়ে দিলে। বল্‌লে—হ্যাঁ রে হ্যাঁ! আমার চেয়ে যে তোর বেশী ভয়!

আজিজ, মিঞা কি ভাব্‌ছে? এখনো বিড়ি পাকাচ্ছে বুঝি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বিবি ডাক্‌ল—মক্‌বুল।

বিবির বুঝি ঘুম আস্‌ছে না। বল্লাম—মাটিতে শুলে ব্যায়রাম হবে বিবি, খাটে উঠে আয়!

বিবি কিৎকিৎ করে' হাসে; বল্‌লে—তোর পাশে?

—কেন, আমি তো আর রহমৎ নই?

বিবির মাটিতে শুয়েই ঘুম আসে কিন্তু।

অনেক রাতে সত্যি সত্যিই কে দরজা ধাক্কায়।

বিবি চেঁচিয়ে উঠে আমাকে জাপ্‌টে ধর্‌লে, বল্‌লে—রহমৎ দারোগা এল বুঝি! কি হবে মক্‌বুল?

অন্ধকারে এ রকম জাপ্‌টে ধরে' থাক্‌লে তো কিছুই হবে না। আমাদের হল্লা যতই চড়ে, ধাক্কা ততই বেখাপ্পা হয়।

দরজাটা ভেঙে ফেলেছে। ধুপ্ করে' মাটিতে নেমে

দেশলাইটা জালিয়ে দেখি—রহমৎ নয়, আজিজ মিঞা। পেছনে হামিদ আর আলি।

ওরা যার জন্য গান তৈরী করে' এত দিন সুরের কসরৎ করল তার দিকে একটিবার ফিরেও চাইল না। আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। আমারই জন্য যেন ওরা ওৎ পেতে ছিল—এম্‌নি।

আমার চুলের মুট ধরে' ঝাঁকি দিতে দিতে আজিজ বল্লে—এত রাত হয়ে গেল আস্তানায় ফিরবার নাম নেই।

হামিদ লাথি মেরে বল্লে—পরের বাড়ী আস্‌নাই?

ওরা আমার অভিভাবক—শাসন করছে!

রহমৎকে না দেখে বিবির বোধ হয় মন ওঠে নি। আর চেঁচামেচি নেই,—প্রতিবাদ নেই, কড়ে' আঙুলটিও তুল্‌ল না। আস্তে আস্তে ডিবেটা জালিয়ে দোরের পাশে রাখ্‌ল।

ওরা আমাকে ঠেলে পথের কাদায় ফেলে দিলে। বিবির আর ভয় নেই। এবার ওর তিন জনই রক্ষক। রহমৎ আর ডরে আস্‌বে না।

বাকী রাতটা আস্তানায় নয়, কাটাই ফুটপাতের ওপর। ময়লা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে পথ চলা সুরু হয়। সকাল থেকে দুপুর,—দুপুর থেকে রাতের তারার চোখ চাওয়া তক্‌। খালি রাস্তার জলের কল টিপে টিপে পথ ভাঙা।

যেখানটায় ভিক্ষি দিয়ে পড়্‌লাম, চোখ্‌ চেয়ে দেখি বাড়ীটার গায়ে লেখা—মহেশ্বরী ইটিং হাউস্‌।

লুঙ্গি পরণে থাক্‌লে কি হবে, গেঞ্জির তলায় পৈতে দেখে সবাই আশ্বস্ত হোল। কর্ত্তা বল্লে—সারাদিন কিছু খাস্‌ নি? এই বিশে, একটা রুটি এনে দে তো।

কর্ত্তা বল্লে—বাড়ী কোথা?

রুটি খেতে খেতে একটা দুঃখের কথা বানিয়ে বল্লাম। বল্লাম—এখানে একটা কাজ দিন্‌।

—বেশ, থাক্‌, চায়ের কাঁপ টেবিল সাফ্‌ করবি। থেকে যা।

মাইনের কথা কিছুই বলে না।

বিশে বল্লে—কি নাম তোর?

একটুখানি ভেবে নিতে হ'ল। বল্লাম—কাঁচা।

বিশেটা হাসে। বল্লে—ঐ বাবুরা এসেছে। টেবিল পুঁছে দে গে যা।

আবার টালগঞ্জের পথে।

কড়া নাড়্‌তে হয় না, দরজা খোলাই আছে; আমিনার ঘরও খোলা, বিছানা পত্র কিছুই নেই কিন্তু। ডাকি—মুন্সি! সাড়া পাই না। ডাকি—আমিনা! আমিনার যে সরম!

আমার প্যাঁট্‌রাটা এককোণে পড়ে' আছে বটে। খোলা সেটাও। হাঁট্‌কাই, টিনের কৌটোটা নাড়িচাড়ি, কিন্তু ভেতর থেকে কিছুই বাজে না।

মুন্সি যে বলেছিল আমিনা দিনে রাত্রে বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকে তার কিছুই প্রমাণ পাওয়া গেল না। শেষকালে বইগুলিই প্যাঁট্‌রায় করে' মাথায় নিয়ে টালিগঞ্জের পথ ভাঙ্‌তে হয়।

বিশে টেবিলে পা তুলে দিয়ে বল্লে—পা টিপে দে।

কর্ত্তা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। অগত্যা টিপেই দিতে হয়। কিন্তু বিশেরই জামার পকেট থেকে দু' পয়সা সরিয়ে এক টুক্‌রো সাবান কিনে আন্‌তে হবে দেখ্‌ছি।

চেয়ারের পায়াগুলো অমরত্ব লাভ করেছে এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই। বিশে তো নয় হাতী! তে-খাঁজ একটি পৈতৃক ভুঁড়ি রোজ প্রায় এক পো তেল খায়—প্রথম খাঁজে সারি সারি বিড়ি গুঁজে রাখে, দ্বিতীয় খাঁজে দেশ্‌-লাইর কাঠি। বিশের ঘাড় লাট্টুর আল্‌-এর মতো, এই-টুকুন্‌!

বল্লে—ঘাড়টা ড'ল্‌!

বিশে দোকানের হিসেব রাখে। ওর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, যখন খুসি খাবড়ায়, যখন খুসি উপোস করিয়ে রাখে।

বিশে কর্ত্তার শালা।

'রেশ্'-এর দিন। সাঁঝের শেষে বেজায় ভিড়। এই খানে ফাউল কাট্‌লেট্, ঐ ওখানে আবার ছোট কাপ্। ছুটে ছুটে হা-ক্লান্ত। বিশেটা খালি বাঁ হাতে বিড়ি টানে, আর হাতে পয়সা গোণে।

—এ মক্‌বুল।

হাতের ওপর চায়ের কাপটা কাৎ হয়ে পড়ে গেল। চম্‌কে উঠ্‌লাম—বাবু!

বাবু বল্লে—এখানে কবে থেকে? গলায় যে একেবারে পৈতে ঝুলিয়েছিস্! ব্যাপার কি?

বাবু হাসে।

—সে অনেক কথা।

—আচ্ছা, চার ডিস্ কারি এনে দে, ফাউল।

অনেক কথা আর বলা হয় না। যাবার সময় বাবু তেম্‌নি হাতের মধ্যে কি একটা গুঁজে দিলে। বাবুর এক জন সঙ্গী বল্লে—আমাদেরো কন্‌ট্রিবিউশন্ আছে হে।

বিশে নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছিল। সাইনবোর্ডের মাথার আলো নিব্‌তেই দৌড়ে থপ্‌থপ্ করতে করতে পাশের ঘরে এসে হাঁক্‌লে—ট্যাঁকে কি গুঁজেছিলি রে তখন?

—কখন আবার গুঁজ্‌তে গেলাম?

—হেই ত্—তখ্‌ন, চশ্‌মাচোখো বাবুর ঠেঙে?

—কোথায় চশ্‌মাচোখো? কত এল গেল, কে কাকে মনে ক'রে রেখেছে!

—যা যা ফাজ্‌লামো নয়। খ্যাখা, কত দিলে—বলে' ট্যাঁকে হাত দিতে চায়।

—ট্যাঁকে হাত দিস্ নে বিশে, খবরদার!

রাগে বিশের ভুঁড়িটা হাঁপায়।—কী? বলে' তেড়ে এসে আমাকে একেবারে ওর ভুঁড়ির ওপর আছ্‌ড়ে ফেল্লে। বাকী খাঁজটায় এবার আমাকেই গোঁজে আর কি! আধুলিটা ছিনিয়ে নিয়ে বল্লে—আমার আদ্দেক।

রুখে, লাফিয়ে উঠ্‌লাম।—ঈঃ? আমার রোজগেরে পয়সা। তোর কি পাওনা আছে এতে?

—আমি দোকানের ক্যাশিয়ার না?

—তাতেই তো তোর অনেক পয়সা রোজগার। এর ওপর আবার চোখ্ কেন?

—কী? রাগে বিশের পা-টা ধাঁই করে' আমার বুকের ওপর এসে লাগল। কেঁদে ফেল্লাম। কর্ত্তা কিন্তু বাকী মাংসটা শেষ করতে করতে হাস্‌ছে।

চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লাম—বিশে আমার পয়সা নিয়েছে।

—তা তো নেবেই।—কর্ত্তা বলে।

—বাঃ, আদ্দেকই ও নেবে? এ কেমন কথা!

—সবটাই যে নিতে চায় নি এ তোর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।

বিশে ঘোঁত্ ঘোঁত্ করতে করতে এসে বল্লে—চার আনা ক্যাশিয়ার,—দু আনা তোর বেয়াদবির জন্য ফাইন্—সেটা জেনারেল-ফাণ্ড্—আর এই নে। একটা দু আনি ছুঁড়ে মারলো।

কর্ত্তা বল্লে—এই দু' আনা দিয়ে তোর এক ছিলিম বড়-তামাক হোত রে বিশে।

বিশে একটা চোখ্ বুজে বল্লে—না, ওই নিক্। ওর থপ্‌ছুবৎ চেহারাটার জন্যই না রোজ্‌গার—ওর ওই দুটো কুচ্‌কুচে চোখের জন্য!

বিশের অসীম দয়া। কর্ত্তা হাসে। এটা নিশ্চয়ই ঠিক, ইটিং-হাউসের মূলধন কর্ত্তার নয়, বিশের দিদির।

বাবুকে বল্লাম—খুচ্‌রো দিন্।

বাবু আধুলি না দিয়ে দুটো সিকি দেয়। একটা জিভের তলায় লুকিয়ে রাখি, আরেকটা যেমন-কে-তেমন ট্যাঁকেই থাকে।

বিশে কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করলে না। বল্লে—রোজ রোজ যে আধ্‌লি দেয়, হঠাৎ তার পয়সার এম্‌নি কমি হয়ে গেল?

—বাবুর ট্রাম ভাড়ারই পয়সা নেই, পায়ে হেঁটে যাবে ভবানীপুরে, জানিস্?

কথা বলতে বলতে জিভ্‌টা কেমন জড়িয়ে এল। বিশে গাল দুটো দুম্‌ড়ে দিতেই সিকিটা টুপ্‌ ক'রে' বেরিয়ে পড়ল।

কর্ত্তা বল্লে—বেরিয়ে যে যাচ্ছিস্‌ ভাল হচ্ছে না কাঁচা!

বাবু তেড়ে বল্লে—আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার কী?

—তোমার কী রাইট আছে?

—তোমাদের মারবারই কী রাইট্‌ ছিল? এইটুকুন্‌ ছেলে,—মা-বাপহারা,—কাজ করতে এসেছে বলেই' কি গাধার সামিল হয়ে গেছে যে, তাকে যাচ্ছে-তাই ক'রে পিটবে, তার মাথা থেঁৎলে রক্ত বা'র করে' দেবে?

—আলবৎ দোব।

বাবু বল্‌লে—তোর প্যাট্‌রাটা নিয়ে চল্‌ তো মক্‌বুল,—একেবারে থানায়; বেটাদের নামে আমি 'কেস্‌' কর্‌ব।

বিশে ভয় পেয়ে গেছে। বল্‌লে—তোর মাইনেটা?

বল্‌লাম—হিসেব ক'রে তোর দিদিকে ফিরিয়ে দিস্‌।

থানায় নয়,—প্রকাণ্ড বাড়ী, লাগোয়া মাঠটায় কে ছুটোছুটি খেলা কর্‌ছিল।

—দাদা, আমাদের গরু এসেছে। দেখ্‌বে এস। ধব্‌ধবে শাদা, গলাটা কেমন তুল্‌তুলে—তুলোর মতো! বলেই ছুটে চলে গেল।

বাবু ডাকুলে—আস্‌মানি! শোন্‌—

আস্‌মানীর শুন্‌বার সময় নেই।

মা বল্‌লেন—নাম মক্‌বুল, গলায় পৈতে—এ ভারী মজা তো!

বাবু বল্‌লে—মাথায় ঝুলিয়ে দেব টিকি, দাড়িতে খোদার নূর!

চাকর-ঠাকুরদের আলাদা ঘর ছিল, তারই ছোট্ট একটা কুঠ্‌রীতে আস্তানা গাড়্‌লাম। চাকর পছন্‌কে দিয়ে বাবু একটা হৈ চৈ বাধিয়ে তুল্‌লে—জল ঢেলে ঝাঁট্‌ দেওয়ালে, একটা তক্তপোষ এনে ফেল্‌লে, বিছানা পাতালে, দেয়ালে একটা ব্রাকেট্‌ টাঙালে পর্য্যন্ত। পছন্‌ বিড়্‌বিড়্‌ করে' বল্‌ছিল—নবাবের নাতি এসেছে।

ঘুমিয়ে ঘুম আস্‌বার কথা, কিন্তু আস্‌ছিল না। হঠাৎ মনে হোল, আমিনা সত্যিই গঙ্গার জলে ডোবে নি। টালিগঞ্জের মুচি-পটীর পনেরো নম্বরের বাড়ির দরজাটা থাকুকই না খোলা! আরো অনেক বোঁজানো কবাট্‌ খুলে গেছে। 'আস্‌মানী'-কথাটার মানে জানি না বটে। আমিনা-কথাটারো জানি কি মানে?

কিন্তু আমি আসা মাত্রই যে প্রাণীবিশেষের শুভাগমন সংবাদটি ঘোষিত হয়েছিল তার তো কোথাও দেখা পেলাম না। মনটা খট্‌ করে উঠল। গোয়াল-ঘর তা হলে কোন্‌টা? আমার গলার চাম্‌ড়াটা তুল্‌তুলে বটে, রংটা তো ধব্‌ধবে শাদা নয়। কে জানে?

গঙ্গার ঘাটে যে মেয়েটির কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটেছিলাম তারো নাম জানি না। হয় তো আস্‌মানীই।

রান্নাঘরে নয় একেবারে কলতলায়ও নয়;—মাঝামাঝি। বাবুদের জুতো বুরুশ্‌ করি, কাপড় কুচোই, ঘর ঝাঁটাই, ফুট্‌-ফরমাজ করি—দিদিমণিরও।

ন'টার সময় গাড়ী আসে। খাওয়া হয় কি না হয়,—আস্‌মানী ছুটে বেরোয়। সাজগোজ হয় ঘুম থেকে উঠেই। চাম্‌ড়ার ব্যাগটা হাতে করে' গাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিই। পা-দানিতে উঠ্‌বার সময় আমার হাত থেকে তুলে নেয়। আঙুলে আঙুল ঠেকে, কি ঠেকে না।

চারটে যেন আর বাজ্‌তে চায় না। ঘোড়া দুটো যেন জিরিয়ে জিরিয়ে চলে। আস্‌মানী নেমে আসে মুখ শুক্‌নো, ক্ষিদে পেয়েছে। মাকে ডাকাডাকি করে' তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। কোনো কোনো দিন খাবার সময় বলে—এই ছোঁড়া, পাখাটা খুলে দে ত'।

যে ছেলেটি সকালবেলা আস্‌মানীর মাষ্টারি করে সে বিকেলে সাইকলে চড়ে' আস্‌মানীদের বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দেয়। সব মেয়েদের নামিয়ে গাড়ীটা একা আস্‌মানীকে নিয়ে আসে ঐ পাঁচটা গ্যাস্‌পোষ্ট ছাড়িয়ে লাল বাড়ীটা

থেকে। এইটুকুন্ পথ—কোথা থেকে কে জানে—সাই-কেলে আসতে আসতে ছেলেটি আসমানীর সঙ্গে কথা কয়। হয় তো লেখাপড়ারই কথা।

রাত্রে পাঁড়েজির ছুটি হোত প্রায় বারোটায়—সব্বাইর শেষে। গাঁজা টিপ্‌তে টিপ্‌তে এসে বল্‌ত—আলো জেলে কি কর্‌ছিস্ রে মক্‌বুল-বাবু? কি পড়্‌ছিস্ ওটা? বটতলা তো? কোন্‌টা? ছুছুন্দরীর আদিখ্যেতা, না বেউশ্বের ছেলের অন্নপ্রাশন?

বল্‌তাম—জিউমেট্রি।

পাঁড়েজির উৎসাহ কম্‌ত না। পাশে বসে' বল্‌ত—কোন্ জায়গাটারে? সেই যেখানে মদের গেলাস হাতে করে—একটু পড়্‌ই না, শুনি।

পড়্‌তাম—লেট্ এ বি সি বি এ ট্র্যাঙ্গ্‌ল্...

বল্‌ত—সংস্কৃতে কেন, বাংলা করেই বল্ না। তা ভাবিস্‌নে যে কিছুই বুঝি নি। সংস্কৃত কিছু জান্‌তাম—

—কি বুঝ্‌লি?

—হেঃ! একটু একটু বোঝা যায়ই। বিবি ত্রিভঙ্গ হয়ে নাচ্‌ছে।

পছন্ তেড়ে এসে বল্‌ত—রাত আধখানা হয়ে এল, এখনো গজ্‌গজানি। বলেই কুপিটা নিবিয়ে দিত। বল্‌ত—ফের আলো জ্বালাবি তো চোখের ড্যালা বা'র করে' ছাড়্‌ব।

পাঁড়েজি বল্‌ত—হ্যাঁ বাবা, বেশি রাত করে' ওসব পড়ে' কাজ নেই। তুই কিছুই পড়িস্ নি বুঝি পছন্?

বইটা নিয়ে রাস্তায় গ্যাসের তলায় এসে বস্‌তাম। অন্ধকারে দূরে বাড়ীটা যেন দম আট্‌কে পড়ে' আছে।—এম্‌নি মনে হোত।

উঠোনে মস্ত খুঁটিতে গরুটা বাঁধা। আস্‌মানী যতই ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ততই ও ওর বড় বড় চোখ-দুটি স্নেহে ভিজিয়ে মাথাটা আকাশের দিকে তুলছে। সাম্‌নে একটা মোড়ায় বসে' আস্‌মানীর মাষ্টার-ছেলেটি একটা রুমাল নিয়ে লোফালুফি খেলছে।

সবে ভোর। মাষ্টারের পড়াতে আসার কথা সাতটায়। মাষ্টারের ঘড়িটা নিশ্চয়ই দু একঘণ্টা ফাষ্ট্ চলে।

আস্‌মানী বল্‌লে—এই ছোঁড়া, গরুর দুধ দুইবি? গয়লা আসে নি। জানিস্ দুইতে?

অক্ষমতার অপযশ বিনা পরীক্ষায়ই কিন্‌তে যাই কেন? একেবারে ভাঁড় নিয়ে এসে বসে' গেলাম। বাটে সবে দু'তিন টান দিয়েছি, আস্‌মানীর মাষ্টার গরুর মুখে রুমাল দিয়ে বাড়ি মার্‌তে লাগল।

গরুটা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চাইল সমুখের শিং দিয়ে নয়, পেছনের ঠ্যাং তুলে। ভাঁড় শুদ্ধ চিৎপাৎ হয়ে পড়ে' গেলাম।

কী হাসি আস্‌মানীর! যেন ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে। আস্‌মানীর মাষ্টারটার হাসি বিকট! হাস্‌ছে না ত' কাশ্‌ছে!

গয়লা কিন্তু এসেছিল। বল্‌লে—এ সব কি আনাড়ীর কম্ম? যা যা গোবর খেগে যা!

আস্‌মানীর হাসি কিছুতেই থাম্‌তে চায় না।

মাষ্টার বল্‌লে—ঠ্যাং দুটি ছড়িয়ে ব্যাং-এর মতো কেমন পড়্‌ল, দেখেছ?

অথচ এই ছেলেটাই দাদাবাবুর হোটেলে খাওয়ার সঙ্গী ছিল! যাবার সময় রোজ বল্‌ত—আমাদেরো কণ্ট্রিবিউশান্ আছে হে!

রাতে সেদিন বাড়ী ফিরে দাদাবাবু চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—আমার বাইকের এমন দুর্দ্দশা কে করলে?

চীৎকার ত' নয়, কান্না।

আস্‌মানী বল্‌লে—একটা সিরিয়াস্ কলিশন্ হয়েছে দাদা...

—কি করে'? আমার বাইক...

—টিমুদার সঙ্গে মক্‌বুল-মিঞার।

—মক্‌বুল? কোথায়? কি করে' আমার বাইক্ পেল?

—হ্যাঁ দাদা, আচ্ছা করে' ওকে হুইপ্ করা উচিত। ও কেন না বলে' তোমার বাইক্ নিয়ে যায়! ওকে পুলিশে দেওয়া যায় পর্য্যন্ত। টিমু-দা আমার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছিল, ও হঠাৎ পেছন দিক থেকে একেবারে টিমু-দার বাইকের সঙ্গে ক্ল্যাশ্ করলে। ক্ল্যাশ্ করেই দু'জনে হুড়মুড় করে' প্রায় গাড়ীর তলায় পড়ে' গেছল আর কি!

দাদাবাবু আঁৎকে উঠে বল্‌লে—বলিস্ কি রে?

—ভাগ্যিস্ কোচম্যান্‌টা গাড়ী বাগিয়ে ফেল্‌লে। তখুনি সহিস কোচম্যান্ ধরাধরি করে' টিমু-দাকে বাড়ী নিয়ে আসা হোল। ডাক্তার বোস্‌কে মা ফোন্ করে' আনালেন। তেমন কিছু ডেন্‌জেরাস্ উণ্ড হয় নি বল্লেন ত' ডাক্তারবাবু। ড্রেস করে' ওঁরই মোটরে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছেন। ভাগ্যিস্ গাড়ীর চাকাটা আর একটু... ওরে বাবা!

—আর মকবুল? দাদাবাবু প্রশ্ন করলেন।

—কি জানি? ওটাকে ফ্লগ্ করা উচিত।

শুয়েছিলাম। দাদাবাবু ঘরে ঢুকে ডাক্‌লে—মকবুল।

ডাক্‌লাম—দাদাবাবু!

দাদাবাবু নিজে কুপিটা জ্বালাল। বল্লে—ডাক্তার তোকে কি বল্লে?

—ডাক্তার? কৈ, জানি না ত।

—সে কি রে? মাথায় কে ব্যাণ্ডেজ করে' দিয়েছে?

—পছন্।

—পছন্ কি রে? মা! মা! ওমা!

মা এসে হাজির, সঙ্গে আস্‌মানীও। দাদাবাবু বল্লেন—ডাক্তার একে দেখে নি কেন? এর ব্যাণ্ডেজ্ ভিজে এখনো রক্ত গড়াচ্ছে—

মা বল্লেন—ও মা, মকবুলের আবার কখন্ মাথা ফাটল। খানিক আগে টিমুর মাথা ফাটল মেয়ে-ইস্কুলের গাড়ীর চাকায় সাইকল্ আট্‌কে। এ আবার কখন এ বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড বাধালে? ডাব পাড়্‌তে গিয়ে নাকি রে? যা যা শীগ্‌গির ডাক্তারবাবুকে ফের একটা কল্ দে ফোনে। আসমানী, ঠাকুরকে গরম জল চড়িয়ে দিতে বল্।

আস্‌মানী যেতে যেতে বল্লে—ডাক্তার দেখাবে না আর' কিছু। উচিত ল্যাশ্ করা—

জুতো বুরুশ করছিলাম।

টিমু-দা'র মাথার ঘা শুকোয় নি বলে' পড়াতে আসে নি। আস্‌মানী একটা অঙ্ক নিয়ে মহা ভাবনায় পড়েছে। শুকনো বেণীর চুলগুলি যেন ছিঁড়ছে।

এরি মধ্যে বল্‌ল—বেশ চক্‌চকে করে' দিস্ কিন্তু রে ছোঁড়া।

বল্লাম—তোমার গাড়ী এখুনিই এসে পড়্‌বে দিদিমণি—

—যা, তোর এতে ভাবনা কিসের রে ছোঁড়া। এই অঙ্কটা না করে' কিছুতেই আমি উঠ্‌ছি না। না হয় টিমু-দা'র সঙ্গে হেঁটেই যাব স্কুলে।

টিমু-দা পড়াতে পারে না, ইস্কুল পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারে!

টেবিলের কাছে মুখটা এনে বল্লাম—কি আঁকটা?

আসমানী একেবারে তেড়ে উঠ্‌ল—ফাজ্‌লামো করিস্ নাকি? যা জুতোটা আরো চক্‌চকে কর্! অঙ্ক দেখ্‌তে এসেছেন! বলে' আপন মনে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

বেচারীর মুখখানি বিরক্তিতে ভরা, অস্থিরতায় নোয়ানো ঘাড়টি ঘামে ভিজে উঠেছে।

অঙ্কের নম্বরটা দেখে ফেলেছিলাম।—রেকারিং ডেসিমেল্। নিজের ঘরে এসে পাটিগণিত খুলে বস্‌লাম। কতক্ষণই বা লাগে?

—তোমার অঙ্কের রেজাল্ট্ কত দিদিমণি? ওয়ান্ পয়েন্ট্ ফোর্ ফোর্—

আস্‌মানী অবাক হয়ে মুখের পানে তাকাল। বল্লে—কি করে' জান্‌লি?

—ক'রে এনেছি।—এই দেখ। বালি কাগজটা মেলে ধর্‌লাম।

আস্‌মানী তাড়াতাড়ি কাগজটা টেনে নিয়ে আঁকটা নিজের খাতায় টপাটপ্ তুলে ফেল্লে। বল্লে—ইউনিটারি